সম্পাদকীয়

বাংলা কথাসাহিত্যে তৃণমূল থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত সর্বপ্রান্তীয় জীবনস্বরূপ যাঁর রচনায় আন্তরিকতা ও নান্দনিকতার যুগল-মিলনে শিল্পৈশ্বর্য লাভ করেছে, তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। একবিংশ শতাব্দীর উষালোকে দাঁড়িয়ে আজ এ-কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, কালের মীমাংসায় উত্তীর্ণ হয়েই তারাশঙ্কর সেই সব অভিজাতদের নামের পাশে উজ্জ্বলিত, যাঁরা কালজয়ী মহিমায় অভিষিক্ত।

তারাশঙ্করের বিশাল ব্যাপ্তিকে ক্ষুদ্র সম্পাদকীয়-দর্পণে প্রতিস্থাপন করা দুরূহ। অনুমান করি—এই শতাব্দীতে বাঙালি কথাশিল্পীদের মধ্যে তারাশঙ্করই হবেন প্রধানতম ব্যক্তি, যাঁর বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের মণিমুক্তো নান্দনিকতা-স্পর্শী সাহিত্যগবেষণায় নতুন তাৎপর্যে ও ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত হতে থাকবে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলা দেশে সমাজবিদ্যা তথা অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্র ও রাজনীতি শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি এবং ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস-চর্চায় তারাশঙ্করসাহিত্য অন্যতম জ্ঞানকোষ বা উপকরণের আকররূপে বিবেচিত হবে। সমগ্র তারাশঙ্কর সতত আবিষ্কারযোগ্য এক মহার্ণব—এই অনুধাবনের যাথার্থ্য তারাশঙ্কর-প্রসঙ্গীয় সাম্প্রতিক সাহিত্যগবেষণাতে লভ্য।

তারাশঙ্কর একাধারে শিল্পী এবং অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ভারতীয় স্তরবহুল সমাজবিন্যাসের সর্বপ্রান্তীয় স্তর-পরম্পরা তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে জীবন্ময়। লোকসংস্কৃতি ও পুরাণের নিগূঢ় মোটিফ ও প্রত্নপ্রতিমার উন্মোচন, ভারতীয় জীবনধারার বিকাশক্রম, সমাজগতির দ্বান্দ্বিকতা, ভারতীয় রাজনীতির উৎস ও বহুমুখী বিস্তারের জটিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, সর্বোপরি জীবনপ্রত্যয় ও মানবসত্যের প্রতিষ্ঠা তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বৈভব।

তারাশঙ্কর-সাহিত্যের গবেষণায় যে-দুটি প্রসঙ্গকে তাঁর সীমাবদ্ধতার স্মারক হিসেবে দাঁড় করানোর বহুচর্চিত প্রয়াস পরিলক্ষিত—তা হল তাঁর স্ববিরোধী জীবনার্থ এবং শিল্পিত জীবনাংশের স্থানিক পট, যা অঞ্চলপ্রীতির বা আঞ্চলিক সাহিত্যের অভিধায় প্রচারিত। এ দুটি প্রসঙ্গে বহুচর্চিত ভ্রান্তির নিরাকরণ জরুরি। বাংলা সাহিত্যসমালোচনায় সমালোচকের মূল্যেবোধ ও রুচির একনায়কী আধিপত্য নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করে। ফলত, সমালোচকের জীবনদৃষ্টি-বিন্দুর একদেশদর্শী আলোকপ্রক্ষেপণে আলোচিত সাহিত্যকর্মটি প্রতিভাসিত হয়। এতে প্রার্থিত ভাববস্তুর প্রাপ্তিতে সমালোচক যতটুকু উচ্ছ্বসিত হন, অপ্রাপ্তি ততটুকুই তাঁকে নিন্দাবাক্য-বয়নে প্রাণিত করে। এ-কারণেই মতাবলম্বী সমালোচক ও সাহিত্যগবেষকদের সর্বাধিক নিন্দাপীড়ন জীবদ্দশাতেই তারাশঙ্করকে জীর্ণ করতে হয়েছে। যে দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে শত-শত পৃষ্ঠার এই কূট তর্ক-বিতর্কের দলিল প্রস্তুত হয়েছে বৃহদর্থে তা তারাশঙ্করের গৌরবৈশ্বর্যেরই অংশ। কারণ স্ববিরোধিতা তারাশঙ্করের স্বধর্ম এবং সাহিত্যজীবনে

তারাশঙ্কর আদ্যন্ত ধর্মচ্যুত হননি কখনও। শ্রেণীচেতনা ও ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনীতি-ভাবনা ও সমাজবীক্ষণে তারাশঙ্কর যা, তারই অকপট প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। দ্বান্দ্বিকতা ও স্ববিরোধিতা, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ভাববাদমুখিতা তারাশঙ্করের জীবনবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই তারাশঙ্করকে প্রকৃত স্বরূপে বিবেচনা করতে হলে, তাঁর যথার্থ অবস্থান থেকেই তাঁকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে! কেননা, বস্তুবাদী ও ভাববাদী বিপরীত দৃষ্টিবিন্দুর মিথস্ক্রিয়ায় তারাশঙ্করের সমাজবোধ সংগঠিত। বিস্ময়করভাবে, তাঁর স্বোপার্জিত এই স্ববিরোধী প্রত্যয়ের একাংশ বিজ্ঞান-নিষ্ঠ, অপরাংশ ভাববাদ-সংলগ্ন। রাঢ়বঙ্গের জলবায়ু-পরিস্রুত গৈরিক যে ভূমিখণ্ডে শেকড় প্রোথিত করে তারাশঙ্করের মানসবৃক্ষের উত্থান—সেই বীরভূমের পারিবেশিক বাস্তবতা তথা খরদাহ উষরতা আর অজয়-ময়ূরাক্ষী-কোপাই-র দুকূলপ্লাবী মৌসুমী পেলবতার মধ্যেও দ্বিধা বা দ্বৈতরূপের অস্তিত্ব সক্রিয়। বীরভূমের চরমভাবাপন্ন প্রতিবেশেই সম্ভব হয়েছে বিপ্রতীপ সাধনমার্গ শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমতের অবাধ বিস্তার। তারাশঙ্করের স্বগৃহেও ছিলো পরস্পরবিরোধী 'একাল ও সেকাল'-রূপী দুই জীবনধারার সহাবস্থান। পিতা ও পিসিমা তারাশঙ্করের
ন'র আদর্শ-উৎস, আর 'একালে'র জীবনধর্মের প্রতিভূ জননী প্রভাবতী।
বতা জেনাসের সম্মুখ ও পশ্চাতের সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মুখ-এর আদলে না-হলেও 'সেকাল আর একালে'র সন্ধিক্ষণের দ্বন্দ্বময় যুগপরিবেশ এবং এর সপ্রাণ প্রভাবকে তারাশঙ্কর মা-বাবার সম্মিলিত 'অর্ধনারীশ্বর মূর্তি'র রূপকে চিহ্নিত করতে দ্বিধান্বিত হননি। এ-কারণেই কালান্তর—স্পৃষ্ট সমাজের বিপর্যস্ত পক্ষের উত্তরসুরি হিসেবে আত্মশ্রেণীর বিপর্যয়কে, পরাভূতের আত্মজ হতাশ্বাসকে গোপন করার উৎকট প্রয়াস নেই তাঁর রচনায়। অমোঘ বলেই নতুন কালের অভ্যুদয় তাঁর কথাসাহিত্যে দীর্ণ বেদনায় সম্ভাষিত। এই দ্বান্দ্বিকতা ও স্ববিরোধিতার কারণেই তাঁর কালজয়ী রচনাগুলি নান্দনিকতা ও জীবনময়তায় উত্তীর্ণ।

১৯২৯-১৯৭১ সময়পর্বে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের উন্মেষবিকাশ ও পরিণতি। প্রারম্ভ-পর্যায়েই নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সুচিহ্নিত যাত্রাপথ ; সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে দেশসেবার প্রেরণা এবং ঔপনিবেশিক ভারতের শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর যাত্রাপথের পাথেয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট ১৫, একাংশ-ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে জীবনের মধ্যস্তরেই পূর্ণ হয়ে যায় তাঁর আবাল্য-লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। তাঁর জীবনের এ-এক সংকটকাল ; একদিকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনির্বচনীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে স্বপ্নহীনতার জগতে আকস্মিক অনুপ্রবেশের বিহ্বলতা! এই দুইয়ের মর্মান্তিক-পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত তারাশঙ্কর মৃত্যু-কামনাও করেছেন আন্তরিকভাবে! স্বপ্ন-প্রত্যাশাহীন মানুষ বাঁচতে পারে না, স্বাধীনতা—প্রাপ্তিতে চরিতার্থ তারাশঙ্কর বেঁচে থাকবেন কী নিয়ে ? এই জিজ্ঞাসা—জটিল মনোসংকটই সম্ভব করেছে তারাশঙ্কর-সাহিত্যের অনিবার্য পর্বান্তর। ফলত, ১৯২৯-১৯৪৭ এবং ১৯৪৮-১৯৭১ এই দুই

কালপর্বে বিভাজিত হয়ে গেছে তারাশঙ্করের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবন। যিনি ১৯৪৭ সনে মৃত্যুকামনা করলেন স্বপ্নপূরণের বিহ্বলতায়—তিনিই শেষাবধি সাহিত্যজীবনে সক্রিয় থাকলেন পরবর্তী চব্বিশ বছর! দ্বিতীয় পর্বের তারাশঙ্কর প্রথম পর্বের তুলনায় বাস্তবিক কারণেই নিষ্প্রভ হয়ে রইলেন। সমকালের উত্তাপ থেকে নিজেকে আড়াল করে তিনি ইতিহাস ও নিকট রাজনৈতিক-অতীতের পুনরাবৃত্তিতে নিমগ্ন হলেন ; কড়চা–কথকতা, কথা-উপকথা-কাহিনীর বিমিশ্র বাস্তবকে রোম্যান্সের পরিচর্যায় শিল্পরূপ দিতে প্রয়াসী হলেন। শাসকদলের সান্নিধ্য, নিম্ন-উচ্চ আইনসভার মনোনীত সদস্যপদ, সর্বভারতীয় সরকারি সাহিত্যিক মুখপাত্রের গৌরব-আনন্দ তাঁকে স্বাধীনতার অনুষঙ্গে প্রাপ্ত দারিদ্র্য, বেকারত্ব আর বাস্তুসমস্যার সপ্রাণ সমকাল থেকে নিরাপদ-নিশ্চিত দূরত্বে স্থাপন করে তৃপ্ত করল। এই পর্বে *আরোগ্য নিকেতন*, *কীর্তিহাটের কড়চা* কিংবা *অরণ্য-বহ্নি*-র মতো তারাশঙ্করীয় সামর্থ্যের বিরলদৃষ্ট প্রকাশ ঘটলেও, আশুতোষ-উপাখ্যানের 'কথক' পরিচয়ই এ-পর্বে তাঁর স্বোপার্জন। তবু, কেবল পর্ব-বিভাজনের নিরিখে তারাশঙ্কর-বিচার খণ্ডিত হতে বাধ্য। তাঁর অখণ্ড সাহিত্যিক-জীবনের পরিপ্রেক্ষণীতে বিচার করলে দেখা যাবে—তারাশঙ্কর এমন বেশ কিছু অত্যুজ্জ্বল গল্প-উপন্যাস সৃজন করেছেন, যা তাঁকে মহৎ শিল্পস্রষ্টা ও অণুসূক্ষ্ম জীবনদ্রষ্টার অসামান্য গৌরবে অভিষিক্ত করেছে। কালের বিসর্পিল গতিভঙ্গির এবং সমাজের রূপ-রূপান্তর ও মানুষের শ্রেণীগত বিবর্তনের শিল্পসাক্ষ্য সৃজনে তাঁব কালজয়ী প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত ও অবিসংবাদিত।

তাঁর জন্মোত্তর শতবর্ষে. আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির নিদর্শনরূপে এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হল।

দুই

১৯৯৮ *খ্রিস্টাব্দের জুলাই ২৩, বাংলা উপন্যাসের শ্রুতকীর্তি শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মোত্তর শতবর্ষ পূর্ণ* হয়েছে। এ–উপলক্ষে জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলির নিদর্শনরূপে বাংলাদেশ থেকে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হোক—এই সদিচ্ছা থেকেই আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেনের অনুপ্রেরণায় ও পরিকল্পনায় এ কাজে অগ্রসর হই। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর ১৪, তারাশঙ্করের জীবনাবসান ঘটলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি'র তিনি ছিলেন আমৃত্যু সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। জন্মশতবর্ষে তাঁকে উপলক্ষ করে বাংলাদেশ থেকে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার বহুমুখী প্রাসঙ্গিকতার অন্যতম প্রান্ত এটি।

সংকলিত প্রবন্ধগুচ্ছে মূলত কথাশিল্পী তারাশঙ্করকেই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু থেকে বিবেচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একটি ব্যতীত সকল প্রবন্ধ প্রাবন্ধিকবৃন্দ

স্মারকগ্রন্থের জন্যই রচনা করেছেন। তাঁরা আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তারাশঙ্কর-চর্চায় নিজেদের আন্তরিকতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এ-গ্রন্থের একমাত্র পুনর্মুদ্রিত গবেষণানিবন্ধের লেখক সূক্ষ্মদর্শী-স্থিতপ্রাজ্ঞ সমালোচক, তারাশঙ্কর-বিশেষজ্ঞ শ্রী প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। তিনি আমাদের অনুরোধে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণে সম্মতি প্রদান করেন এবং স্বেচ্ছাশ্রম স্বীকার করে 'অদল-বদল'কৃত এক পাঠ প্রস্তুত করে প্রকাশনার জন্য প্রদান করেন। ১৩৮২ বঙ্গাব্দে সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশিত শ্রী প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধটি তারাশঙ্করের সাহিত্যবিবেচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন ; অণুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ–পদ্ধতির প্রয়োগে উপস্থাপিত এই প্রবন্ধ তারাশঙ্কর-চর্চায় এক নতুনতর দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল। এই অসামান্য প্রবন্ধটি সংকলন করার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত।

নান্দনিক নিষ্ঠায় ও অসীম ধৈর্যে সমগ্র তারাশঙ্কর যাঁরা পাঠ করেছেন, বিরলদৃষ্ট সেইসব পাঠকদের অন্যতম প্রফেসর মাহমুদা খাতুন। তাঁর অধ্যয়নস্পৃহা শিক্ষার্থীমহলে সুবিদিত। তিনি আমাদের অনুরোধে সম্মত হয়ে তারাশঙ্কর-সৃষ্ট নারীচরিত্রসমূহের বিষাদ ও বেদনালোক উন্মোচন করেছেন। দ্বিতীয় পর্বের আশুতোষ উপাখ্যানগুলিকে হিসেব বহির্ভূত রাখলে, তারাশঙ্করের উপন্যাসে নারী নয়, পুরুষেরই প্রাধান্য। তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহও প্রধানতই পুরুষ। প্রথম পর্বের *ধাত্রী দেবতা* এবং *রাইকমল* উপন্যাসে নারীর পূর্ণাবয়ব অবস্থান ব্যতিক্রমতারই দ্যোতক। কী সেই রহস্য, যে জন্য তারাশঙ্কর প্রধানত নারীর বদলে পুরুষকেই গল্পে-উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের বা নায়কের মহিমা দান করেছেন ? এই জিজ্ঞাসাকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই তারাশঙ্করের নারীমণ্ডলীর বিষাদ ও বেদনাকে অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

তারাশঙ্কর রূপদক্ষ শিল্পী নন, সম্মোহনক্ষম মহৎ কথাকার মাত্র ; প্রথানুগ সাহিত্যালোচনায় তারাশঙ্কর এভাবেই মূল্যায়িত হয়েছেন এতদিন। তাঁর সম্পর্কে বহুভাষিত উল্লিখিত অভিমত প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে প্রফেসর বেগম আকতার কামাল লিখিত প্রবন্ধে। তিনি সুদীর্ঘ উপন্যাস *কীর্তিহাটের কড়চা*-কে 'অধুনা মহাকাব্য' নামে অভিহিত করে এর জীবনব্যাপ্তির মাত্রা ও সংগঠনকৌশল অতি-সাম্প্রতিক সাহিত্যবিবেচনা-পদ্ধতির নিরিখে উন্মোচন করেছেন। বাংলাদেশে কথাসাহিত্য-বিবেচনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রবণতার দৃষ্টান্ত প্রবন্ধটিতে লভ্য। মৎ প্রণীত 'তারাশঙ্করের কবি : আঙ্গিক-বিবেচনা' প্রবন্ধে দুটি মিথিক প্রসঙ্গের অনুসরণে শিল্পরূপ-দক্ষ তারাশঙ্করের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছি। প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ 'ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তারাশঙ্করের তারিণী মাঝি' প্রবন্ধেও আধুনিক পদ্ধতির আলোকে বাংলা চিরায়ত ছোটগল্প 'তারিণী মাঝি' বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রফেসর সৈয়দ আজিজুল হক তাঁর প্রবন্ধে তারাশঙ্কর-প্রসঙ্গে বহুচর্চিত লোকসংস্কৃতির রহস্যলোকের অনুসন্ধানে না-গিয়ে *নাগিনীকন্যার কাহিনী* উপন্যাসের নাগিনীকন্যাদ্বয়ের মানবিক জীবনাকুতিকে আলোকিত করেছেন।

স্মারকগ্রন্থের শেষ চারটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন সম্ভাবনাময় তিন তরুণ সাহিত্যগবেষক। সৌরভ সিকদার পর্যালোচনা করেছেন *অরণ্য-বহ্নি*-র ঐতিহাসিক পটভূমি। ডক্টর সৌমিত্র শেখর তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিধৃত রাজনীতির স্বরূপ ও দর্শন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। এস এম মনির হোসেন তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সন্ধান করে দুই কথাশিল্পীর জীবনবোধের ও নির্মাণশৈলীর স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। সিরাজুল ইসলাম 'রসকলি' গল্পকে উপলক্ষ করে বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যার রহস্যঘন স্তরে কামনা ও সাধনার মধ্যকার সপ্রাণ দ্বন্দ্বকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারাশঙ্করের প্রার্থিত মীমাংসার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন।

সম্পাদনাকালে উপদেষ্টামণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত উপদেশনা, বিশেষত প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেনের তাগিদ ও দিক্‌নির্দেশনা এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশকে সম্ভব করেছে। শিল্পী ধ্রুব এষ প্রযুক্তি ও নান্দনিকতার সমন্বয়ে দৃষ্টিশোভন প্রচ্ছদ সৃজন করেছেন।

নবযুগ প্রকাশনী এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঐ প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমর চন্দ্র দাসের যোগাযোগ রক্ষায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা উল্লেখের দাবি রাখে।

চেষ্টা সত্ত্বেও, নানাবিধ কারণে, স্মারকগ্রন্থটি যথাসময়ে প্রকাশ করা গেল না, এ মর্মপীড়া বিস্মৃত হওয়ার নয়।

ভীষ্মদেব চৌধুরী
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস : 'চৈতালী-ঘূর্ণি'

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের ব্যাপ্তি, ১৯২৮ থেকে ১৯৭১, এই তেতাল্লিশ বছর [১]। তার মধ্যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮—অর্থাৎ *কল্লোল*-এ তারাশঙ্করের প্রথম আত্মপ্রকাশ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল—তাঁর সাহিত্যচর্চার আদি পর্ব। এই বছরে তাঁর ছয়টি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় : *চৈতালী-ঘূর্ণি* (১৯৩১), *পাষাণপুরী* (১৯৩৩), *নীলকণ্ঠ* (১৯৩৩), *রাইকমল* (১৯৩৪), *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৯৩৫) আর *আগুন* (১৯৩৮)। ছোটগল্প এই পর্বে সংখ্যাতেই (অন্তত আশিখানি) শুধু তেরোগুণ বেশি নয়, শিল্পগুণেও ঋদ্ধতর। তারাশঙ্করের অনেকগুলি সেরা ছোটগল্প—'নারী ও নাগিনী', 'জলসাঘর', 'তারিণীমাঝি', 'মতিলাল', 'অগ্রদানী', 'কালাপাহাড়'—এই ঋতুরই ফসল। পরবর্তীকালের *গণদেবতা* (১৯৪২) বা *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭)-র তুলনায় এই পর্বের উপন্যাসকে তাঁর গৌণ কাজ বলা যেতে পারে। তুলনায় গৌণ কাজ হলেও, এদের গুরুত্ব আছে তাঁর বিকাশের ইতিহাসে। এই পর্বে বাস্তব আর উপন্যাসের আঙ্গিককে মুঠোর মধ্যে ধরার স্নায়ু-পেশীগত প্রক্রিয়ায় হাত পাকিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁর মন, তাঁর জগৎ কীভাবে গড়ে উঠছিল, তা অনেকটা টের পাওয়া যায় এই উপন্যাসগুলোকে লক্ষ করলে।

আর *চৈতালী-ঘূর্ণি* তারাশঙ্করের শুধু প্রথম উপন্যাস নয়, তাঁর জগতে প্রবেশের প্রশস্ততম দরজাও বটে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—যাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের লেখার প্রথম পরিচয় *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র মারফৎ—একদা লিখেছিলেন, এ-উপন্যাস 'ওঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির Epitome[২]।' 'সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির' অণুবিশ্ব না বলে, তাঁর সূচনা'কালীন সাহিত্য-সৃষ্টির অণুবিশ্ব বললে, বোধ করি, আরও যথাযথ হয়। সুতরাং *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কাঠামো বিশ্লেষণ করলে, তাঁর প্রথম-রচিত জগতের স্বরূপ, দ্বন্দ্ব ও গতি অনেকটা বুঝতে পারব।

কিন্তু আর আগে, ঔপন্যাসিক হিশেবে তাঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রে নিতে চাই। একজন একালের ঔপন্যাসিক, তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য এভাবে নির্দেশ করেছেন [৩] : 'উপন্যাস এমন এক ধরনের জীবনবোধ ও স্থাপত্যকৌশল দাবি করে যার পরিধি বহুবছর ধরে ব্যাপৃত। বহুবছর ধ'রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত তা ধীরে ধীরে এমনভাবে জট বাঁধে ও খোলে যে শেষপর্যন্ত লেখক ও তাঁর বিষয় একাকার হন। এই অর্থেই না

টমাস মান...বলেছিলেন... যে তলস্তয়ের সমস্ত লেখা বস্তুত এক নিরবচ্ছিন্ন ডায়েরী ? ...তারাশঙ্করের সমসাময়িক কিংবা পরে যাঁরা আরম্ভ করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ দিলে, তাঁদের অনেকের কাছেই ঔপন্যাসিকের দায় খুব প্রবল ছিল না। ঔপন্যাসিকের বিষয় যত্রতত্র ছড়ানো, তা নিয়ে গল্প ফাঁদলেই চলে এই বোধে তাঁরা অনেকেই গল্প-লিখিয়ে কিন্তু ঔপন্যাসিক নন। তাঁদের জীবন তারাশঙ্করের মতো বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে নেই।'

দীর্ঘকাল ওতপ্রোত-জড়ানো যে-বিষয়ের আশ্রয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি 'এক নিরবচ্ছিন্ন ডায়েরী' হয়ে উঠেছে, তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম উপন্যাসেই তা খুঁজে পেয়েছেন। সেই বিষয় হল : গ্রামীণ সমাজ এবং তার ভাঙন। এই বিষয়বস্তু যে তারাশঙ্করের অন্বিষ্ট ছিল, তা বোঝা যায়, *প্রবাসী*-তে তাঁর লেখা রিভিউগুলি পড়লে। *প্রবাসী*-তে তিনি শ্রাবণ ১৩৪৪ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ পর্যন্ত ছত্রিশখানি বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন। আমরা এই রিভিউগুলি থেকে সমকালীন গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেমন জানতে পারব, তেমন বুঝতে পারব, তিনি নিজে কী করতে চাইছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর *ময়ূরাক্ষী* আর *গৃহকপোতী*-র রিভিউ থেকে উদ্ধৃত করি : '...বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর এই মহানগরী লেক, ড্রইংরুম, মোটর, পানীয়, মেকী সমাজ-বিদ্রোহের ছড়াছড়ি হইলেও তাঁহার [সরোজকুমারের] দৃষ্টি বাংলা দেশের নিপীড়িত প্রাণের সন্ধানে বাংলার নদীতীরের কৃষিক্ষেত্রের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলার প্রাণ আজও কৃষিক্ষেত্রের স্তন্যপায়ী শিশুর মত পড়িয়া আছে' (*প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃ. ৬৯৫)। বোঝাই যায় আসলে তারাশঙ্করেরও 'দৃষ্টি বাংলা দেশের নিপীড়িত প্রাণের সন্ধানে' 'কৃষিক্ষেত্রের দিকে' নিবদ্ধ। এই বিষয়বস্তু যে তারাশঙ্করের স্বক্ষেত্র, রবীন্দ্রনাথও তা লক্ষ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তারাশঙ্করকে বলেন :

> তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়ি নি।
>
> তারপরই হেসে বললেন,—তবে এ কথার শুরু প্রথম আমিই করেছি। আমি যখন বাংলা দেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতানার রাজত্ব চলেছে।
>
> —*আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ১২২

গ্রামীণ সমাজের ভাঙন—এই বিষয়ের মোকাবিলা তিনি প্রথম করেছেন ১৯২৮ সালে, *কালি-কলম*-এ প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে'[৪] ছোটগল্পে, যার সম্বন্ধে তারাশঙ্কর লিখেছেন: 'এ গল্পটিই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথের বোধহয় প্রথম মাইল-পোস্ট। গল্পটি পরবর্তী কালে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' 'উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত হয়েছে'[৫]।' 'শ্মশানের পথে' ছিল তিন দিনের কাহিনী। অভিজ্ঞতায় অর্জিত নতুন এক সমাজবোধকে শরীর দেবার আবেগে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে এই সময়-পট প্রলম্বিত হয়েছে কয়েক বছরে : সম্ভবত অসহযোগ আন্দোলনের আমল থেকে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরবর্তী কোনো সময়, হয়তো ১৯২৮, পর্যন্ত এর বিস্তার। কালের আয়তন প্রসারণের সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্ধিত হয়েছে দেশের (ফলে

সমাজেরও) মাত্রা, আর অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে দ্রষ্টার 'ফ্রেম অব রেফারেন্স', সমাজবীক্ষা। যা ছিল বিশ্লিষ্ট কালের ফ্রেমে আবদ্ধ ছোট ছবি, তা প্রসারিত হয়েছে ধারাবাহিক সময়ে সংলগ্ন চলচ্ছবিতে। যা ছিল সমাজের একটি খণ্ড রূপের বিষয়ে বিচ্ছিন্ন অন্তর্দৃষ্টি, তা রূপান্তরিত হয়েছে সমাজ-জীবনের সামগ্রিক রূপের পরম্পরীণ পরিক্রমায় [৬]।

দুই

এই পরিক্রমায় তিনি উপন্যাসের যে-রূপ নির্মাণ করেছেন, এবারে তার কাঠামো বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

চৈতালী-ঘূর্ণি-র গল্পাংশ সংক্ষেপে বলে নিলে আমাদের এগোনোর সুবিধা হবে। জমিদার-মহাজনের শোষণে, অত্যাচারে রাঢ় অঞ্চলের সদ্‌গোপ চাষী গোষ্ঠ জমি থেকে উৎখাত হল শেষ অবধি। গ্রামে এল বন্যা, নদী-চরের শ্মশানও বানের ঠেলায় এগিয়ে এসে, গ্রামের মধ্যে ঢুকল। এইটুকু প্লটের প্রথম পর্ব, *কালি-কলম*-এ প্রকাশিত 'শ্মশানের পথে'-র এইটুকুই ছিল কাহিনী। কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে দেখি : ভূমিভ্রষ্ট গোষ্ঠ তার বৌ দামিনীকে নিয়ে একটা আধা-শহরে এল. মজুরের কাজ নিল ধান-কলে। কারখানার দুইজন গান্ধিভক্ত বাবুর, সুরেন আর শিবকালীর, চেষ্টায় মজুররা ইউনিয়ন বানালো। গোষ্ঠ ইউনিয়নের অগ্রণী কর্মী হয়ে ওঠে। তারপর ওভারটাইম আর মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে বাধলো ধর্মঘট। উনিশ দিন পরে পেটের জ্বালায় কিছু শ্রমিক ধর্মঘট-ভাঙার উপক্রম করতেই দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা লাগে। আহত গোষ্ঠ হাসপাতালে প্রলাপ বকতে-বকতে মারা যায়।

নবীনতর, পূর্ণতর সমাজবীক্ষা-বোধে আসার প্রেরণায় তারাশঙ্কর যখন তাঁর ছোটগল্পকে উপন্যাসের আয়তনে ঢেলে সাজালেন, তখন জুড়লেন গল্পের এই দ্বিতীয় পর্ব। তিনি লিখেছেন, কাহিনীর প্রথম পর্বের পেছনে আছে, বীরভূমের বহু গ্রামে জমিদারির ও রাজনৈতিক কাজে ঘোরার অভিজ্ঞতা, আর কয়লা-কুঠিতে কাজের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় পর্বের উপজীব্য। 'দুই অভিজ্ঞতাকে জুড়ে' *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সৃষ্টি[৭]।

দুইভাবে উপন্যাস শুরু করেন লেখকরা। কখনো একটা প্যাটার্ন নিয়ে আরম্ভ ক'রে তাতে ধীরে-ধীরে জীবন সঞ্চার করেন ; কখনো-বা জীবন নিয়ে শুরু ক'রে, তা থেকে ক্রমশ একটা প্যাটার্ন উদ্ভিন্ন ক'রে তোলেন। *চৈতালী-ঘূর্ণি* এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস।

এই প্যাটার্ন ক্রমবিকশিত হয়েছে কাহিনীর দুটো ঈষৎ ভিন্নমুখী চলন থেকে। একদিকে ধ্বংসের দিকে গ্রামের গতি, অন্যদিকে ক্রোধে-ক্ষোভে-প্রতিরোধে শোষিতের ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে ওঠা। তারাশঙ্কর প্রথম থীম ফুটিয়েছেন আগ্রাসী শ্মশানের প্রতীকে ; দ্বিতীয় থীম, চৈতালি ঘূর্ণির প্রতীক দিয়ে। উপন্যাসের একটা জায়গায় এই দুই প্রায়-বিপরীত প্রতীক পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে, প্রতিন্যাসের ভঙ্গিতে :

১ উপলব্ধ সত্য আর যুগযুগান্তের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া উঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝড়ো হাওয়ার মত।

কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষণস্থায়ী, উঠিয়াই মিলাইয়া যায়[৮]। [দ্বিতীয় প্রতীক]

২ শ্মশানখানা যেন দিন-দিন আগাইয়া আসিতেছে। সুদূর আফগানিস্তানের কাবুলীর দল শকুনির মত তীক্ষ্ণ চীৎকারে খাটো-খাটো ভাঙা বাংলায় হাঁকে, এ গুণ্ঠা মুড়ার, আর এ— [প্রথম প্রতীক]
—*চৈতালী ঘূর্ণি,* পৃ. ৫।

দুটো প্রতীকেরই ব্যবহার পৌনঃপুনিক। উপন্যাস শুরুই হচ্ছে শ্মশানের ছবি দিয়ে :

'...সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানে ছাই উড়ছে, শেয়াল কুকুর শুকুনি চেঁচাচ্ছে, গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নাই কারু, যেন সব ম'রে গিয়েছে...'

আবার, ঐ একই পাতায় :

নদীর পরই চরের উপর শ্মশান। এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি রাশি অঙ্গারে, চিতার লকলকে রক্ত-রাঙা বহ্নিশিখায় বাস্তবে মূর্ত।

জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায়, ও ইহাকে তাড়ায়।

আর আসে শৃগালের দল, শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ গোঁ।

শৃগালের দল দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া উঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে, পূর্ণ উদর, তবু লোভের অন্ত নাই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা করকরে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাহাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু, যে বায়ু মানুষের জীবন, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের মত অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বিকট বীভৎস দুর্গন্ধ।

শ্মশানের পরই খান তিরিশেক মাঠ, তাহার পর গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান ; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের কটকখানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া উঠে, কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়।

...বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে ; এদিকে গাছগুলা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায় ; যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে ; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পায়ও মানুষ ; তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক। বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য।

মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবনের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।—*চৈতালী-ঘূর্ণি, পৃ.* ৩-৪।

এই শ্মশান-গ্রামের ছবি *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র ভূমিকা (তারাশঙ্করের সমগ্র উপন্যাসের প্রবেশকও একে বলা যায় : মরণোন্মুখ গ্রাম তাঁর একটা প্রধান থীম)। এই শ্মশান স্থির নয় : জঙ্গম, আগ্রাসী। ভূমিকায় শ্মশানের ছবি স্থাপিত হওয়ার পর উপন্যাস জুড়ে প্রসরমাণ শ্মশানের প্রতীক ঘুরে-ঘুরে আসতে থাকে। যেমন :

১ শ্মশানখানা যেন ঘরের বুকেই প্রকট হইয়া উঠিল। (পৃ. ২৮)

২ ...শ্মশান তো বুকে বুকে ঘরে ঘরে (পৃ. ২৯)

৩ গোষ্ঠ বলে, যে বান, গাঁয়ে ঢুকল ব'লে। ক্ষণপরে আবার কহে, আর গাঁয়ের পিতুল নাই, বানের আগে শ্মশান এসে গাঁয়ে ঢুকছে।

ব্যগ্রভাবে দামিনী প্রশ্ন করে, আর কত দেরি ? (পৃ. ৩৯)

উপরে উদ্ধৃত সংলাপ আর ঐ প্রশ্ন দিয়ে ছোটগল্প 'শ্মশানের পথে' শেষ হয়েছিল : হতাশা আর মৃত্যুর আচ্ছন্নতায় এর সমাপ্তি। কিন্তু *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে শ্মশান-প্রতীকের এখানেই শেষ ব্যবহার। অন্য এক প্রতীক, অন্য এক মেজাজ সংযোজিত হয়েছে উপন্যাসে।

আগেই বলেছি, উপন্যাসে যেন এই প্রসরমাণ শ্মশানের সামনে চাষী-মজুরের প্রতিক্রিয়ার, প্রতিবাদের থীম হিশেবে এসেছে চৈতালি ঘূর্ণির প্রতীক, যার ব্যবহার 'শ্মশানের পথে' গল্পে একবারও নেই। উপন্যাসে চৈত্রের ঝড়ের প্রতীকের দুটো তাৎপর্য আছে :

১ প্রতিবাদের এ-ঝড় গতিবেগে তীব্র, কিন্তু অল্পায়ু। চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণজীবী যে ; আকাশ বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা ? (পৃ. ৩৪)।

২ এই খণ্ড-খণ্ড প্রতিবাদ ভাবী বিপ্লবের—কালবৈশাখীর পূর্বাভাস।

উপন্যাসের শেষ বাক্যে এই ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ, সেটা পরে উদ্ধৃত করছি। *চৈতালী-ঘূর্ণি* মাসিকপত্রে বেরুনোর সময়ে একটি বাক্যে (গ্রন্থে বর্জিত) এই তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বিবৃত ছিল। সেখানে লেখক বলছেন, চৈত্র প্রান্তরের ঘূর্ণির মতো গ্রামবাসীর এই ক্ষোভ, এই বিদ্রোহ, 'কালবৈশাখীর ঝড়ের ইঙ্গিতও করে হয়তো' (*উপাসনা*, কার্তিক ১৩৩৬, পৃ. ২০৮)।

চৈতালি ঘূর্ণির প্রতীক বারে বারে এসেছে—খুঁটিয়ে বলতে গেলে সব শুদ্ধ সাত বার (মেঘ বিদ্যুৎময় ঝড়কে একই প্রতীকের রূপান্তর হিশেবে দেখলে দশ বার)। শ্মশানের ছবি দিয়ে যে-উপন্যাসের শুরু, তার শেষ এই চৈত্রের ঝড়ের প্রতীক দিয়ে :

অদূরে তখন রেল লাইনের ধারে কয়টা কুলির ছেলে ধর্মঘটের খেলা খেলিতেছিলো, মাটির কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিলো, তোড় দিয়া,তোড় দিয়া।

সেই দিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালির ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর (পৃ. ৮২)।

এই সব প্রতিমা-প্রতীকের পুরো মানে শুধু উপন্যাসের চতুঃসীমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাইরের বৃহত্তর পটের সঙ্গেও এদের তাৎপর্যসূত্র পরোক্ষে জড়ানো। আসলে তারাশঙ্করের চেতনা-লোকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটা, ঘাত-প্রতিঘাত আর অন্তর্দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েছে গোড়া থেকেই। 'শ্মশানের পথে' বেরিয়েছিল ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ; লেখা নিশ্চয়ই তার আরও কিছুকাল আগে। এর পেছনে যে-অভিজ্ঞতার চাপ, তা ১৯২৮-এর পূর্বকালীন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কাল-পর্বে আমাদের জাতীয়

ইতিহাসের ভাঁটার টান। সাম্রাজ্যবাদ তখন আগুয়ান মারমুখী ; জাতীয় মুক্তির শক্তি বিপর্যস্ত অপসরমাণ। এই পরিস্থিতিকে সুভাষচন্দ্র বারংবার 'জাতীয় দুর্যোগ' ('national calamity') বলে বর্ণনা করেছিলেন [৯]। লাজপৎ রায় চারদিকে দেখেছিলেন, 'chaos and confusion' তিনি বলেছিলেন : The people are sunk in depression, Everything—principles, practices, parties and politics—seem to be in a state of disintegration and dissolution'.[১০]

বিশেষত বাংলা দেশে সুভাষচন্দ্রের আখ্যাত 'ন্যাশানাল ক্যালামিটি'র লক্ষণ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ-জমিদার-মহাজন–মালিকের সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলা দেশের পটভূমিতে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু (১৯২৫), আর মুহুর্মুহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৬) ধ্বংসের ছায়া বিস্তার করেছিল। 'শ্মশানের পথে' আর *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র আগ্রাসী শ্মশান-প্রতীক জন্মেছে এই মৃত্যু-বিকীর্ণ অভিজ্ঞতার মাটিতে।

১৯২৯ সালের নভেম্বর (কার্তিক ১৩৩৬) থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিল (চৈত্র ১৩৩৬), এই ছয় মাসে, *চৈতালী-ঘূর্ণি উপাসনা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। রূপান্তরিত হয়েছে তখন রাজনৈতিক পটভূমি[১১]। ১৯২৮ সাল থেকে জাতীয় আন্দোলনে আবার জোয়ার আসে—১৯৩০-৩৪ যার চূড়ান্ত পর্যায়। সাইমন কমিশন বয়কট (১৯২৮), পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব (১৯২৯), ডান্ডি অভিযান (১৯৩০), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০), এই জোয়ারের বড়ো-বড়ো ঢেউ। প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন (১৯২৮) উপলক্ষে বাংলা দেশে চাষীদের মধ্যেও আলোড়ন দেখা দেয় ; বিহারে সহজানন্দের নেতৃত্বে কৃষক-সভা স্থাপিত হল ১৯২৯ সালে [১২]। কিন্তু এই জোয়ারের সবচেয়ে নতুন দিক শ্রমিক-আন্দোলনের অভ্যুদয়। ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষ কেঁপে উঠল শ্রমিক ধর্মঘটে। সরকারি হিসেবে প্রায় ৩২ নিযুত (৩১৬৪৭০০০) শ্রম-দিবস নষ্ট হয় ১৯২৮ সালে ; অর্থাৎ পূর্ববর্তী ৫ বছরের মোট যোগফলেরও বেশি। বাংলা দেশে ১৯২৮–এর ধর্মঘটে ১২৬৫৭৫ শ্রমিক যোগ দেয়, নষ্ট হয় ৩৯৪০৪৫৭ শ্রম-দিবস [১৩]। সুতরাং *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে শ্রমিক-ধর্মঘটের বৃত্তান্ত কোনো আপতিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯২৮–৩৪-এর বিশেষত ১৯৩০-৩৪-এর—জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক এর ব্যাপ্তি আর তীব্রতার পাশাপাশি অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন। সেই লক্ষণগুলি এই :

> ...the spasmodic, interrupted tempo of development, the zigzag vacillation of aims, the repeated accompanying negotiations, and sudden truces without settlement, until the final collapse.[১৪]

চৈত্রের ঘূর্ণির প্রতীক আন্দোলনের এই দ্বৈত-স্বভাবের প্রায়-যথাযথ রূপায়ণ।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই ঘূর্ণিঝড়ের ক্রমবর্ধমান গতিবেগের দোলায় লেখা। *উপাসনায়* যখন *চৈতালী–ঘূর্ণি*-র শেষ কিস্তি বেরোচ্ছে

(এপ্রিল ১৯৩০), তখন শুরু হচ্ছে : গান্ধিজির ডান্ডি অভিযান, মেদিনীপুরের লবণ-সত্যাগ্রহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

দু'ই প্রতীকের পশ্চাৎপটে যে দুই ধরনের অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল, তার তাৎপর্যের স্তরান্তর আমরা দেখলাম। তারাশঙ্কর এই দুই পৃথক অভিজ্ঞতাকে জোড়া দিয়ে একই ফ্রেমে বাঁধলেন কোন্ বোধে পৌঁছে ? কালের মাত্রার দিক দিয়ে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র বিন্যাস বোঝার চেষ্টা করলে, এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া সহজ হবে।

তারাশঙ্কর সাধারণত সময়ের চৌহদ্দি উপন্যাসে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত ক'রে দেন ; *চৈতালী–ঘূর্ণি* তার ব্যতিক্রম। আর এটাই এ-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। যে-কালসীমার মধ্যে ঘটনাস্রোত বইছে, তার সম্বন্ধে এই কয়টি ইঙ্গিত পাই :

১ উপন্যাসের গোড়ার দিকে দেখি, যোগী মোড়লের বাড়িতে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পাঠের নিয়মিত আসরে 'আজ মাষ্টার [রমাপতি] পড়িতেছিল, অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, (পৃ. ২৩)। এ থেকে বোঝা যায়, গল্পের শুরু হয়তো ১৯২০-২১ সালের কোনো সময়ে।

২ উপন্যাসের শেষের দিকে বাবুদের এই সংলাপ থেকে অনুমান করা যায়—চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ ১৯২৫ সালের পরে, কোনো সময়ে গল্পের যবনিকা পতন :

না ঃ আর (স্বরাজের) বেশি দেরি নাই।

'একজন বৃদ্ধ কহে, তাও আমাদের নাতির আমলের আগে নয়।

'দেশবন্ধু থাকলে কিন্তু আরও আগে হ'ত। (পৃ. ৬২)।

৩ কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে গল্পের সমাপ্তি, তা অজানা। তবে, ১৯২৮ সালে শ্রমিক-আন্দোলনের যে-জোয়ার আসে, *চৈতালী-ঘূর্ণি-র* ধর্মঘট তার অংশ হওয়া সম্ভবপর। সেক্ষেত্রে হয়তো ১৯২৮ সালে গল্পের শেষ। কিন্তু এটা নিছক অনুমান, কোনো প্রমাণ নেই এর সমর্থনে।

উপরের এইসব ইঙ্গিত-অনুমানের ভিত্তিতেই আগে একবার লিখেছি : *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে সময়-পট প্রলম্বিত হয়েছে কয়েক বছরে : সম্ভবত অসহযোগ আন্দোলনের আমল থেকে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরবর্তী কোনো সময়, হয়তো ১৯২৮, পর্যন্ত এর বিস্তার। এ-উপন্যাসের কালপঞ্জির কথা বলতে গিয়ে 'কয়েক বছর', এ-রকম অনিশ্চয়ক শব্দ ব্যবহার করতেই হয়, উপায় থাকে না এড়াবার।

কালপঞ্জি নির্দিষ্ট না-রাখা, লেখকের ঠিক সচেতন অভিপ্রায় ছিল কি-না জানি না ; কিন্তু ব্যাপারটা যে উপন্যাসের কাঠামোয় প্রক্ষিপ্ত নয়, তা স্টাইলের একটি বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায়। তা হল : ক্রিয়ার কাল হিশেবে নিত্য-বর্তমানের সর্বাধিক প্রয়োগ। অতীত কালের গল্প বলতে-বলতে তারাশঙ্কর এ উপন্যাসের দ্বিতীয় বাক্যেই (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদও এটা) একটা সেমিকোলনের পর নিত্য-বর্তমানে চলে এসেছেন :

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে **বসিল** ; টানিয়াই **যায়**, আর কি যেন **ভাবে**।' (*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৩)

আবার, ঠিক তার পরের লাইনগুলোতেও দেখি অতীত থেকে নিত্য-বর্তমানে—কালান্তরে—চলে আসার এই রীতি :

পত্নী দামিনী হাতখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল, কি ভাবছো বল তো ?
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে, হুঁ, ভাবছি—ভাবছি কি জান, তুমিও তো অনেক দিন এসেছ, বল দেখি, গাঁ-খানা কি ছিল আর কি হল ?
'দামিনী কহে, তা সত্যি বাপু, সেই গাঁ—সবারই ঘরে গোলাভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত ; বছর বছর নটবরের যাত্রা হয়েছে ; এখন আজ খেতে কারু কাল নাই। (পৃ. ৩)।

সারা উপন্যাসে এই রীতির প্রয়োগ ব্যাপক বহুল পৌনঃপুনিক। শুধু প্রথম আড়াই পৃষ্ঠায় সমাপিকা ক্রিয়ার মোট সংখ্যা ১০০, তার মধ্যে নিত্য-বর্তমানের ক্রিয়া ৭২টি [১৫]।

নিত্য-বর্তমান কালরূপের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্থানে-স্থানে দেখতে পাই[১৬] ; কিন্তু গল্পে-উপন্যাসে এই রীতির দ্বারা সচেতন প্যাটার্ন তৈরির সূত্রপাত করেন সম্ভবত প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী'-তে (১৯২৪)[১৭]। তারপর *কল্লোল*, *কালি-কলম*-এর পাতায় এর প্রচুর ব্যবহার হতে থাকে। (অতীতের বদলে নিত্য-বর্তমান কালের ব্যবহার শুরু করা নিয়ে সেযুগে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। সর্বপ্রকার নতুনত্বের বিরোধী সজনীকান্ত আধুনিক লেখকদের এই 'রচনাভঙ্গিকে ব্যঙ্গ' করার জন্যে 'জীবনের খরস্রোতে'—গ্রন্থাকারে *অজয়* নামে প্রকাশিত—লিখতে আরম্ভ করেন [১৮]। সজনীকান্ত বলছেন, 'কিন্তু এক কিস্তি লিখিতে না লিখিতেই নিজের পাঁচে নিজে ধরা পড়ি'—ক্রমশ নিত্য-বর্তমান ক্রিয়াপদের অনুরাগী হয়ে ওঠেন সমালোচক স্বয়ং [১৯]।

কল্লোল-এ প্রকাশিত তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি'-তেও (১৯২৮) নিত্য-বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত। কিন্তু 'রসকলি'-র সঙ্গে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র তফাত আছে এর ব্যবহার-রীতিতে। 'রসকলি'-তে নিত্য-বর্তমানের ক্রিয়া ছিল—অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় বলা চলে—'একটা বাগ্‌ভঙ্গি' [২০] ; কখনো-কখনো অভ্যাসদ্যোতক, কিন্তু আসলে বাংলা অতীত কালের ক্রিয়ার ধ্বনিগত একঘেয়েমি আর শ্লথতা থেকে পরিত্রাণের উপায়; ভালো অর্থে অলংকরণ। কিন্তু *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে শুধু তা নয় ; এখানে কালের এই হেরফের বিন্যাসের অঙ্গ। অর্থাৎ সমগ্র তাৎপর্যের সঙ্গে তার যোগ। কী সেই তাৎপর্য ?

নিত্য-বর্তমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বাঙলা ভাষার বৈয়াকরণ লিখেছেন : 'যে-ক্রিয়া ব্যাপার স্বভাবত, সাধারণত, নিয়মিত, সচরাচর বা নিত্য ঘটে, সেই ক্রিয়া বুঝাইতে সাধারণ বা নিত্যবর্তমান কাল-রূপের প্রয়োগ হয় [২১]।' অতীত হচ্ছে যাপিত অভিজ্ঞতার কাল ; আর নিত্য-বর্তমান যাপ্যমান অভিজ্ঞতার। সার্ত্র বলেছিলেন, অতীত কালের বাক্য যেন দ্বীপ, স্বয়ংভর বিচ্ছিন্ন [২২]। উপমাটা পালটে বলতে পারি : অতীত কালের বাক্য পূর্ণচ্ছেদের মতো ; নিত্য-বর্তমান কালের বাক্য তার পাশাপাশি স্থান পেতে থাকলে অতীতের সঙ্গে বর্তমান-ভবিষ্যতের ছেদহীন প্রবাহ রচিত হয়ে যায়।

অতএব *চৈতালী-ঘূর্ণি* জুড়ে নিত্য-বর্তমান কালের আবর্তনশীল মোজেইকের ব্যঞ্জনা সম্ভবত এই—নিরূপিত অতীতের কোনো নিঃশেষিত স্থাবর ঘটনা এ-উপন্যাসের অন্তর্বিষয় নয়, এর অন্তর্বিষয় একটি জঙ্গম প্রক্রিয়া, যা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো সাধারণ, নিত্য ঘটমান : চাষী জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে-আধাশহরে স্ফীত করছে

বেকারবাহিনীর ভিড়, কাজ নিচ্ছে কল-কারখানায় ২৩ ; সেখানে চলছে শ্রমিকের জোট বাঁধার চেষ্টা, গড়ে উঠছে শ্রমিক আন্দোলন, যা ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস।

এই সামাজিক প্রক্রিয়ার বোধে পৌঁছানো তাহলে সেই অর্জিত অভিজ্ঞতা যার চাপে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র বিন্যাস গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ একই প্রক্রিয়ার দুই অঙ্গ হিশেবে তারাশঙ্কর যখন ধ্বংসমান গ্রাম আর ভূমিষ্ঠ শ্রমিক-আন্দোলনকে দেখলেন, তখন উপন্যাসের সামগ্রিক বিন্যাসে মিলে গেল এই দুটো পৃথক থীম আর তাদের দুই পৃথক প্রতীক। 'শ্মশানের পথে'-র *চৈতালী-ঘূর্ণি*'-তে রূপান্তরের পেছনে নিহিত রয়েছে এই পূর্ণতর সমাজবীক্ষায় পৌঁছানোর ইতিহাস। 'শ্মশানের পথে'-র থীম ছিল চাষীর সর্বস্বান্ত-ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ; শ্রমিক-থীম সেখানে আসে নি। অন্যদিকে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র উপজীব্য : চাষীর শ্রমিক-হয়ে-যাওয়ার প্রক্রিয়া আর অঙ্কুরিত শ্রমিক-আন্দোলন। 'শ্মশানের পথে'-র বদলে *চৈতালী-ঘূর্ণি* নাম দেওয়া থেকে বোঝা যায় এখন কোন্ প্রতীকের উপর লেখক ঝোঁক দিতে চাইছেন। এ তথ্যও তাৎপর্যহীন নয় যে উপন্যাসে চৈত্রের ঝড়ের উপমান শেষ বার ব্যবহৃত হয়েছে মজুর-ধর্মঘটের প্রসঙ্গেই। সমাজ পাল্টানোর প্রক্রিয়ায় শ্রমিক আর শ্রমিক-আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে নবীন এক ধরনের বোধ চৈতালী-ঘূর্ণি প্রতীকের মূলে।

উপরে *চৈতালী-ঘূর্ণি-র* কাঠামোর বিশ্লেষণ থেকে এর তাৎপর্য সম্বন্ধে যে-ধারণায় পৌঁছেছি, তার সমর্থন পাওয়া যায় সমসাময়িক কয়েকটি বিজ্ঞাপন থেকে। এরকম চারটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করি :

১ লেখকের অপর একখানি বই/'চৈতালী-ঘূর্ণি'/ কৃষক ও শ্রমিক জাগরণমূলক উপন্যাস। /—*পাষাণপুরী* প্রথম সংস্করণের ফ্লাই-লিফ, ১৯৩৩।

২ '*চৈতালী-ঘূর্ণি* ... শ্রমিক জাগরণের অঙ্কুরের ইতিকথা'—*ছলনাময়ী*, প্রথম সংস্করণের মলাট, ১৯৩৬।

৩ পল্লী জীবনের দরদী কথাশিল্পী/ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের/ *চৈতালী-ঘূর্ণি*/ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস/ মহাকালের ইঙ্গিতে জাতীয় জীবনে যে নবধারা ধীরে ধীরে রুদ্ররূপে ফুটিয়া উঠিতেছে,—সেই রূপ-পরিচয়।—*উপাসনা*, আশ্বিন, ১৩৩৯ (১৯৩২)।

৪ পল্লীজীবনের দরদী কথাশিল্পী/ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের/ *চৈতালী-ঘূর্ণি*/ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস/ মহাকালের ইঙ্গিতে জাতীয় জীবনে যে রুদ্ররূপ ফুটিয়া উঠিতেছে,—সেই রূপ-পরিচয়।—*অভ্যুদয়*—আষাঢ় ১৩৪০ (১৯৩৩) [২৪]।

অর্থাৎ ইতিহাসের ধারায় সমাজ-জীবনে একটি নতুন রূপের বিকাশ ঘটেছে, শ্রমিক-জাগরণ এই রূপান্তরের চালিকা-শক্তি। আরও পরে আত্মস্মৃতিতে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র বক্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার অংশবিশেষ এ-সব বিজ্ঞপ্তির পাশে রাখলে তারাশঙ্করের ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

হাজার-হাজার বৎসর ধ'রে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই।...উনিশ শো ষোল-সতেরো সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশ বিপ্লব সেই

দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিলো সেইখানেই প্রথম, সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে।—*আমার সাহিত্য-জীবন*, পৃ. ৯১।

তিন

যে সমাজবোধ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র মূলাধার, তা কি কোনো ইডিওলজির অংশ ? কী সেই ইডিওলজি ? এ-প্রশ্নের নিরাকরণ জরুরি ; শুধু তাঁর সমাজবীক্ষা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্যেই নয়, উপন্যাসের তাৎপর্য বোঝার জন্যেও, কাঠামোর মূল্যায়নের জন্যেও জরুরি।

উপরের উদ্ধৃতিগুচ্ছে যে-সমাজবীক্ষার আভাস পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মার্কসবাদের মিল আছে। তবে কি *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র তারাশঙ্কর মার্কসবাদী ? এর উত্তর খোঁজার আগে, আর একটি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে নেওয়া দরকার : শ্রমিকের ভূমিকা সম্বন্ধে এক ধরনের বোধ কোন্ সময়ে তারাশঙ্করের এসেছিল ?

এই বোধোদয়ের—এবং *চৈতালী-ঘূর্ণি* রচনার—কালপঞ্জি নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা, ভুল ধারণাও, আছে। কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর স্বয়ং। তারাশঙ্করের স্মৃতিকথা পড়লে মনে হয়, জেলখানায় তিনি *চৈতালী-ঘূর্ণি* লিখেছিলেন, হয়তো শেষ করেছিলেন কারামুক্তির পর। *আমার সাহিত্য-জীবন*-এর প্রথম খণ্ডে এ-বিষয়ে চারটি উক্তি পাই :

১. ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখানা থেকে বের হলাম সেই দিনই মনে-মনে এ সংকল্প করেছিলাম। জেলখানাতেই তখন "চৈতালী-ঘূর্ণি" এবং "পাষাণপুরী" উপন্যাস দুখানি পত্তন করেছি...(পৃ. ১০)

২ জেলখানায় বসে এই ভাবনাকে ["শ্মশানের পথে"-র থীম] প্রসারিত করবাব সুযোগ পেয়েছিলাম। (পৃ. ৪৯)

৩ 'জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। "উপাসনা"-র সম্পাদক কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিলো. এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর "উপাসনা"-তেই 'চৈতালী-ঘূর্ণি' 'বের হলো। "কল্লোল", "কালিকলম" তখন নাই। (পৃ. ৪৯)।

৪ জেল থেকে বেরিয়ে 'চৈতালী-ঘূর্ণি' যখন "উপাসনা"য় বের হয়।' (পৃ. ৮৭)

সম্ভবত এই ধরনের বিবৃতির উপর নির্ভর করার জন্যে তারাশঙ্কর-গবেষকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। যেমন : ড. নিতাই বসু বলেছেন : *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সূচনা ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জেলখানাতেই শুরু করেছিলেন[২৫]।'

এ ধারণা ভুল। তারাশঙ্কর জেলে ছিলেন ১৯৩০ সালের শেষ তিন-চার মাস। আর, *চৈতালী-ঘূর্ণি উপাসনায়* বেরিয়ে যায় ১৯২৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিলের মধ্যে ; অর্থাৎ তাঁর জেলে যাবার অন্তত পাঁচ মাস আগে। অতএব, তিনি জেলে *চৈতালী-ঘূর্ণি* লেখেন নি, হয়তো জেলে—বা জেলের বাইরে এসে—মুদ্রিত পাঠের পরিমার্জন করেছিলেন।

তাহলে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর ('শ্মশানের পথে'-র প্রকাশ কাল) থেকে ১৯২৯ সালের নভেম্বরের (*চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রথম কিস্তি বেরোবার তারিখ) মধ্যে কোনো সময়ে

তারাশঙ্কর তাঁর নতুন সমাজবোধে পৌঁছেছিলেন। তাঁর মনের বিকাশে এই সময়টার গুরুত্ব খুবই বেশি। অথচ তাঁর এই সময়ের মনের ইতিহাসের অনেক জরুরি তথ্য আমাদের এখনো অজানা। অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। যেমন, আমরা জানতে চাই : কী ছিলো *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র—তাঁর প্রথম এবং সমাজ-সচেতন উপন্যাসের—অব্যবহিত প্রেরণা ? তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতিতে এর উত্তর নেই। সুতরাং আপাতত আমরা শুধু অনুমান করতে পারি—তার বেশি কিছু নয় : ১৯২৮-এর ব্যাপক শ্রমিক-ধর্মঘট ; কলকাতা কংগ্রেসে শ্রমিকদের জঙ্গী আবির্ভাব (১৯২৮) ; মীরাট মামলা উপলক্ষে শ্রমিক-নেতাদের গ্রেপ্তার (মার্চ ১৯২৯) ; ধনতন্ত্রের আবিশ্ব সংকট এবং তার পাশাপাশি নবীন রুশ-বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ও বিকাশ—যে-সব ঘটনায় শ্রমিক-আন্দোলন সেদিনের রাজনৈতিক আলোড়নের জায়মান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে—তাঁর চেতনায় হয়তো নিয়ে আসে আসন্ন ভবিষ্যতের সংকেত।

আসলে, সেদিন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-চুম্বক ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছিল চাষী-মজুরের আগমন-বার্তা। সাহিত্যিক মহলে তখন গোর্কির রচনাবলি ঘিরে প্রবল উদ্দীপনা। মাসিকপত্রে *চৈতালী-ঘূর্ণি* বেরুনোর বছর চারেক আগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক সাহিত্যিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন : 'রুশ সাহিত্যের মতো ... আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝে দাঁড়াতে[২৬]।' শরৎচন্দ্রের মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণের এই অংশ প্রায় তিন বছর পরে *কল্লোল*-এ (আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ. ৪৭৫-৭৬) উদ্ধৃত হয়েছিল।

উপাসনা-তেও *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র দ্বিতীয় কিস্তির সঙ্গে স্থান পায় গোর্কির বিষয়ে প্রবন্ধ আর তাঁর ছবি। গোর্কির *মা*-এর সঙ্গে আংশিক হলেও বিলক্ষণ মিল আছে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, গোর্কির *মা* থেকে শৈলজানন্দের মতো তারাশঙ্করও প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না।

এবারে প্রথম প্রশ্নটির আলোচনায় ফিরে আসা যাক—যে-দৃষ্টিভঙ্গি *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কাঠামো গড়ে তুলেছে, তা কি মার্কসীয় ? এ-বিষয়ে তারাশঙ্করের নিজের জবানবন্দি (১৯৫৩) প্রথমেই বিবেচিত হওয়া উচিত :

> এ নিয়ে [*চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সূত্রে] অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়ি নি। এ দেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা : তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।—*আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৯০।

কয়েক লাইন পরে আবার লিখেছেন :

> তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের (কর্মফলতত্ত্ব) সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের

সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফৎ জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ। যদুবংশের বিপদের মত।—পৃ. ৯১।

তিনটে কথা বেরিয়ে আসে : ১ তারাশঙ্করের 'সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'। মার্কসবাদের প্রসঙ্গে বললেও, তাঁর সাহিত্যচর্চায় এই বিবৃতির ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁর সম্বল, তাঁর কাছে প্রত্যক্ষণের (পারসেপশন) মূল্য পরম। আর, প্রত্যক্ষণই তারাশঙ্করের শক্তির উৎস ; মনন নয়, ধারণা-নির্মাণ নয়[২৭]। পুঁথি বা শাস্ত্র ঠুলি হয়ে উঠলে, তা শিল্পীর পক্ষে ত্যাজ্য, ঠিকই। এ-ও সত্যি যে অপ্রত্যক্ষের পশ্চাদ্ধাবনের তুলনায় প্রত্যক্ষের আশ্রয় বহুগুণে নিরাপদ। আর এ-কথাও ঠিক যে প্রত্যক্ষণ বিনা কল্পনা অচল। কিন্তু প্রত্যক্ষের পুরানো সীমা ক্রমাগত ভেঙে দেওয়াও আবার কল্পনার কাজ। আর, নিছক প্রত্যক্ষকে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে—চূড়ান্ত বলে শিরোধার্য করলে ন্যাচারালিজম বা প্রাকৃতিকতার কানা গলিতে গিয়ে পড়ার আশংকা থেকে যায়। আসলে, প্রত্যক্ষণের সঙ্গে মননের আমূল বিচ্ছেদ ঘটানো, যান্ত্রিক ভাবনার লক্ষণ; কারণ মনন-প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক, অন্যোন্য। লক্ষ্য, মূল্যবোধ, ইডিওলজি—মননের এই সব ফসল—প্রত্যক্ষণ-ক্রিয়াকে মুক্তি দেয়, পূর্ণতা দেয়, অভিজ্ঞতাকে দেয় তাৎপর্য আর আয়তন[২৮]। ২ মার্কসের কোনো মূল লেখা তারাশঙ্কর কখনও পড়েন নি ; মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর যতটুকু জ্ঞান, তা গড়ে উঠেছিল কিছু বাংলা প্রবন্ধের মারফৎ। আমার বলার অভিপ্রায় এ নয় যে বাংলা প্রবন্ধ পড়ে মার্কসবাদের মূলমর্ম জানা অসম্ভব ; বরং তা খুবই সম্ভবপর। তাছাড়া, শিল্পী-সাহিত্যিক জ্ঞানে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ায় কোন্ উপকরণের সাহায্য নেবেন, তার কোনো বিধিবদ্ধ সিলেবাস নেই : এলিয়ট একদা বলেছিলেন, শুধু প্লুটার্ক পড়েই শেকসপীয়র ইতিহাসের যা নির্যাস আহরণ করেন, অধিকাংশ লোক সমস্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম শেষ করেও তা পায় না। (দ্র. The Sacred Wood, University Paperbacks, London, 1964, p. 52)। আপাতত আমি শুধু দেখাতে চাই, তারাশঙ্কর নিজে জানাচ্ছেন যে তিনি মার্কসবাদের রীতিমত চর্চা কখনও করেন নি। ৩ 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি আছে'—কেবল এই তত্ত্বটি ছাড়া মার্কসবাদকে তিনি এখানে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছেন। (তারাশঙ্করের বিবরণে কিছু বিষয় আছে, যা সমালোচ্য। যেমন, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মার্কসবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ডিটারমিনিজম একাকার হয়ে গেছে। উপরন্তু 'বস্তুবাদ-সর্বস্বতা' আর 'পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্য'-ও মার্কসবাদের স্বরূপ-লক্ষণ নয়। অর্থাৎ যে-ডায়ালেকটিক্স মার্কসীয় দর্শনের অন্তঃসার, তা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে তারাশঙ্করের বয়ানে।)

অবশ্য এই প্রত্যাখ্যান *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সমকালীন নয় ; বাইশ বছর পরের। সুতরাং অনেকে সংগত আপত্তি তুলতে পারেন, উপরের উদ্ধৃতিগুচ্ছে ১৯৩১ সালের তারাশঙ্করের

সমাজচিন্তার ছাপ নেই, ছাপ আছে পরবর্তীকালীন তারাশঙ্করের। তাছাড়া, সাহিত্যিকের সমাজদর্শন গল্পে-উপন্যাসে যতটা প্রত্যক্ষ আকার পায়, এ-ধরনের বিমূর্ত বিবৃতিতে ততটা নয়। এ-সব কারণে উপন্যাসের সাক্ষ্যই যাচিয়ে দেখা যাক।

উপাসনা পত্রিকায় *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র যে আদি পাঠ পাওয়া যায়, তাতে সুরেন-শিবকালীর চরিত্র নেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে এই মধ্যবিত্ত চরিত্র দুটি যোজিত হয় : 'শিবকালী কেরানি, আর সুরেন টাইপিষ্ট' (*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৬১)। এরা শ্রমিক-ইউনিয়নের সংগঠক। শ্রমিকদের মধ্যে চেতনাসঞ্চারের প্রক্রিয়ায় কনভেয়র বেল্টের কাজ করছে এই দুই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : শ্রেণীচেতনা সঞ্চার বিষয়ে সুরেন-শিবকালীর মনোভাব কী ? তারাশঙ্করেরই বা মনোভাব কী? উপন্যাসে এ-বিষয়ে সুরেন-শিবকালীর একটি সংলাপ আছে। এই সংলাপে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার শিবকালীর কথার উপর। কারণ, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র শেষের দিকে তারই মারফৎ তারাশঙ্করের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া-মন্তব্য-মূল্যবোধ অনেকাংশে ব্যক্ত ; সে-ই হয়ে উঠেছে লেখকের প্রধান মুখপাত্র।

> সহসা সুরেন কহে, ওদের [শ্রমিকদের] এখন চাই সেল্ফ-কনশাস্নেস ; আত্মবিস্মৃতি না-টুটলে জাগরণ আসবে না ; শিক্ষার ব্যবস্থা না-হলে তা হবে না, নাইট স্কুল স্টার্ট ক'বে ফেলা যাক।
> শিবকালী বলে, এদের জন্য তার প্রয়োজন নেই, সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। লঘু মেঘ, সে হল বাষ্প, তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড় এসে তাদের মিলিত ক'রে দেয়, বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৬৫।

শিবকালী কী বলছে ? সে বলছে, শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা-সঞ্চার প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই ; নাইট-স্কুল ইত্যাদির মারফৎ চেতনা-উন্মেষের আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার পরামর্শ : অনুকূল পরিস্থিতির জন্যে প্রতীক্ষা করো। বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক ঝড়ের মতো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে সেই অনুকূল পরিস্থিতি আসবে, যার স্বয়ংক্রিয় ইন্দ্রজালে ঘটবে বজ্রবিদ্যুন্ময় বিস্ফোরণ। এই সংলাপের কিছু পরেই শিবকালী এই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছে, বাউরি-শ্রমিকদের মধ্যে সুরেনের নিষ্ফল সংগঠন-চেষ্টার সূত্রে। সে বলেছে, 'কেন মিছে চেষ্টা করছ, সুরেন, চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না ; দেখেছ, আকাশে আকাশে মেঘ আসে, চ'লে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুমণ্ডল চাপ দেয় সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।'—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ ৬৫।

স্বতঃস্ফূর্ততার এই নতজানু আরাধনা মার্কসবাদবিরোধী। চৈতন্যের ভূমিকাকে গৌণ ক'রে দেখা আর ইকনমিজম—অর্থাৎ আর্থিক দাবি-দাওয়ার সংকীর্ণ লড়াইয়ে শ্রমিক-আন্দোলনকে গণ্ডিবদ্ধ ক'রে রাখা—এই স্বতঃস্ফুরণবাদের অঙ্গ। আর এরই বিরুদ্ধে লেনিনকে একদা সর্বাত্মক লড়াই চালাতে হয় ; *কী করতে হবে* (১৯০২) নামক বিখ্যাত বই এই উদ্দেশ্যেই তিনি লিখেছিলেন।

স্বতঃস্ফুরণবাদের ঊর্ধ্বে ওঠে নি, এই উপন্যাসের শ্রমিক-আন্দোলন। স্বভাবতই শ্রেণী-সচেতনতা *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে খুবই প্রাথমিক, প্রায় অলক্ষ্য। আসলে, শ্রেণী-

সচেতনতা সম্পর্কে তারাশঙ্করের ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদী ধারণার তফাত আছে। লুকাচ শ্রমিক-বিশেষের, এমন কি শ্রমিক-সাধারণের, মনস্তাত্ত্বিক চেতনার ('সাইকোলজিক্যাল কনশাসনেস') সঙ্গে যথার্থ শ্রেণী-সচেতনতার বা সঞ্চারিত শ্রেণী-চেতনার পার্থক্য দেখিয়েছেন[২৯]। প্রচারের ধরন, লড়াইয়ের লক্ষ্য ও উপলক্ষ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র শ্রেণীবোধ এই মনস্তাত্ত্বিক চেতনার আদিম স্তরে আবদ্ধ। সুরেন-শিবকালীর প্রচারের স্লোগানগুলো কী ?

বাবুরা বলে, মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় কারা ?
তোমরা।
আগুনের সঙ্গে লড়াই ক'রে কল চালায় কাবা ?
তোমরা।
মাটির ভেতর খনির অন্ধকূপে. সোনা, রুপো. হীরে, জহরৎ খুঁড়ে বের করে কারা ?
তোমরা।
তোমরা হচ্ছ দুনিয়ার হাত, তোমরা দুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে দুনিয়া খায়।—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৬৪-৬৫।

প্রশ্নোত্তর-পরম্পরায় সাজানো স্লোগানগুলোর দুটো পরস্পর-সম্পৃক্ত লক্ষণ আছে : একদিকে, প্রত্যেকটি স্লোগান বড়ো বেশি সাধারণ ; ধান-কল শ্রমিকদের দিন-রাতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন[৩০]। অন্যদিকে আবার যথেষ্ট সাধারণীকৃতও নয়, এই প্রচার-পদ্ধতি। অর্থাৎ এইসব স্লোগানে শ্রমশক্তির গুরুত্বেরও কথা আছে ; গরিমারও বার্তা আছে ; কিন্তু এমন কোনো কথা নেই, যাতে সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে বোধ জন্মায় ; অথচ সেই বোধই শ্রেণীসচেতনতার সারাৎসার[৩১]।

যে-ধর্মঘট *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র ক্লাইম্যাকস, তার লক্ষ্য ও উপলক্ষ—দুই-ই—মজুরি-বৃদ্ধির দাবি। আর্থিক লড়াই অপরিহার্য ; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তার লক্ষ্য কী ? পরিপ্রেক্ষিত কী ? মার্কসবাদে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে, এ-সব পৃথক-পৃথক লড়াইকে সামগ্রিক শোষণ-ব্যবস্থা নির্মূল করার লক্ষ্যে সঞ্চালিত করার উপর ; শ্রমিক-শ্রেণীর আত্মসচেতনতা সঞ্চারের অভিমুখী করার উপর। আর্থিক লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন : গুঁতোর জোরে মজুরি-বাড়ানো... আসলে ক্রীতদাসকে একটু দরাজ ইনাম দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। এতে শ্রমিক বা শ্রম, মানবিক তাৎপর্য ফিরে পায় না, ফিরে পায় না মানবিক ইমান[৩২]।' *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র আর্থিক লড়াইয়ের কথকতায় তারাশঙ্কর এমন কোনো ইঙ্গিত দেন নি, যাতে বোঝা যায় : শ্রমিকদের মনে মানবিক ইমান ফিরে পাওয়ার—মজুরি-দাসত্বের শৃঙ্খল-ভাঙার—সংকল্প জাগল ; সঞ্চারিত হল আত্মসচেতনতা। তারাশঙ্করের আখ্যানে এমন কোনো আয়তন নেই যাতে এই খণ্ড-সংগ্রাম সামাজিক সম্বন্ধ-বিন্যাসের সামগ্রিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়।

যে-সামাজিক প্রক্রিয়া *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র অন্তর্বিষয় তার সমীপবর্তী এক প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে কার্ল মার্কসের *দর্শনের দারিদ্র্য* গ্রন্থে। এইবার সেই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করলে মার্কসবাদের সঙ্গে তারাশঙ্করের সমাজদর্শনের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

> Economic conditions had first transformed the mass of the people of the country into workers. The combination of capital has created for this mass a common situation, common interests. This mass is thus already a *class* as *against capital*, but not yet *for itself*. In the struggle of which we have noted on a few phases, this mass becomes united, and constitutes itself as a class for itself. The interests it defends become class interests. But the struggle of class against class is a political struggle.[৩৩]

এই বিবরণের সঙ্গে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে বর্ণিত প্রক্রিয়া মিলিয়ে দেখা যাক। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তেও দেখছি : আর্থিক অবস্থার চাপে গ্রামের চাষী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে (অবশ্য ধানকলের মজুরের মধ্যে আধুনিক প্রলেটারিয়াটের লক্ষণ অল্পই। গ্রামের টান, চাপ, দুই-ই, তার উপর বিদ্যমান। ধানকলে সংবৎসর কাজও হয় না, আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগও যৎসামান্য)। পুঁজির মালিকের সঙ্গে আর্থিক সংঘাতও বাধছে মজুরদের। কিন্তু এই লড়াই আর্থিক স্তর ছাড়িয়ে রাজনৈতিক স্তরে তো ওঠেই নি (অথচ মার্কস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, শ্রেণী সংগ্রাম রাজনৈতিক) ; এমন কি, বাউরি মজুরদের সঙ্গে অন্য মজুরদের জাতিমূলক ভেদও লোপ পায় নি ; দানা বাঁধে নি শ্রমিক-সংহতি, যা শ্রেণীচেতনার মৌলিক লক্ষণ। সুতরাং মার্কসের বিবরণ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র শ্রমিকদের পুঁজির-সঙ্গে-দ্বন্দ্বে-লিপ্ত শ্রেণী হিসেবে অস্তিত্ব আছে (*class in itself* অথবা *class against capital*) ; কিন্তু তারা এখনও আত্মসচেতন শ্রেণীতে (*class for itself*) উত্তীর্ণ হয় নি। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে: এদের শ্রেণীচেতনা আবশ্যিক (*necessary*) নয় ; আপতিক (*contingent*)। প্রথমটি সত্তাজাত ; দ্বিতীয়টি জন্মায় শুধুই অস্তিত্ব (*existence*) থেকে। শ্রমিকশ্রেণীর সত্তা (*being*) হচ্ছে সেই অগ্নিগর্ভ বীজ যা থেকে ধনতন্ত্রের অনিবার্য, আবশ্যিক দ্বন্দ্ব জায়মান। সঞ্চারিত সত্তাবোধের বীক্ষণমঞ্চ থেকে এই দ্বন্দ্বকে দেখলে এর সামগ্রিক, আবিশ্ব রূপ ধরা পড়ে, স্পষ্ট হয়ে যায় সর্বহারাশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। নিছক অস্তিত্বের বোধ থেকে দেখলে এই দ্বন্দ্বের শুধুই তাৎক্ষণিক, ছিন্ন–ছিন্ন, সীমিত রূপ দেখতে পাওয়া সম্ভব[৩৪]।

সর্বহারার যে-শ্রেণীচেতনার উৎসার সত্তাবোধ থেকে, গোর্কির *মা* (১৯০৬) উপন্যাসে তা রূপ পেয়েছে। বিশেষত আদালতে পাভেলের জবানবন্দিকে এই আত্মসচেতনতার স্মরণীয় বিবৃতি বলা যায়। গোর্কির *মা*-এর সঙ্গে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র তুলনা সহজেই মনে আসে। শ্রমিক-আন্দোলন দুই উপন্যাসেরই উপজীব্য। ঘূর্ণিঝড়ের প্রতীকও দুই উপন্যাসেই বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক তফাত এখানে : শ্রমিকশ্রেণীর আত্মসচেতনাকে গৌণ নয়, মুখ্য করেছেন গোর্কি। *মা*-এর প্রধান থীমই হয়ে উঠেছে : শ্রেণীসচেতনতার সঞ্চার। গোর্কিকে *মা* প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন : 'এটি দরকারি বই, বহু মজুর বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এবার "মা"

পড়ে, তাদের বিশেষ উপকার হবে[৩৫]।' বাস্তবিক, রুশ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা সঞ্চারে গোর্কির এই উপন্যাসের ভূমিকা বিশাল। বাংলা দেশের শ্রমিক-আন্দোলনে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কিন্তু সমতুল্য কোনো ভূমিকা নেই[৩৬]। তার একটা কারণ হয়তো এই যে তারাশঙ্কর চৈতন্যের ভূমিকাকেই অনেকাংশে লঘু ক'রে দেখেছেন। শ্রমিক জাগরণের উপন্যাসে, শ্রমিকের আত্মসচেতনতার প্রক্রিয়া লঘুকৃত, এখানেই *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র স্ববিরোধ।

চৈতালী-ঘূর্ণি-র তারাশঙ্করের সমাজবীক্ষার সঙ্গে মার্কসবাদের সামীপ্য থাকলেও, ব্যবধান—দুস্তর ব্যবধান—যে কোথায়, তা আমরা দেখলাম। এই ব্যবধানের সমান্তরাল কিছু লক্ষণ দেখি চরিত্রায়ণে, উপন্যাসের কাঠামোয়। মার্কসের চিন্তাধারায় শ্রমিকশ্রেণী আইডিয়াল টাইপ নয়, সত্তা। সত্তা অর্জন করে নি, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কোনো শ্রমিক-চরিত্র। সত্তাবান হয়ে ওঠে নি, উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠ স্বয়ং[৩৭]। তারাশঙ্কর হয়ত গোষ্ঠর চরিত্রে শ্রমিকের আইডিয়াল টাইপ রচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গড়তে পেরেছেন : স্টিরিওটাইপ। শ্রমিক বলতে যে-সব ধারণা ভদ্রলোক-সমাজে বদ্ধমূল, বহুপ্রচলিত, গোষ্ঠ তারই সমাহার। আর আধুনিক সমাজ-মনোবিজ্ঞানের সাক্ষ্যে আমরা জানি, সমস্ত স্টিরিওটাইপের মূলে আছে সংস্কারের, অভ্যাসের ছকে আচ্ছন্ন প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ এখানে তারাশঙ্করের শুধু মনন নয়, প্রত্যক্ষণও কুণ্ঠিত, প্রতিবদ্ধ।

শুধু শ্রমকিদের চরিত্রায়ণে নয়, সাধারণভাবে উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধের একটা তফাত হয়ে গেছে প্রথমার্ধের থেকে : অভ্যস্ত ছক ভেদ ক'রে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি, সংবেদন কোনো নতুন মাত্রা আবিষ্কার করে নি, কাহিনীর এই অংশে। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কাঠামোর কেন্দ্রিক এই পার্থক্য নানাভাবে টের পাওয়া যায়। যেমন : গোষ্ঠর কৃষক-জীবনের তুলনায় তার শ্রমিক-জীবনের আখ্যান, মনে হয়, রিপোর্টাজধর্মী। কাণ্ডজ্ঞানের স্পষ্টতায় ম্যাকনিশের ভাষায়, 'lucidities of common sense'-এ দায়বদ্ধ সংবাদ, যে-সব ঘটনাকে জোড়বদ্ধ করতে পারে না, মেলাতে পারে না কার্যকারণের লজিকে, তাদের অন্বিত করে ঔপন্যাসিকের কল্পনা। সেই অন্বয়-পটীয়সী কল্পনার ভূমিকা উপন্যাসের এই অংশে নগণ্য। কাহিনীর দুই অংশের ভেদ আর একভাবে বোঝা যায়—পল্লী-জীবনের তুলনায় কারখানা-জীবনের আখ্যানে প্রতিমার সংখ্যা কম। আমরা জানি, প্রতিমার পেছনে থাকে বিচ্ছিন্ন বিষয় ও ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে নতুন সম্বন্ধের প্রত্যক্ষণ ; লেখকের নিজস্ব দৃষ্টির আলো। আর, সবচেয়ে বড় কথা বোধ করি এই, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে কৃষক আর গ্রামের আখ্যানে যে-নখদর্পণ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, তা পাই না শ্রমিক আর কারখানার বৃত্তান্তে। শুধু অভিজ্ঞতার পারিমাণিক তফাত নয়, অভিজ্ঞতার গুণগত তারতম্য—গড়নের তারতম্যও তার কারণ। অর্থাৎ এই পার্থক্যের পুরো ব্যাখ্যা কেবল এই নয় যে তারাশঙ্কর চাষীদের যত দেখেছিলেন, মজুরদের তত নয় ; অথবা শুধু এও নয় যে তিনি কয়লা-কুঠির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধান-কলের গল্প লিখেছেন। আসলে,

অভিজ্ঞতার কাঠামোর তফাত হয়ে যায় প্রত্যক্ষণের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতায়। গেস্টল্ট মনোবিজ্ঞানীদের একটি সিদ্ধান্ত এই : প্রত্যক্ষণ-প্রক্রিয়াই অসম্পৃক্ত বস্তু-বিষয়-ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ-রচনার মারফৎ তাদের অর্থপূর্ণ, সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র শেষার্ধে প্রত্যক্ষণের এই পূর্ণমুখী প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে, ইডিওলজির আনুকূল্য না-পাওয়ার জন্যে।

আত্মস্মৃতিতে *চৈতালী-ঘূর্ণি* ও মার্কসবাদ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর অহিংসায় বিশ্বাসের কথা বারংবার বলেছেন[৩৮]। তবে কি *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র ভুবন ধারণ ক'রে রেখেছে গান্ধিবাদী ইডিওলজি ? এই অনুমানের পক্ষে উপন্যাসের মধ্যে একটিই সম্ভাব্য সাক্ষ্য আছে : সুরেন-শিবকালী—যারা লেখকের মুখপাত্র এবং ঘটনাপ্রবাহের শেষাংশের ভাষ্যকার—গান্ধিবাদী। ধানকলের টিণ্ডাল শ্রদ্ধার স্বরে দু'বার (৫৯ পৃ., ৬০ পৃ.) বলেছে, 'ওরা মহাত্মাজীর চেলা'। এই শ্রদ্ধাকে লেখকের মনোভাবের পরোক্ষ অভিক্ষেপ হিশেবে ধরতেও বাধা নেই।

তবু খুব অটল নয়, এই সাক্ষ্য। চরিত্র হিশেবে সুরেন-শিবকালী নিষ্প্রাণ, দ্বিমাত্রিক; ফর্স্টর হয়তো বলবেন, ফ্ল্যাট। এরা অশরীরী বাণী। গান্ধিবাদ কিছুমাত্র প্রত্যক্ষতা পায়নি এদের চরিত্রে। আর, খদ্দর-পরা ছাড়া, গান্ধিবাদের কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ এদের ভাবনায় নেই, কথায় নেই, আচরণে নেই। শ্রমিক-ফ্রন্টে কর্মরত আর পাঁচজন শুভার্থী দেশপ্রেমিকের সঙ্গে ওদের তফাত কোথায় ? (তাছাড়া,'মহাত্মাজীর চেলা', টিণ্ডালের এই বর্ণনাকে শনাক্ত-লেবেল হিশেবে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ত ভুল হবে। কারণ, আমাদের দেশের চাষী-মজুর, সাধারণ লোকের কাছে 'মহাত্মাজীর চেলা' বলতে সর্বদা সংকীর্ণ অর্থে গান্ধিপন্থী বোঝাতো না, তাঁদের কাছে ওটা হয়ে উঠেছিল দেশব্রতীর সাধারণ নাম।)

কিন্তু উল্টো দিকেও আবার কিছু যুক্তি-তথ্য-প্রমাণ আছে। ১ যেমন : *চৈতালী-ঘূর্ণি* সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত[৩৯]: *আমার সাহিত্য-জীবন* পড়লে জানা যায়, ১৯৩১ সালে 'তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে' তারাশঙ্কর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বিশের দশকের শেষাশেষি গান্ধি-সুভাষের মত আর পথের বিভেদ—এমন কি বিরোধ—এত তীব্র হয়ে ওঠে যে ১৯৩১ সালে কোনো গান্ধিবাদীর পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে বই উৎসর্গ করা, বাংলা দেশে ঠিক অস্বাভাবিক না-হলেও ঈষৎ অপ্রত্যাশিত হত। ২ তারাশঙ্করের জীবনী খুঁটিয়ে দেখলে এমন কোনো প্রমাণ মেলে না যে *চৈতালী-ঘূর্ণি* রচনার সময়ে তিনি দীক্ষিত গান্ধিবাদী ছিলেন। অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি, বীরভূম জেলার গান্ধিবাদী কর্মীমণ্ডলীর বা কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁর এ-সময়ে যোগ ছিল না[৪০]। বরং কিছু যোগ ছিল বিপ্লবীদের (অতীন্দ্র রায়,[৪১] নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[৪২] আরও আগে নলিনী বাগচী[৪৩]) সঙ্গে ; এবং স্বরাজ্য এবং সুভাষপন্থীদের (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,[৪৪] সরোজকুমার রায়চৌধুরী,[৪৫] নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে। ৩ লেখকের মনোভাব সবচেয়ে টের পাওয়া যায় টোন বা স্বরভঙ্গি[৪৬] থেকে। গান্ধি-প্রসঙ্গ যেখানে আছে, আগে তা অংশত তুলেছি, এবারে আরও সবিস্তারে উদ্ধৃত করি :

আজ মাস্টার পড়িতেছিল, অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর। বুঝলে কত্তা, স্বরাজ হলেই আর চাই কি!

স্বরাজ মানেটা আমায় বুঝিতে দিতে পার, তবে তো বুঝি ব্যাপারটা কি ?

মানে, বুঝলে না কত্তা ? আমরাই আমাদের মালিক—রাজা, ওই ওতেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে কত্তা।...

গোষ্ঠর দুঃখার্ত মন দুঃখদূরের কথাটা ভোলে না, কহে, জমিদার-মহাজন উঠবে বলতে পার ?...

যোগী বলে, ওই যা বলেছ গোষ্ঠ, স্ববাজ-ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হতে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক। হ্যাঁ, চাচা আপন জান বাঁচা।—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ২৩।

'...বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর।' এই কথাগুলোর—বিশেষত 'শুধু বাণী পালন কর', এই বাক্যাংশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে আইরনির স্বর। তির্যক এই অ্যাসিড স্বর, শুধু খবরের কাগজ-পড়ার মজলিশের চটুলতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আইরনির আর একটা স্তর পাই, গোষ্ঠর প্রশ্নে : '[স্বরাজ হলে] জমিদার-মহাজন উঠবে বলতে পার ?' তীরের মতো তীক্ষ্ণ এই জিজ্ঞাসা স্বরাজ-চর্চার অন্তঃসার সম্পর্কেই মৌলিক প্রশ্ন তোলে। ইতিহাসের একটা আইরনিও আছে, এ-প্রশ্নের পটভূমিকায়। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) সংশোধন বিলের আলোচনায় বাংলা দেশের আইন-সভার কংগ্রেসী [স্বরাজ্য] সদস্যরা ভোট দিয়েছিলেন 'জমিদার-স্বার্থের পক্ষে[৪৭]।' স্বরাজ্য দলের এই সিদ্ধান্তে জমিদারদের পোয়া বারো হল, কপাল পুড়ল গরিব চাষীর, বিশেষত বর্গাদার আর কোর্ফা প্রজার[৪৮]। এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন : '১৯২৮ সালের আইন সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হলো বাংলার আইন-সভার কংগ্রেসী সভ্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়। এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় স্বরাজ্য দলের এক বৈঠকে একজন বিখ্যাত নেতা বলেছিলেন যে, গাছ কেটে নেবার যে টানা স্বত্ব চাষীকে দেওয়া হলো it will strike their imagination, অর্থাৎ তাতেই বাংলার চাষীরা বাংলার কংগ্রেসের চাষী-হিতৈষণায় মুগ্ধ থাকবে। বাংলার চাষী চাষা বটে, কিন্তু অতটা বোকা নয়। এরপর বাঙালী চাষীর আনুগত্য বাংলার কংগ্রেস আর ফিরে পায় নি। কিন্তু জমিদারের স্বার্থরক্ষার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হলো। ১৯২৮ সালের বিধান বেশি দিন টিকে থাকলো না। অর্থাৎ বাংলার কংগ্রেসের পিঁয়াজ ও পয়জার দু-ই হলো[৪৯]।' (অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 'এরপর বাঙালী চাষীর আনুগত্য বাংলার কংগ্রেস আর ফিরে পায় নি।' চাষীর অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং চাষীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদের মানে দাঁড়াল মুসলমান-সম্প্রদায়ের বৃহদংশের সঙ্গে স্বরাজ-আন্দোলনের বিচ্ছেদ। এইভাবে অলক্ষিতে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের বীজ-বোনাও কিছুটা হয়ে গেল ১৯২৮ সালে।)

তারাশঙ্করের ঠিক সচেতন অভিপ্রায় ছিল কি-না বলা কঠিন, তবে চাষীর কপাল-পোড়ার এই সদ্যস্মৃতি গোষ্ঠর প্রশ্নে হয়তো পরোক্ষে তাপসঞ্চার ক'রে থাকবে[৫০]। উদ্ধৃতাংশের সমগ্র টোন যা, তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত টানা যায় না যে গান্ধিবাদে ১৯২৯-৩১ সালে তারাশঙ্করের মতি বা বিশ্বাস ছিল।

অতএব, গান্ধিবাদে নিষ্ঠার কোনো ভিতরের সাক্ষ্য উপন্যাসে মূর্তি পায় নি। আসলে, ইডিওলজি, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে স্পষ্ট-সংবদ্ধতা লাভ করে নি, যদিও তাতে পৌঁছনোর প্রাথমিক পদক্ষেপ, এ উপন্যাসে দেখতে পাচ্ছি। ইডিওলজির এই অসংহতির, স্ববিরোধের, উদাহরণ পাওয়া যাবে, *চৈতালী-ঘূর্ণি* থেকে পূর্বোদ্ধৃত অংশের পরম্পরীণ এই দুই বাক্যে :

> অতকালের অত্যাচারে, অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম, সমাজ সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। শুধু জীব-জগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা, বাঁচিবার চেষ্টায় কঙ্কালগুলা পাগল।— *চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ২৩।

মজলিশধারীদের সংলাপে ছেদ টেনে এখানে তারাশঙ্কর নিজের জবানিতে তাঁর মন্তব্য পেশ করছেন। আর পেশ করছেন তাঁর পাঠক-সমাজের কাছে ; এই পাঠক-সমাজ মধ্যবিত্ত, প্রধানত শহরবাসী আর স্বরাজ-আন্দোলনের সমর্থক[৫১]। যা আমাদের হতচকিত করে, তা এই শেষ বাক্যদুটির অপ্রত্যাশিত স্বরভঙ্গি। 'কঙ্কালগুলা পাগল' : স্বরের ভঙ্গিমায় এসে পড়েছে 'কঙ্কালগুলার' [চাষীদের] জন্যে কেবল সমবেদনা নয়, অনুকম্পা। স্বরাজ-আন্দোলন যদি চাষীর বাঁচার অবলম্বন না-হয়ে ওঠে, যদি চাষীর সঙ্গে অসীম বিচ্ছেদ ঘটে থাকে এ-আন্দোলনের, তবে তার জন্যে দায়ী রাজনৈতিক এলিট, (অর্থাৎ যারা গ্রামের ভূমিস্বত্বজীবী বাবুদের মেট্রোপলিটান মুরুব্বি)। অতএব, চাষীর নিয়তি তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে ছেদ তৈরি করার জন্যে লেখকের বেদনা আর ক্রোধ আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। তার বদলে—চাষীরা স্বরাজে নিরুৎসুক, এ-কারণে ওদের সম্বন্ধে—কুণ্ঠা-জড়ানো অনুকম্পার স্বর পাঠকের-উদ্দেশে-বলা এই কথাগুলিতে এসে পড়ায় আমাদের বিমূঢ় লাগে। এই অসংগতির কারণ কী ? বোধ হয়, মধ্যবিত্ত-পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধের ডায়ালেক্‌টিকসে চাষীর সঙ্গে তাঁর সমপ্রাণতা সংবৃত হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর ইডিওলজি দ্বিধান্বিত—পুরুষার্থের মানদণ্ডে চাষীর তুলনায় যেন আরও ভারি হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের প্রতিমান। যুক্তি-চিন্তা-বাস্তবচেতনার বাঁধুনিও আলগা হয়ে গেছে ইডিওলজি আর পুরুষার্থের দ্বিধায় : 'অতকালের অত্যাচারে অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম, সমাজ সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে।' অতীতের সব ? দেশ, জাতীয়তাবাদও কি অতীতের বস্তু ?

চার

ইডিওলজির এই অসংবদ্ধতা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের সামগ্রিক ব্যাখা কী ? এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। তবে তার নিরাকরণের দিকে আরও এগোতে গেলে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র জগৎ তারাশঙ্কর

যেভাবে চিনেছেন, চিনিয়েছেন, তা বুঝে নেওয়া দরকার। বিশের দশকের শেষার্ধের ঔপনিবেশিক আমলের এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ-দশার বাংলা দেশের বাস্তব সমাজের চেহারা থেকে এই জগতের ছাঁচ তিনি তৈরি করেছেন। সুতরাং শব্দের পরে শব্দ গেঁথে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে তিনি যে-ভুবন গড়ে তুলেছেন, তা অধঃপতিত, অসুস্থ, সংকট-দীর্ণ। মার্ক ব্লক একবার বলেছিলেন : 'শরীরে রোগের বিস্তার ঘটতে থাকলে ডাক্তারের চোখে শরীরের রহস্য খুলে যায়। ঠিক তেমনি, সংকট যখন ছড়াতে থাকে, ঐতিহাসিক তখন আপন সমাজের বিষয়ে মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন[৫২]।' সামনে একটা অসুস্থ সমাজ দেখেছিলেন বলে হয়তো তার গতি আর প্রকৃতি চেনা তারাশঙ্করের পক্ষে সহজ হয়েছিল। কীভাবে তিনি এই জগৎকে দেখেছেন, বুঝেছেন, তা টের পাওয়া যাবে তাঁর প্রতিমা-ব্যবহার লক্ষ করলে। আগে বলেছি, প্রত্যেক প্রতিমার পেছনে থাকে লেখকের কল্পনার আলোয় সম্বন্ধ-নির্ণয়, সম্বন্ধ-আবিষ্কার। অর্থাৎ সাহিত্যিকের প্রতিমা আর সমাজবিজ্ঞানীর হাইপথিসিস বা প্রকল্প সামমানিক[৫৩]। আর প্রত্যেক প্রতিমায় প্রকল্পের মতোই, অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় লেখকের ইডিওলজি, মূল্যবোধ, মূল্যায়ন।

চৈতালী-ঘূর্ণি-র প্রতিমাবলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে, সব চেয়ে বড়ো যে-শ্রেণী, সেটা জন্তুপ্রতিমার। অর্থাৎ প্রতিমার উপমান হিশেবে সব চেয়ে বেশি বার—আটাশ বার—ব্যবহৃত হয়েছে শকুনি-শিয়াল-সাপ-বাঘ-ভাল্লুক-কুকুর-বেড়াল-গোরু-বাদুড়, এই সব জীবজন্তু। শুধু *চৈতালী-ঘূর্ণি* নয়, ১৯২৮-৩৮, এই পর্বের অন্যান্য উপন্যাসেও—*পাষাণপুরী*, *নীলকণ্ঠ*, *রাইকমল*, *প্রেম ও প্রয়োজন*-এও—এই জাতীয় প্রতিমা পরিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, পরের পর্বের উপন্যাসেও এদের ব্যবহার প্রচুর। সমগ্রত তারাশঙ্করের উপন্যাসে জন্তুপ্রতিমার গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে তাঁর প্রথম উপন্যাসের শুধু এ-ধরনের প্রতিমা সম্পর্কে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।

গড়নের বিচারে প্রতিমা দুই ধরনের : ১ সাদৃশ্য-দেখানো প্রতিমা (ক খ-এর মতো) এবং ২ শনাক্ত-করানো প্রতিমা (ক হচ্ছে খ)[৫৪]। কিন্তু উপন্যাসে প্রকল্পের আয়তন পেলে অনেক সাদৃশ্য-দেখানো প্রতিমাও বোধ হয় শনাক্তকারক হয়ে ওঠে। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র গোড়ার দিকেই আমরা একটি প্রকল্প-প্রতিমা পাচ্ছি। এখানে নায়ক যে-প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, সেটা তারাশঙ্করের একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন : চাষী নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে কেন? মাত্র বারোটি বাক্যের সংহত পরিসরের মধ্যে এই প্রশ্নের পরিক্রমায় এতটা সহজ নৈপুণ্য আর সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির ছাপ পড়েছে যে মনে হয় কথাগুলো যেন পরিণত তারাশঙ্করের কলমে লেখা :

> গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়ার সঙ্গ ধরিয়াছিল। গোষ্ঠ কহিল, খুড়ো, খেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভালো ছিল না ? খুড়া চ্যাঙারিসুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর পানে তাকায় ; তারপর বলে, হ্যাঁ, অবস্থা তার ভালো ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভাল ছিল।
>
> গোষ্ঠ কহে, আচ্ছা খুড়ো, সে সব ধান ধন গেল কোথায় বল দেখি ?
>
> ঠিক পাশের আখের খেতটার ভিতরে শব্দ ওঠে মড়মড় খসখস ; গোষ্ঠ কহে, কে আখ ভাঙছে কে রে, কে ? কচি আখ ভাঙে কে ?

ভিতর হইতে সে লোকটা হুংকার ছাড়িয়া উঠে, তোর বাপ রে হারামজাদা।
গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে, বাঘে ধান খায়, তো তাড়ায় কে ? ভাঙো বাবা, জমি সুদ্ধু তুলে নিয়ে যাও।
যে-লোকটা আখ ভাঙিতেছিলো, সে জমিদারের চাপরাসী। খুড়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, দেখলি গোষ্ঠ ধন ধান গেলো কোথা ? ওই দশজনে লুটেই খেলে।'—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৮।

চাষীর ধান ধন গেল কোথায় ? বাঘের প্রতিমা বলপ্রমত্ত লুঠেরাকে শনাক্ত ক'রে দিচ্ছে : চাষীর শ্রমজ আত্মসাৎ করছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার। পুঁজিপতির শোষণপ্রক্রিয়ার মধ্যে হয়তো একটা অর্থনৈতিক বিমূর্ততা, পরোক্ষতা, আছে ; কিন্তু জমিদারের আত্মসাৎকরণের রীতি প্রত্যক্ষ, জবরদস্ত্‌। আর প্রবল এই বাঘের গ্রাসের সামনে চাষী অসহায়।

উপরের উদ্ধৃত অংশে জমিদার স্বয়ং গরহাজির, তবে তার দাপট ফুটেছে পেয়াদার মারফৎ। আসলে, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র একটা লক্ষণীয় ব্যাপারই হল, এ-উপন্যাসে জমিদারের চরিত্র তারাশঙ্কর সরাসরি আনেন নি ; ধানকলের মালিককেও না (*উপাসনা* পত্রিকায়-ধৃত পাঠে মারোয়াড়ি-মালিকের একটা স্টিরিওটাইপ ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে তা বর্জিত হয়েছে)। স্বশরীরে হাজির না-থাকলেও, জমিদার *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে প্রবল দাপটে বিরাজমান। পরে (পৃ. ২০) বাঘের সঙ্গে জমিদারকে আরও একবার শনাক্ত করা হয়েছে ; 'বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে ?'—এই প্রবচন-প্রশ্নটিও সেখানে ঘুরে এসেছে আবার ; আর সেখানে জমিদারের দাপের সামনে চাষীর পুরুষানুক্রমিক অসহায় সন্ত্রাসও স্পষ্ট।

চাষী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কীভাবে ?—উপন্যাসের প্রথমার্ধে এই প্রশ্ন যেন সার্বভৌম আয়তন পেয়েছে। আর এই প্রশ্নেরও জবাব তারাশঙ্কর দিয়েছেন প্রকল্প-প্রতিমার মাধ্যমে। আমরা দেখেছি, ধ্বংসের দিকে কৃষকের প্রায়-অনিবার্য গতির প্রতীক হয়ে উঠেছে প্রসরমাণ শ্মশান। এই শ্মশানের অঙ্গ হিশেবে ঘুরে-ফিরে এসেছে শকুনি-শিয়াল-কুকুরের প্রতিমা। সাতবার এই শ্মশানাঙ্গ প্রতিমার প্রত্যাবর্তন থেকে এক ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। শ্মশানচারী জন্তুর প্রতিমা-জাত এই প্যাটার্ন দুটো কাজ করছে উপন্যাসের প্রথমাংশে : ১ শ্মশানের পরিবেশ প্রত্যক্ষ ক'রে তুলছে, ২ কৃষকের হন্তারক রূপে শনাক্ত ক'রে দিচ্ছে জমিদারি আর মহাজনি-ব্যবস্থাকে।

জমিদার-নায়েব-গোমস্তা-পাইক-পেয়াদা নিয়ে খাজনা আর আবওয়াব-ভোগী যে-জমিদারিযন্ত্র, তারাশঙ্কর তার উপমান খুঁজে পেয়েছেন এই আগ্রাসী শ্মশানে বিচরণশীল কুকুরের মধ্যে :

বাবের আর অন্ত নাই, সে বাবের এক কানাকড়িও মাফ নাই। সব লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, অনন্ত ক্ষুধায় শ্মশানের কুকুরগুলার মতই জিভগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, লালসায় উষ্ণ বিষের মতো লালা গড়াইতেছে।

গোষ্ঠর দেহের হাড়গুলা অবধি কনকন করিয়া উঠিল, উঃ। এতগুলো তীক্ষ্ণ, হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে।—*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৩৪।

'বাব' বা 'আবওয়াব' হচ্ছে নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত যে টাকা প্রজাদের কাছে নানান খাতে-ফিকিরে জমিদাররা আদায় করত ; অর্থাৎ বাজে আদায়। বাবকে অবৈধ ফিউডাল খাজনা বলা যেতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোয় বাব ছিল চাষীর রক্তমোক্ষণের হাতিয়ার। বাবের বহর সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক পেশ করলে এই রক্তমোক্ষণের মাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। ১৯৩৭ সালে বাংলার আইন-সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে একজন ওয়াকিবহাল সদস্য মোট আবওয়াবের পরিমাণ নির্ধারণ করেন বারো কোটি টাকা [৫৫]। সেটলমেন্ট রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাখরগঞ্জ জেলার বার্ষিক বাবের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বেরও[৫৬] বেশি। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় একটি উদাহরণ দিয়েছেন : নিজের মামলা-খরচ তোলার জন্যে জনৈক জমিদার যে-বাব চাপায়, তার পরিমাণ মোট বৈধ খাজনার দেড় গুণ[৫৭]।

'বাবের আর অন্ত নাই'। তারাশঙ্কর একটা আংশিক ফিরিস্তি দিয়েছেন *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে: 'আবার খাজনা তাহাও বাকি ; মনে পড়ে খাজনা,মামুলি চাঁদা, সেস, সুদ, চেকের দাম, নজরানা, তলবানা, তহুরী, আমলা-খরচ, থিয়েটার-বৃত্তি' (পৃ. ৩৪)। এই তালিকার শেষ দুটি বাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা যোগ করব। 'আমলা-খরচ' মানে নায়েব-গোমস্তা পোষণের জন্যে চাষীর উপর চাপানো আবওয়াব। বীরভূমের সেটলমেন্ট রিপোর্টে (১৯২৪-৩২) এ-রকম একটা বিচিত্র বাবের বিবরণ আছে : 'চিরস্থায়ী নায়েব খরচ'। 'চিরস্থায়ী' নাম দিয়ে বীরভূমের জমিদার দাবি করছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার সময় থেকে—খোদ লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল থেকে—এই বাব উশুল হয়ে আসছে, অতএব এটা বৈধ আদায়[৫৮] ! আর 'থিয়েটার-বৃত্তি' হল বাবুদের নাটকের সখ মেটানোর জন্যে চাষীর দেয় আবওয়াব ; যাকে বলে সংস্কৃতি-চর্চার মাশুল[৫৯]।

সুতরাং তারাশঙ্কর জমিদারি-যন্ত্রের সঙ্গে শ্মশান-কুকুরের যে-সারূপ্যসন্ধান করেছেন, তা সংগত। কৃন্তক ছেদক পেষক : সব জাতের দাঁতই বিদ্যমান ছিল জমিদারি-যন্ত্রের চোয়ালে। আর এই দাঁতের পেষণে মৃত্যুযাত্রী কৃষকের যন্ত্রণা ধ্বনিত হয়েছে গোষ্ঠর অনুভূতিতে : 'গোষ্ঠর দেহের হাড়গুলা অবধি কনকন করিয়া উঠিল, উঃ। এতগুলা তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে !'

এই শ্মশানের শিয়াল হচ্ছে মহাজন, আর শকুনি, কাবুলিওয়ালা [৬০] :

১ কাবুলির দল শকুনির মতো চীৎকারে খাটো-খাটো বাংলায় হাঁকে...। (পৃ. ৫)।

২ দত্ত, রসিক দত্ত গ্রামের মহাজন, লোকে কহে মহাযম। তীক্ষ্ণদন্ত শৃগালের মতোই কঙ্কালঢাকা চামড়াটুকু লইয়া টানাটানি করে। (পৃ. ১৪)

এই বাঘ-কুকুর-শিয়াল-শকুনির যৌথ তৎপরতায় জমি থেকে কৃষক-উৎসাদনের যে-প্রক্রিয়া *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে দেখতে পাই, তা ১৯২১-৩১, এই দশকের গ্রাম-বাংলার বাস্তব ছবি। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র কাহিনীকালের অনেকটা সমান্তরাল :

এই দশকে কৃষক-উচ্ছেদের প্রক্রিয়া ব্যাপক হয়ে ওঠে। ১৯২১ আর ১৯৩১ সালের সেন্সাস থেকে নিচের তথ্য পাওয়া যায়[৬১] :

	১৯২১	১৯৩১
জমিদার এবং খাজনাভোগী (non-cultivating proprietors taking rent in money or kind)	৩৯০, ৫৬২	৬৩৩, ৮৩৪
মালিক-চাষী (cultivating owner's) বা রায়ত-চাষী (tenant cultivators)	৯,২৭৪,৯২৪	৬,০৪১,৪৯৫
খেত-মজুর	১,০৮৫,৭০২	২,৭১৮,৯৩৯

দেখা যাচ্ছে, দশ বছরে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা প্রায় ৫০% এবং মালিকচাষী বা টেন্যান্টের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৩৫%; একই সময়ে খাজনাভোগী শ্রেণী প্রায় ৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে[৬২]। এই তথ্যাবলি থেকে চাষীর ভূমিচ্যুত হওয়ার প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। খাজনাভোগী শ্রেণীর বিবর্ধন এবং মালিক-চাষীর অবক্ষয় কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রমিক বিপর্যয়ের সূচক-চিহ্ন। শকুনি-শিয়াল-কুকুর অধ্যুষিত *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র আগ্রাসী শ্মশান এই ক্রমিক বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি।

সুতরাং আমরা দেখলাম : *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র অধঃপতিত এবং প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন হিংসায় ভরা ভুবনকে তারাশঙ্কর বুঝেছেন, চিনেছেন, শনাক্ত করেছেন, অনেকাংশে জন্তুপ্রতিমার মাধ্যমে। এই কাজে প্রতিমার প্রয়োগ লক্ষ করলে বোঝা যাবে, একটা সূক্ষ্ম মূল্যমান (কখনো সচেতন, কখনো-বা অচেতন-ভাবে) এই সব প্রতিমার মূলে সক্রিয়। শনাক্তকারক প্রতিমাগুলোর গড়নে পশুত্বের স্তর-পরম্পরার একটা কাঠামো আছে। এই 'মূল্যায়ন'-পিরামিডের সব চেয়ে উপরে জমিদার, বাঘ যার উপমান। সে লুণ্ঠক, হিংস্র হলেও দাপট-দৃপ্ত, অভিজাত। নিপীড়ক বলে চিনলেও, তার জান্তব আভিজাত্য সম্বন্ধে হয়ত এক ধরনের সম্ভ্রম তারাশঙ্করের মনে বদ্ধমূল ছিল।

মধ্যে পড়ে মাঝারি উৎপীড়কগণ। যেমন, জমিদারের পেয়াদা, তারাশঙ্কর যার সঙ্গে সামীপ্য দেখেছেন কুকুরের। অথবা, ধান-কলের সেই বুড়ো খাজাঞ্চি, যে শ্রমিকদের মজুরি কাটে আর কামের তাড়নায় বাউরি মেয়ে-শ্রমিকদের আস্তানায় হানা দেয়। তার সঙ্গে তারাশঙ্কর অভেদ খুঁজে পেয়েছেন ভাল্লুকের (পৃ. ৫৪, ৭৯)।

আর সব চেয়ে নিচে মহাজনের স্থান। নির্মমভাবে সুদ উশুল করা সত্ত্বেও, গোষ্ঠর চাষের জমি রসিক দত্ত নিলাম ক'রে নিল। কেবল গোষ্ঠরই নয়, গাঁয়ের ছেলেরা বলে, 'চাকলার জমিটা' সে হাতিয়ে নিয়েছে 'কাঁকুড়চুরি...ক'রে' (পৃ. ৩১)[৬৩]। এ শুধু ব্যক্তিগত শয়তানি নয় ; সমাজে তার ভূমিকা অশুভ : চাষীর জমি মহাজনের কবলে যাওয়া উৎপাদনের পরিপন্থী। 'No Class flourishes so impudently as

this class, and it often seems as though the land laws were especially devised to enable them to prey upon the peasant.'[৬৪]। সে যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোটা মহাজন ব্যবহার করেছে চাষীর জমি-গ্রাসের উদ্দেশ্যে। জমিদারের সঙ্গে মহাজনের এই গাঁটছড়া বাঁধার ইঙ্গিত আছে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে : '...ধুত্তু শেয়াল, টাকায় জমিদারকে বশ করেছে' (পৃ. ২০)। মহাজন-জমিদারের যোগসাজশের সামনে চাষীর নিরুপায় উৎসাদন ছাড়া পথ ছিল না। (আবার আধুনিক জোতদারের জন্মবৃদ্ধির মূলেও তেজারতির দান কম নয়।) স্বভাবত এই মহাজন সম্পর্কেই তারাশঙ্করের জ্বলন্ততম ঘৃণা। তার প্রসঙ্গেই জন্তুপ্রতিমা সব চেয়ে বেশি বার ব্যবহৃত : শিয়াল (পৃ. ১৪, ২০), বেড়াল (পৃ. ৩১), বাদুড় (পৃ. ৩২), আরও নানারকম কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ তার উপমান। লোকস্মৃতিতে ক্রূরতম, ঘৃণ্যতম প্রাণী সাপের সঙ্গে তার একাত্মতা দেখিয়েছেন তিনি দু'বার :

১ দত্তর খর জিহ্বা সাপের জিহ্বার মতোই তীক্ষ্ণ, ঘন-ঘন লকলক করিয়া নড়ে। (পৃ. ১৫)

২ গরম তেলের নামে (মহাজনের) লম্বা লিকলিকে শরীরখানা আহত সরীসৃপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে। (পৃ. ৩২)।

উপন্যাসের স্বরভঙ্গিতে যেমন, প্রতিমাতেও তেমন, ইডিওলজির দ্বন্দ্ব দ্বিধা অসংলগ্নতা জায়গায়-জায়গায়—অতর্কিতে—হয়তো অচেতনভাবে—ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। কিছু মজুর যখন ধানকলের ধর্মঘট ভেঙে মালিকের কাছে মাথা নোয়াতে যায়, তখন শ্রমিকনেতাদের প্রতিক্রিয়া তারাশঙ্কর এইভাবে ফোটাতে চেয়েছেন :

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ফায়ারম্যান—এমনই জনকতক বিবরে রুদ্ধ সাপের মতো গর্জায়, পেটের আগুনের শিখা অনশন-সূক্ষ্ম চোখের শিখায় নাচে। (পৃ. ৮১)

চৈতালী-ঘূর্ণি-তেই যে-লেখক লিখেছেন 'পাপ, সাপেরই মত তাহার প্রকৃতি' (পৃ. ৩৬) ; অথবা যিনি মহাজনকে শনাক্ত করেন সাপের সঙ্গে, তিনি যদি আবার সাপেরই মধ্যে শ্রমিক-নেতাদেরও প্রতিরূপ খুঁজে পান, তাহলে বুঝতে হবে, ইডিওলজির, পুরুষার্থের অন্তঃসংগতি টলে গেছে কোথাও।

এতক্ষণ প্রতিমাগুলোর মানে খুঁজছিলাম পৃথক পৃথকভাবে ; এবার এই প্রতিমাশ্রেণীর সামগ্রিক তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করব।

মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে : এ হল পশু-পাখি-সরীসৃপের প্রতিমায় উপন্যাস পরিকীর্ণ ক'রে দেওয়ার সহজ, সাধারণ মানে[৬৫]। 'মানুষগুলোর বুকের নগ্ন পশুত্ব...জাগিয়া উঠে' (পৃ. ৫৩), এ-জাতীয় বিবৃতি-বাক্য এই মানেকে স্পষ্ট ক'রে দেয়। গভীরতর স্তরে অন্য এক তাৎপর্যও আছে, এই জন্তুপ্রতিমাবলির। সমষ্টিগতভাবে, এই প্রতিমাশ্রেণী হয়ে উঠেছে সমাজব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যার প্রকল্প : একটা সমগ্র সমাজের মানবিক থেকে জান্তব পর্যায়ে অবনয়নের চিত্ররূপ। এই সমাজদার্শনিক তাৎপর্য ক্রমে-ক্রমে খুলে যায়, ১৯২৮-৩৮ পর্বের উপন্যাসগুলোকে পর-পর পড়ে গেলে, বিশেষত আরও পরবর্তীকালের উপন্যাস *গণদেবতা* (১৯৪২) *পঞ্চগ্রাম*-এর

(১৯৪৩) সাহায্য নিলে। যেহেতু এখন *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র চৌহদ্দির মধ্যে আমার আলোচনা নিবদ্ধ রাখছি, আমি উপন্যাস থেকে উপন্যাসে এই তাৎপর্য-সূত্র ধারাবাহিকভাবে অনুধাবনের চেষ্টা আপাতত করব না। তবে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস থেকেই : *চৈতালী-ঘূর্ণি* থেকেই যেমন জন্তুপ্রতিমা বারবার ঘুরে এসেছে, তেমন, সমান্তরাল স্তরে, প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে বাণিজ্যিক বিকিকিনির থীম :

১ দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া উঠিল।
সাতু ছিছিকার করে কেন ? তবে কি এই বিকিকিনির কাহিনী—দামিনীর বাক্য ফুটিল না, সাতুর মুখপানে চাহিয়া রহিল—বিহ্বল দৃষ্টি। (পৃ. ৩৭)

আবার পরের পৃষ্ঠাতেই :

২ 'বিনিময় চাহিবে, দাম দিয়াছে, দেহ চাহিবে। (পৃ. ৩৮)
৩ কুৎসিত বীভৎস হাসি, কুৎসিত ইঙ্গিত করে, ইঙ্গিতে যেন দেনা-পাওনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠে সে অতি বীভৎস, অতি ভীষণ। (পৃ. ৭২)
৪ ফেল কড়ি মাখ তেল আমি কি তোমার পর? (পৃ. ৭৯)

প্রথম থেকেই বৈশ্যবৃত্তি আর বেশ্যাবৃত্তি একাকার হয়ে আছে তারাশঙ্করের মনের অবগহনে [৬৬]। উদ্ধৃতিগুলোর টোন বা স্বরভঙ্গি লক্ষ করলে বোঝা যাবে, *চৈতালী ঘূর্ণি*-তে যতবার বাণিজ্যিক বিকিকিনির থীম এসেছে, তা এসেছে প্রত্যাখ্যানের মনোভাবে, আবেগে। (তারাশঙ্করের উপন্যাস *নীলকণ্ঠে*-র (১৯৩৩) একটা জায়গায় এই মনোভাব সুস্পষ্ট: 'এই দুনিয়ার বিকিকিনির হাটে বেনিয়ার দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়া আপনার ওজনভোর স্বর্ণ মানুষ যখন গনিয়া পায়, তখন কি আর রক্ষা থাকে ? তখন সে আরও চায়, আরও চায় ; বারবার, বারবার সে আপনাকে বিনিময় করে। তখনই তার মানুষের মনুষ্যত্ব হৃদয় মন সব জমিয়া গিয়া হয় পাথর[৬৭]।') এই প্রত্যাখ্যান, ধনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান। পণ্য-বিনিময় হচ্ছে বুর্জোয়া-সমাজের সব চেয়ে সরল, সব চেয়ে মৌলিক, সব চেয়ে প্রত্যক্ষ রূপ। বাজারকে ধনতন্ত্রের হৃদযন্ত্র বলা যায় ; দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বাজার আর টাকার দাপট বাড়ছে,[৬৮] বাড়ছে পণ্যরতি। আর সেই প্রক্রিয়ায় প্রাক্-ধনতান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজের আবহমান শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে : দেখা দিচ্ছে বিশৃঙ্খলা। *চৈতালী ঘূর্ণি*-তে, এবং পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেও, জন্তুপ্রতিমার সমাকীর্ণতা, ধনতন্ত্রের এই আরণ্যক বিশৃঙ্খলার প্রতিরূপ[৬৯]। এই প্রাক্-বুর্জোয়া স্তরে দাঁড়ানোর অভীপ্সা, তাঁর প্রতিমার উৎসের খোঁজ করলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমের কোনো-কোনো উপন্যাসে, যেমন সার্ত্রের উপন্যাসে, এ-জাতীয় প্রতিমার প্রাচুর্য দেখতে পাই[৭০]। কিন্তু সার্ত্রের সঙ্গে মৌলিক তফাত আছে তারাশঙ্করের প্রতিমা-ব্যবহার রীতির। সার্ত্রের উপন্যাসে কীট-পতঙ্গ-কাঁকড়া-গলদাচিংড়ির প্রতিমা তাঁর মেটাফিজিক্সের বাহন : রূপান্তরের নিরন্ত আবেশের অঙ্গ[৭১]। তারাশঙ্করের প্রতিমার পেছনে সমাজদর্শন থাকলেও, মেটাফিজিক্স নেই। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-কে এপিক উপন্যাস বলা চলে না, তবে প্রতিমা-রচনার রীতিতে দেখি এক ধরনের সহজ স্বাভাবিক সারল্য, যা এপিক-রীতির লক্ষণ। প্রুস্ত বা সার্ত্রের মতো পশ্চিম ইয়োরোপীয় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের ঔপন্যাসিকের

সঙ্গে নয়; বরং প্রতিমার ব্যাপারে তাঁর যোগ: দেশজ উপকথা-মহাকাব্য-পুরাণ-মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে; যে-ঐতিহ্যের অনেকটাই লোকায়ত, গ্রামীণ। এই সূত্রে প্রথমেই মনে পড়ে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁর সামীপ্য। ব্যাধ কালকেতুর হাতে নির্জিত বনের পশুদের যে-নাটকীয়, সবিস্তার ছবি *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*-তে পাই, তা শাসক-শ্রেণীর হাতে নিত্য নিগৃহীত ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালি চাষীর প্রতিরূপ। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে এক ভাল্লুককে আমরা দেখেছি; মুকুন্দরামের ভাল্লুক তার তুলনায় ঢের নিরীহ: 'উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নই না-করি তালুক[৭২]।' বাংলা-সাহিত্যের এই অবিস্মরণীয় ভাল্লুকের উক্তিতে ধ্বনিত হয়েছে, মঙ্গল-চণ্ডীর কাছে, হয়তো নিয়তির কাছেও, মধ্যযুগের চাষীর শ্লেষ-মেশানো মিনতি। মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত কথা-বলার সময়ে হাত-পা নাড়ে গঙ্গা-চিংড়ির মতো[৭৩]। এর সঙ্গে সমান্তরাল মনে হবে মহাজন রসিক দত্তের আলাপকালীন এই মুদ্রাদোষ: 'সঙ্গে সঙ্গে তাহার বকের মত লম্বা গলার 'পরে ছোট্ট টেকো মাথাটি টিকটিকির মত নড়ে' (পৃ. ৩১)। খুব আকস্মিক নয়, এই সাদৃশ্য: সাহিত্যিক কুলজির বিচারে ভাঁড়ু দত্ত নিঃসন্দেহে রসিক দত্ত বা ছিরু পালের পূর্বপুরুষ।

তাহলে, প্রতিমা-ব্যবহারের সূত্রে তারাশঙ্করের এই প্রথম উপন্যাস সংলগ্ন হয়ে পড়েছে ইংরেজ-পূর্ব আমলের মঙ্গল-কাব্যের ধারার সঙ্গে। হয়তো লোকস্মৃতির আরও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গেও এর যোগ। হেগেল বলেছিলেন, উপন্যাস হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া এপিক[৭৪]। ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ার এই শিল্পরূপ-কে দেশীয় শরীর-দেওয়া তারাশঙ্করের লক্ষ্য ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী *রামচরিতমানস*-এর আদলে উপন্যাস রচনা করছেন শুনে তিনি লেখেন: '...ভারতীয় আঙ্গিককে উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুনর্জীবিত করার কল্পনা ...আমারও ছিল, আজও আছে...যদি কোনও শক্তিশালী লেখক জাতক, কথাসরিৎসার [*কথাসরিৎসাগর*] প্রভৃতিতে যে আঙ্গিক, তা-ই প্রয়োজনমত পরিবর্তন ক'রে ব্যবহার করেন, তবে তা সার্থক হবে না, এমন কথা ভাববার কি কারণ আছে?'[৭৫] লক্ষ করতে হবে: দেশীয় আঙ্গিকের শিকড়সন্ধানের সূত্রে তিনি জাতক, কথাসরিৎসাগরের উল্লেখ করছেন, যাতে পশুপক্ষীর চিত্রবহুল ভিড়। (জাতকের চিত্ররূপময়তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন অজন্তার শিল্পী এবং ভারুত, নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর।) মনে হয়: দেশজ উপকথার পশুপাখির চরিত্র প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়েছে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে। গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন-ছড়ার পাশাপাশি এই পশু-পাখি-সরীসৃপের প্রতিমা বুনে তিনি উপন্যাসের শরীরে একটা স্তর তৈরি করেছেন, যে-স্তরের সাযুজ্য প্রাক্-বুর্জোয়া, অবিচ্ছিন্ন লোক-মনের সঙ্গে। তাঁর মহৎ উপন্যাসগুলিতে এই স্তর বিবর্ধিত হয়ে অন্তর্গ্রথিত ক'রে নিয়েছে ব্রত-পার্বণ-গাজনের জগৎকেও।

পাঁচ

যে-জগৎচিত্রের বা ইডিওলজির প্রথম উন্মেষ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে, তার লক্ষণাবলি এতক্ষণ বিবৃত করেছি, এবারে তার সামাজিক উৎসের সন্ধান করব; তাহলে হয়ত তার দ্বন্দ্ব আর

অসংলগ্নতারও ব্যাখ্যা মিলবে। তিনটি পৃথক অথচ অন্যোন্য উপাদান আছে তাঁর ইডিওলজির উৎসে।

১. ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে-পর্যায়, তারাশঙ্কর তার ঔপন্যাসিক। তাঁর ইডিওলজির সামাজিক মূল এই আন্দোলনের জমিতে। অনেক লেখক আছেন, যাঁরা অচেতনভাবে একটা বড়ো সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। কিন্তু তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে একাত্মীকরণের প্রক্রিয়া ছিল সচেতন। তিনি নিজের সত্তা-সংকট নিরাকরণ করেছিলেন, সাহিত্যের ফ্রন্টে স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাজ করবেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাই এ-বিষয়ে বারবার খুব স্পষ্ট বিবৃতি পাই তাঁর লেখায়। যেমন : '...যেদিন আমি মুক্তি পাই, সেদিন রাজনৈতিক বন্দীদের বিদায়সভায় তাঁরা যখন বলেছিলেন, "পুনরাগমনায় চ"... তখন আমি উত্তরে বলেছিলাম, "এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয়—আমি সাহিত্যের পথে এই যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।" ...সাহিত্যের পথে পা দিয়ে চৈতালী-ঘূর্ণি থেকে ধাত্রীদেবতা কালিন্দী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ ও মহিমাকেই প্রকাশ করেছি। তারই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আমার জীবনযুদ্ধের জয়কামনার স্বরূপ[৭৬]।' এ হল তারাশঙ্করের প্রাথমিক পরিচয়, আর এই অর্থে, জাতীয়তাবাদ তাঁর ইডিওলজি।

কিন্তু জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, যেমন সাম্রাজ্যবাদের-সঙ্গে দ্বন্দ্বে-লিপ্ত অনেকগুলি শ্রেণীর সম্মিলিত মোর্চা, জাতীয়তাবাদও, তেমন, একটা মিশ্র ব্যাপার : তার নানান ধারা-উপধারা, যার মূলে বহুতর শ্রেণী ও স্তর[৭৭]। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে অস্পষ্ট মার্কসবাদ আর অস্পষ্ট গান্ধিবাদের মধ্যবর্তী ভাবমণ্ডলে যে-চংক্রমণ দেখি, তা বিশ-তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক নায়কের ইডিওলজিতেও লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থায়, নৈতিক-মানসিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-শ্রেণীর অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর—কোনো মৌলিক শ্রেণীর—অবিসংবাদী-অপ্রতিহত নেতৃত্ব[৭৮] কায়েম না-হওয়া এই অস্পষ্টতার মূলগত কারণ। যে-অমিতবীর্য সামাজিক শক্তি জাতির সংকল্পকে কেলাসিত সংহতি দিতে পারত, তার আবির্ভাব ঘটে নি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক নাট্যের আত্মসচেতন মুখ্যপাত্রের ভূমিকায়। অর্থাৎ, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র ভাবগত স্ববিরোধ ও অসংবদ্ধতার প্রাথমিক উৎস। আবার তার রিয়ালিজমের মৌলিক শক্তিরও উৎস এই আন্দোলন। চাষীর প্রতি গাঢ় মানবিক সমবেদনা, তাকে দৃষ্টিমূলে স্থাপনের বাসনাও তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন গান্ধিজি-প্রাণিত জাতীয় আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের অন্তর্গত বামপন্থী ধারা থেকে।

২ চাষীকে দৃষ্টিমূলে স্থাপনের বাসনা যদি তিনি পেয়ে থাকেন জাতীয় আন্দোলন থেকে, তবে ঠিক এর পরিপন্থী প্রবণতার সম্ভাব্য উৎস ছিল তাঁর আর একটি পটভূমি।

সামাজিক শ্রেণীর বিচারে তারাশঙ্কর ছোট জমিদারশ্রেণীর মধ্যে পড়বেন। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন : 'ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম...প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছি—সুদ নিয়েছি খাজনা বৃদ্ধি করেছি ; কাছারিতে মহাজনকে বসিয়ে রেখেছি, যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য করেছি—সেই টাকা খাজনা হিসাবে জমা করেছি। আমার তখন বয়স অল্প, আমাদের প্রবীণ নায়েব করেছেন—আমি অবাক হয়ে দেখেছি[৭৯]।'

এই সূত্রে তারাশঙ্কর অন্যত্র বলেছেন : 'বীরভূমে জমিদারদের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য[৮০]।' এর সমর্থন আছে বীরভূমের সামাজিক ইতিহাসে। মোগল যুগ থেকে আরম্ভ করে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত বীরভূম ছিল একটি অখণ্ড জমিদারি[৮১]। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তন হবার ছয়-সাত বছরের মধ্যে বকেয়া রাজস্বের দায়ে সেই *এস্টেট* সতীদেহের মতো খণ্ড-খণ্ড হয়ে বনেদি জমিদারি-বংশের হস্তচ্যুত হয়ে যায়[৮২]। এক বহু হতে-হতে ১৯৩০-৩১ সালে—*চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রকাশ-কালে—জমিদারি-মহলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ১১৫।[৮৩] 'আমাদের গ্রামের [লাভপুরের] জমিদারদের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার।... এ ছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাত পায়ের আঙুলে গণা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন—"মাটি বাপের নয়, দাপের ; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।" বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবি ঘোষণা ক'রে বলতেন—"আমি জমিদার"[৮৪]।' তারাশঙ্কর আবাল্য দেখেছেন লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই 'জমিদারতন্ত্রের' সঙ্গে হঠাৎ-নবাব ব্যবসায়ীর বিরোধ, যা 'সমাজ-জীবনের নানাস্তরে বিস্তৃত হয়েছে'[৮৫]। দু চোখ ভ'রে' দেখেছেন : 'কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ক-কালি ছিটানো নিয়েও চলছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।...সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি।...সে দ্বন্দ্বে আমাদের অংশ ছিল[৮৬]।' তাঁর এই সামাজিক পটভূমি মনে রাখলে আমরা সহজে বুঝতে পারি : উপনিবেশের ছত্রচ্ছায়ায় গজিয়ে-ওঠা বণিক-ধনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিরাগ ; অথবা প্রাক্-বুর্জোয়া গ্রাম সম্পর্কে নস্টালজিয়া।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : ছোট জমিদার-শ্রেণীর জীবন-যাত্রার বেড়া তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল কি ? হ্যাঁ এবং না, দুই-ই হবে তার উত্তর। *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে দেখি, জমিদারকে তিনি শোষক-উৎপীড়ক বলে চিনেছেন ; আবার জমিদার সম্বন্ধে এক ধরনের উভবলতাও রয়েছে তাঁর মনোভাবে।

ইডিওলজির স্তরে দ্বন্দ্বের, জটিলতার সৃষ্টি করলেও, ছোট জমিদারের এই পৃষ্ঠপট বিশেষ প্রতিবন্ধনের সৃষ্টি করে নি, তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায়। স্বদেশী যুগ

থেকে ছোট জমিদারশ্রেণী, আর ছোট তালুকদার-পত্তনিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়, স্বাধীনতা-আন্দোলনে শামিল হয়েছে[৮৭]। বর্ধমানের মহারাজা স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের সময় কুৎসিত কার্জন গেট বানিয়েছিলেন কিন্তু ১৯০৫ সালে কিশোর ছেলের হাতে রাখী বেঁধেছিলেন তারাশঙ্করের মা (যিনি উত্তরকালে ছেলের ভাবলোকে হয়ে উঠেছিলেন দেশ-কালের প্রতীক, দেশ-কালের সঙ্গে আবেগময় সংযোগসূত্র)।

৩ কী কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থায়, কী ভাবনার জগতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছোট জমিদার স্থাণু ক্ষয়িষ্ণু অক্ষম শক্তি। কিন্তু এই ছোট জমিদারি থেকেই অর্শানো আয়ের সংস্থান, তারাশঙ্করকে প্রাথমিক সাহায্য করেছিল সমাজের এমন একটা স্তরে নিজের কর্মজীবন স্থাপন করতে ইডিওলজির রাজ্যে যার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত জঙ্গম। বৃত্তির বিচারে তারাশঙ্কর সাহিত্যিক, সেটাই তাঁর মুখ্য পরিচয়—সমাজে তাঁর ভূমিকা প্রধানত বুদ্ধিজীবীর। আর গ্রামশি-প্রবর্তিত স্তরবিভাগ অনুযায়ী বলা যায় : তারাশঙ্কর ট্র্যাডিশনাল বা পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবী[৮৮]।

নতুন চিন্তাধারা, নতুন মূল্যবোধ বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-চুম্বক ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছড়াতে থাকলে তা পরিগ্রহণ করা, তাতে সাড়া দেওয়া পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কঠিন নয়। সুতরাং চাষী-মজুরের প্রতি যে-শুভেচ্ছা, বিশেষত চাষীর সঙ্গে সমপ্রাণতার যে-আকুতি, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে বাঙ্ময় হয়েছে, তার উৎসার বুদ্ধিজীবীর স্বধর্ম থেকে। ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপট সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও, এ-বিষয়ে তারাশঙ্করের মনোভাবের, আবেগের খানিকটা মিল আছে, উনিশ শতকের রুশ নারোদনিক বা গণবাদীদের সঙ্গে। নারোদনিকরাও ছিলেন পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবী এবং অধিকাংশেরই জমি ছিল আয়ের আদি উৎস। তাঁরা কৃষকের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন প্রাক্-ধনতান্ত্রিক মুজিকের ইডিওলজির ভিত্তিতে। নারোদনিক মতবাদের কয়েকটি প্রধান সূত্র—যেমন, 'মির' বা স্বশাসিত, স্বয়ংভর গ্রাম্যসমাজের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পরিকল্পনা—তারাশঙ্করের ভাবনায় প্রায়-সদৃশ চেহারায় পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রথম পর্বেরই একটা প্রবন্ধে (১৯৩৮) অনেকটা নারোদনিক-শোভন গণ-বন্দনা পাচ্ছি। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু : প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে পূজিত হয়েছে দেবীর মাতৃরূপ, বঙ্কিমচন্দ্র দেবীর আসনে বসিয়েছেন দেশকে ; আর আধুনিক সাহিত্যিকের কাছে পূজ্য হয়ে উঠেছে দেশ নয়, গণদেবতা। যতদূর জানি, তারাশঙ্করের লেখায় এখানেই 'গণদেবতা' শব্দের প্রথম ব্যবহার। তারাশঙ্করের নিজেরই সাহিত্যিক ইশতেহার হিশেবে প্রবন্ধটি মূল্যবান, তাই তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি : 'বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার পূজার যে ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন—সাহিত্যে সে ধারা লুপ্ত না হইলেও সে খরবেগ তাহাতে আর নাই...আজ

অবশ্য বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ বলিবেন, ও ধারা বন্ধ হইবার দিন আসিয়াছে! পাষাণী পূজার দিন এ নয়, মৃন্ময়ী পূজার তিথিরও অবসান হইল। সম্মুখে গণদেবতার পূজার পর্ব্ব। পাষাণী ও মৃন্ময়ীর পরিবর্ত্তে পূজাবেদিকায় জীবন্ত গণদেবতা সমারূঢ়' ('বঙ্কিমের মাতৃপূজা', *শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ. ৩৮২-৮৩)।

উপনিবেশের সমাজে বোধ হয় ইতিহাসের কোনো পরিহাস আছে—মনোগত বাসনার সঙ্গে সহজে মিল হয় না সমাজগত ভূমিকার। আমাদের সমাজের যা-কাঠামো তার বাস্তব ডায়ালেকটিক্ পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবীকে—বিশেষত সাহিত্যিককে—সরাসরি সমৃদ্ধ ক'রে দেয় একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে : মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সঙ্গে। আর মধ্যবিত্ত-শ্রেণী উৎপাদনের জগৎ, চাষীর জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিশ-তিরিশের দশকে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে ইংরেজিবিহীন চাষীর মনের আদান-প্রদানের কোনো মাধ্যম ছিল না। সংযোগ তো ছিলই না, বরং আর্থিক-সামাজিক সম্বন্ধের বহু ক্ষেত্রে চাষীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বিরোধের। যেমন, দ্বন্দ্বের বীজ ছিল বর্গা বা ভাগ-চাষীর সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্বন্ধের মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব ফুটে বেরোয় ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইনের আলোচনায়। ৩০ আগস্ট (১৯২৮) তারিখে স্বরাজ্য দলের একজন গণ্যমান্য সদস্য সংশোধন-প্রস্তাব তোলেন, যাতে সেটলমেন্ট রেকর্ডের জোরে কোনো বর্গাদারকে টেনেন্সিস্বত্ব না-দেওয়া হয়। তিনি যুক্তি-বিস্তার করেন এই মর্মে : বর্গাদারকে প্রজাস্বত্ব দিলে মধ্যবিত্তের সর্বনাশ হবে। মধ্যবিত্তই জাতির মেরুদণ্ড, সভ্যতার বাহক। অতএব মধ্যবিত্তের সর্বনাশে জাতির সর্বনাশ[৮৯]।

তারাশঙ্করের পাঠকসমাজ মধ্যবিত্ত, তাঁর প্রকাশক-পরিবেশক-পৃষ্ঠপোষক-সমালোচক সবাই মধ্যবিত্ত। সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী মধ্যবিত্ত 'মিলিউ'-এর মধ্যে তিনি সাহিত্যিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই 'মিলিউ'-এর সঙ্গে তাঁর বহুমাত্রিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ চেহারা পেয়েছে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র রিভিউ-এ[৯০], বিজ্ঞাপনে, উৎসর্গপত্রে। মধ্যবিত্ত ইডিওলজির চাপ স্বভাবতই তাঁর উপর পড়েছে। সেই চাপ উপন্যাসের টোনে, প্রতিমায়, কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা আগে দেখিয়েছি। উপন্যাসের দৃষ্টিবিন্দুও সরে গেছে এই চাপে। প্রথম থেকে অনেকটা অংশ জুড়ে চাষী-গোষ্ঠ আর চাষী-বৌ দামিনীর চোখ দিয়ে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র ভুবনকে দেখেছেন তারাশঙ্কর। শেষাংশে এই জগৎকে দেখেছেন শিবকালীর চোখ দিয়ে : গোষ্ঠ-তারাশঙ্করের সমপ্রাণতা রূপান্তরিত হয়েছে শিবকালী-তারাশঙ্করের একাত্মতায়[৯১]। অর্থাৎ, চাষী থেকে মধ্যবিত্তে সরে গেছে উপন্যাসের দৃষ্টিবিন্দু।

টীকা

১ তাঁর কাব্যগ্রন্থ *ত্রিপত্র* প্রকাশের তারিখ ১৯২৬ আর ১৯২৬-২৭ এর মধ্যে *পূর্ণিমা*-য় অন্তত ছয়খানি গল্প বেরোয়। কিন্তু তারাশঙ্কর নিজেই ১৯২৮ থেকে তাঁর 'সাহিত্যিক জীবনের কালগণনা শুরু' করেছেন। আসলে, *কল্লোল*-এর গল্পে তিনি নিজের ধারা খুঁজে পেয়েছেন, প্রথম পরিচিত হয়েছেন সাহিত্যজগতে। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্য জীবন* [প্রথম খণ্ড], কল্লোল পাবলিশিং সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৭৯। এর পর থেকে *আমার সাহিত্য জীবন*—এইভাবে উল্লেখিত হবে।

২ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, চৈতালী-ঘূর্ণি, *শনিবারের চিঠি*, তারাশঙ্কর সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ২২১।

৩ অসীম রায়, "তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে", *সাহিত্যপত্র*, চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ১২।

৪ *কালি-কলম*, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ. ৩২৩-২৭।

৫ দ্র. *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৩৪।

৬ এই কালের আয়তন রিয়ালিজমের অন্তঃসার। পুরাণে কাল-মান বৃহৎ, এত বৃহৎ যেন মনে হয় অস্তিত্বহীন, উপন্যাসে ঐতিহাসিক কালের প্রবেশ ঘটে এবং সেই সঙ্গে সমাজের। দ্র. M. Zeraffa, 'The Novel as Literary Form and Social Institution', Elizabeth & Tom Burns ed. *Sociology of Literature & Drama*, Penguin Modern Sociology Readings, 1978, pp. 35-55.

৭ *আমার সাহিত্য-জীবন*, পৃ: ৪৮-৪৯।

৮ *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৫। এই প্রবন্ধে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রচলিত পাঠের সমস্ত উদ্ধৃতি এই সংস্করণ থেকে গৃহীত।

৯ Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle : 1920-1942*, New York, 1964, pp. 73, 110.

১০ Cited in R. Palme Dutt, *India To-day*, second Indian edition, Calcutta, 1970, p. 853.

১১ তারাশঙ্কর লিখেছেন : '১৯২৯ সালে তখন দেশের রাজনৈতিক জীবনে ধূমায়মান অবস্থা। মনে হচ্ছে জ্বলবে, আবার জ্বলবে।'—*আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৩৪।

১২ Binay Bhusan Chaudhuri, 'Agrarian Movements in Bengal and Bihar, 1919-1939', B. R. Nanda ed. *Socialism in India*, Delhi, 1972, pp. 190-229.

১৩ V. B. Karnik, *Strikes in India*, Bombay, 1967, pp. 164-72.

১৪ Dutt, op-cit. pp. 356-57.

১৫ 'অনাবৃষ্টির বর্ষার...ঠোকে, ঠক্ ঠক্।' *চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ ৩-৫।

১৬ এই সূত্রে বিশেষভাবে *লিপিকা* (১৯২২)-র উল্লেখ করা যায়। *লিপিকা*-র কথিকাগুলির সঙ্গে 'শুধু কেরাণী'র কিছুটা গড়নের মিল আছে।

১৭ *প্রবাসী*, চৈত্র ১৩৩০, পৃ. ৮১৯-২২। *কল্লোল* পত্রিকায় দু'বার (বৈশাখ ১৩৩১ এবং শ্রাবণ ১৩৩১) এই গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়।

১৮ *শনিবারের চিঠি*-চৈত্র ১৩৩৪। *অজয়* বেরোয় ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে।

১৯ সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ২২।

২০ 'তখন একটা বাগ্‌ভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের ব্যবহার।'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ. ২৩২।

২১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ১৪৯।

২২ Jean-Paul Sartre, *Literary & Philosophical Essays*, tr. by Annette Michelson, London, 1955, pp.88-89

২৩ ভূমিচ্যুত চাষী কল-কারখানার কাজ নিচ্ছে, এই ব্যাপার শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকায় সত্য, বাংলাদেশে যা আজও ঘটে নি। শিল্প-বিপ্লব না ঘটায়, কৃষিতে শোষণ আর উচ্ছেদের মাত্রা বাড়লেও, বাঙালি চাষীর পক্ষে কল-কারখানার কাজ জোটানোর সুযোগ সংকীর্ণ থেকে গেছে আজও। ১৯৫১ সালেও বীরভূমের ভূমিহীন চাষীকে জীবিকার সন্ধানে জমি আঁকড়েই থাকতে হয়েছে : 'Occasionally, the raiyats' land mortgaged is bought up by the

mortgagee, the old *raiyat* instead of being turned out of the lands is retained as under raiyat'.— A. Mitra, *Census 1951, District Handbooks : Birbhum*. p. L. *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে বর্ণিত প্রক্রিয়াকে সমাজের ঐতিহাসিক গতি বলা যেতে পারে। আর সেদিক দিয়ে তারাশঙ্করের উপলব্ধি ভুল নয়। গ্রামীণ অর্থনীতির বাস্তব, তার সামগ্রিক জটিল রূপ, তিনি *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে এবং পরবর্তী উপন্যাসে নিপুণভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

২৪ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র যে-তাৎপর্য পাঠকসমাজের কাছে লেখক-প্রকাশক পেশ করতে চাইছেন, এই বিজ্ঞাপনগুলিতে তা পরিস্ফুট। তিন ও চার সংখ্যক বিজ্ঞাপন তারাশঙ্করের নিজের লেখা হওয়া সম্ভবপর, এই অনুমানের পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। কমা-সেমিকোলনের পরে ড্যাশ দেওয়া তারাশঙ্করের অভ্যস্ত রীতি, প্রায় মুদ্রাদোষ বলা যায়। যেমন : *উপাসনা*-য় *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রথম মুদ্রিত পাঠে দেখছি, শুধু একটা পৃষ্ঠাতেই কমার পরে ড্যাশ বসেছে ১২ বার (*উপাসনা*, কার্তিক, ১৩৩৬, পৃ. ২০৮)। যতিপ্রয়োগের এই রীতির একটি দৃষ্টান্ত : 'চায় সে লাঠি—;—মেলে না।' *উপাসনা*, ফাল্গুন, ১৩৩৬, পৃ. ৪১৩।

২৫ নিতাই বসু, *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪।

২৬ মুন্সিগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, চৈত্র ১৩৩১। দ্র. *শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ* ৮ম সম্ভার, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৬, পৃ. ৩৩০-৩৬।

২৭ ঠিক নিন্দার্থে বলছি না, আমি তাঁর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাইছি। মনে পড়ছে, তলস্তয় সম্পর্কে টমাস মান অনুরূপ কথা লিখেছেন : 'তলস্তয় যা ভাবতেন, সেটা, তিনি যা ছিলেন, তার তুলনায় ছোট।' দ্র. Thomas Mann, *Essays of Three Decades*, tr. by H. T. Lowe-Porter, London, 1947, p. 160.

২৮ '... any state of awareness must inevitably have some practical intention, and that "We are embarked" from the very moment that we make the most insignificant act of perception.'—Lucien Goldmann, *The Hidden God*, tr. by P. Thody, London, 1964, p. 981, মার্কস-এর ফয়্যারবাখ সম্পর্কে পঞ্চম থিসিস, এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২৯ Georg Lukacs, *History and Class Consciousness*, tr. by R. Livingstone, London, second impression, 1971, pp. 73-74

৩০ কথাটা স্পষ্ট হবে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সমসাময়িক রাজনৈতিক উপন্যাস *ফন্তামারা*-র (১৯৩০) সঙ্গে এ নিয়ে প্রতিতুলনা করলে। ফাসিস্তদের সঙ্গে জীবন-মরণের লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয়েছিল দক্ষিণ ইতালির এই অজ পাড়া গাঁয়ের চাষীরা, তাদের প্রচারের রীতি ছিল এই : 'ওরা আমাদের চাষের জল কেড়ে নিয়েছে। কী করতে হবে ? পাদ্রিরা আমাদের মরা আত্মীয়-বন্ধুদের কবর দিচ্ছে না। কী করতে হবে ? আইনের নামে ওরা আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করছে। কী করতে হবে ? দোন চিরচোন্তানৎসা একটা ভণ্ড বজ্জাত। কী করতে হবে ?' —Ignazio Silone *Fontamara*, tr. by Gwenda David & Eric Mosbacher, London, new edition, 1948, p. 188.

৩১ Karl Marx, *The Holy Family*, Moscow, 1956, p. 58

৩২ কাল মার্কস, 'বিচ্ছিন্ন শ্রম' ('১৮৪৪ সালের অর্থনীতি ও দর্শন-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি' থেকে অনূদিত) এক্ষণ, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৮, পৃ ১৫।

৩৩ Karl Marx, *The Poverty of Philosophy*, Moscow, n. d., p. 195.

৩৪ Istvan Meszaros, 'Contingent' and Necessary Class Consciousness' in *Aspects Of History and Class Consciousness*, London, 1971, pp. 85-126

৩৫ Maxim Gorky, *Days with Lenin*, Sydney, 1942, p. 4-5.

৩৬ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র মুদ্রণ-ইতিহাসে তাঁর পাঠক-বৃদ্ধির গতিরেখা উৎকীর্ণ। ১৯৩১ সালে প্রথম সংস্করণ বেরনোর পর, খুব বিলম্বিত লয়ে বই কাটতে থাকে—'দেড় বছরে বিক্রি হয় পঞ্চাশ থেকে

ষাটখানির মধ্যে' (*আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৮৭)। দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরোয় দীর্ঘ তেরো বছর পরে, ১৯৪৪ সালে। তারপর ১৯৪৫-৪৯ সালের মধ্যে আরও তিনটি মুদ্রণ হল *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র। চল্লিশের মতন, পঞ্চাশের দশকেও ছাপা হয় চার বার : ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৭ সালে। তারপর ১৯৬০ সালে বেরোয়, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র দশম মুদ্রণ, আর ১৯৭১ সালে প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণ এখনও [১৩৮২ বঙ্গাব্দ] বাজারে বিদ্যমান। তারাশঙ্করের ১৯২৮-৩৮, এই পর্বের অধিকাংশ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ সংখ্যা হাজারের কম : *প্রেম ও প্রয়োজন* ছাপা হয় ৬০০ কপি ; *ছলনাময়ী* ৫০০ ; *জলসাঘর* ৬০০ ; *আগুন* ৫৫০ ; *রসকলি* ৫০০ ; মুদ্রণ-সংখ্যা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে সংগৃহীত।

৩৭ গোর্কির নিলভনার সঙ্গে তারাশঙ্করের গোষ্ঠর প্রতিতুলনা করা যায় এই সূত্রে। উপন্যাসের গোড়ায় নিলভনা ছিল আর পাঁচজন মায়ের মতো। অষ্টপ্রহর 'ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে' সংসারের মার খেত সে নিঃশব্দে। ধীরে-ধীরে তার মনে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ হল। জীবনের পরিস্থিতির বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা করতে শিখল সে এবং নামল সেই পরিস্থিতি পাল্টানোর কর্মকাণ্ডে। যে ছিল বোবা, সে হয়ে উঠল বাঙ্ময়। গোষ্ঠর চরিত্রে এই ধরনের বিকাশ দেখি না। নিলভনার এই রূপান্তর দেখানো গোর্কির পক্ষে কীভাবে সম্ভব হল ? লুকাচ এর মতে, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস গোর্কিকে প্রাণিত করেছিল এ-ব্যাপারে। দ্র. Georg Lukacs, 'The Intellectual Physiognomy in Characterization', *Writer and Critic*, London, 1970, pp. 149-88

৩৮ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৯১-৯২ দ্রষ্টব্য। ঈষৎ অন্য প্রসঙ্গে লিখেছেন : '১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমাব কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে' (পৃ. ৩৩)।

৩৯ 'বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাঙলার যৌবন-শক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত।' *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৫০। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৫০-৬০ এবং *তারাশঙ্কর বীথিকা*, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২৩। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তারাশঙ্করের পাঠক-সমাজের বীর-নায়ক। এই উৎসর্গপত্র হয়ত পাঠকের সঙ্গে তারাশঙ্করের আর একটি সাযুজ্য-বন্ধন রচনা করেছিল।

৪০ হংসেশ্বর রায়ের সঙ্গে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখের সাক্ষাৎকার।

৪১ গোপাল হালদার, "তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর", *কালি ও কলম*, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পৃ. ৬৩৪।

৪২ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৫০, ৫২-৫৩।

৪৩ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৩৩।

৪৪ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৪৯-৫৩, ৬৪-৬৫, ৮৫-৮৬। এবং *তারাশঙ্কর বীথিকা*, পৃ. ৩২১-২৪।

৪৫ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৪৩, ৫৫, ৮৮-৮৯।

৪৬ আই. এ. রিচার্ডস টোন-এর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা এখানে প্রাসঙ্গিক :
'Furthermore, the speaker has ordinarily *an attitude to his listener*. He chooses or arranges his words differently as his audience varies, in automatic or deliberate *recognition of his relation to them*. The tone of his utterance reflects his awarness of this relation, his sense of how he stands towards those he is addressing. Again the exceptional case of dissimulation, or instances in which the speaker unwittingly reveals an attitude he is not consciously desirious of expressing, will come to mind.'—*Practical Criticism*, London, 11th impression, 1960, p. 182
সুতরাং টোন হচ্ছে তাৎপর্যের সেই অংশ যার মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে লেখক তাঁর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করেন। 'স্বরভঙ্গি' এই পারিভাষিক উদ্ভাবন করেছেন শঙ্খ ঘোষ (*নিঃশব্দের তর্জনী*, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ২০ দ্র.)

৪৭ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭০, পৃ. ৬৮।

৪৮ স্বরাজ্য দল কীভাবে ভোট দেয়, তার একটি দৃষ্টান্ত দেব। বিলের বত্রিশ ধারার 48G (i) উপধারায় ছিল :

'Every under-raiyat who, immediately before the commencement of the Bengal Tenancy (Amendment) Act, 1928, had by custom a right of occupancy in that land, shall have a right of occupancy in that land'.

১৯২৮ সালের ২১ আগস্ট তারিখে আজিজুল হক সংশোধন প্রস্তাব আনেন, 'custom' (প্রথা) শব্দের পরে 'or otherwise' (অথবা অন্যভাবে) শব্দদুটি সংযোজন করা হোক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল : যেখানে প্রথা নেই, সেখানেও যাতে কোর্ফা প্রজা দখলিস্বত্ব পান, তার ব্যবস্থা রাখা। কোর্ফা প্রজার স্বার্থরক্ষার এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, কারণ স্বপক্ষে ১৬ আর বিপক্ষে ৬১ ভোট পড়ে। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন : ১ মৌলবি সৈয়দ মুহম্মদ আফজল, ২ মৌলবি আসিমুদ্দিন আহমদ, ৩ মৌলবি কাসিরুদ্দিন আহমদ, ৪ মৌলবি সৈয়দ নৌশের আলি, ৫ সৈয়দ মহম্মদ আতিবুল্লাহ, ৬ মৌলবি নুরুল হক চৌধুরী, ৭ খাঁ বাহাদুর মৌলবি আজিজুল হক, ৮ খাঁ বাহাদুর মৌলবি এক্রামুল হক, ৯ এ. কে. ফজলুল হক, ১০ খাঁ সাহেব মৌলবি মুয়াজ্জাম আলি খাঁ, ১১ মৌলবি তামিজুদ্দিন খাঁ, ১২ মৌলবি আজিজুর রহমান, ১৩ মৌলবি শামসুর রহমান, ১৪ এ. এফ. এম. আবদুর-রহমান, ১৫ মৌলবি সৈয়দ আবদুর রউফ, ১৬ রায় সাহেব রেবতীমোহন সরকার। বিপক্ষে ভোট দেন : ১ মহারাজা শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী, ২ রমেশচন্দ্র বাগচী, ৩ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ শশিশেখর বসু, ৬ পি. সি. বসু, ৭ শরৎচন্দ্র বসু, ৮ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৯ জে. আর. ব্লেয়ার, ১০ সুভাষচন্দ্র বসু, ১১ বি.ই.জে. বার্জ, ১২ এ. ক্যাসেলস্, ১৩ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৪ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৫ বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ খাঁ বাহাদুর মৌলবি হাফিজুর রহমান, ১৭ প্রাণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১৮ নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী, ১৯ ডি. জে. কোহেন, ২০ এ. জে. ড্যাশ, ২১ অখিলচন্দ্র দত্ত, ২২ অমূল্যচন্দ্র দত্ত, ২৩ সরলকুমার দত্ত, ২৪ খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৫ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৬ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২৭ স্যার আবদুল করিম আলহাজ গজনবি, ২৮ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ২৯ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৩০ জি. পি. হগ, ৩১ ডবলু. এস. হপকিনস্, ৩২ মহেন্দ্রনাথ মাইতি, ৩৩ এ. মার, ৩৪ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ৩৫ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ৩৬ এস. সি. মুখার্জি, ৩৭ খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আবদুল মোমিন, ৩৮ মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৩৯ হেমচন্দ্র নস্কর, ৪০ ডবলু. এইচ. নেলসন, ৪১ রঞ্জিত পাল চৌধুরী, ৪২ ডবলু. ডি. আর. প্রেনটিস, ৪৩ প্রসন্ন দেব রাইকত, ৪৪ নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৪৫ কুমুদশঙ্কর রায়, ৪৬ রাধাগোবিন্দ রায়, ৪৭ আর. এন. রীড, ৪৮ মন্মথনাথ রায়, ৪৯, বিধানচন্দ্র রায়, ৫০ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, ৫১ ডি. এন. রায়, ৫২ কিরণশঙ্কর রায়, ৫৩ রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ৫৪ এফ. এ. স্যাকসে, ৫৫ শচীন্দ্রনারায়ণ স্যান্যাল, ৫৬ নলিনীরঞ্জন সরকার, ৫৭ খাঁ সাহেব আবদুস সাত্তার, ৫৮ নগেন্দ্রনাথ সেন, ৫৯ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ৬০ রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ৬১ এইচ. ই. স্টেপলটন।—*Council Proceedings : Official Report : Bengal Legislative Council : Thirtieth Session, 1928*. Calcutta, 1928. pp. 402-08। এরপর থেকে, সংক্ষেপে, *Council Proceedings : Official Report*—এইভাবে উল্লেখিত হবে।

৪৯ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *জমির মালিক*, কলকাতা, ১৩৫১ (১৯৪৪), পৃ. ১১-১২।

৫০ প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯২৮, পাশ হয় ১৯২৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এবং বলবৎ হয় ১৯২৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

৫১ স্বরাজ্য দলের—বিশেষত সুভাষচন্দ্রের—অনুগামী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫) সম্পাদিত *উপাসনা* পত্রিকা যাঁরা পড়তেন, তাঁদের এই পাঠক-সমাজের প্রতিভূ হিশেবে ধরা যেতে পারে।

৫২ মার্ক ব্লকের এই উক্তি নিম্নোক্ত গ্রন্থের এপিগ্রাফ রূপে মুদ্রিত : Clifford Geertz, *Agricultural Involution*, Berkeley, 1968.

৫৩ প্রবন্ধের এই প্রচ্ছদে আমার যা-ভাবনা, তা গড়ে তুলতে সমর্থন পেয়েছি রিচার্ড হগার্ট-এর এই উক্তি থেকে : 'I think it was Aristotle who said that the greatest gift of the writer was the power to make metaphors...and in my sense every metaphor is a significant hypothesis or making of relationships...and perhaps one either has that power or not.' Richard Hoggart, 'The Literary Imagination and the Sociological Imagination', *Speaking to Each Other*, vol. II, London, 1970, p. 266.

৫৪ এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন পল এলুয়ার। দ্র. Stephen Ullmann, *Language & Style*, Oxford, 1964, p. 180.

৫৫ Assembly Proceedings : *Official Report : Bengal Legislative Assembly : Second Session*, 1937, p. 1882.
এর পর থেকে সংক্ষেপে *Assembly Proceedings : Official Report* এইভাবে উল্লেখিত।

৫৬ 'A conservative estimate would place the total amount collected as *Abwab* in Bakarganj at not less than twenty lakhs or rupees or more than the entire Government land-revenue. .of the district'—*Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Bakarganj District* : 1900 to 1908, p. 79.

৫৭ Radhakamal Mukherjee, *Land Problems of India*, London, 1988, p. 181.

৫৮ *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum : 1924-32*, p. 181.

৫৯ Mukherjee, op. *cit*, p. 181.

৬০ কালীমোহন ঘোষ-কৃত সমীক্ষা থেকে জানা যায় : ১৯২৬ সালে বীরভূমে কাবুলিওয়ালার সুদের হার ছিল ১৫০%–১৭৫%। গরিব চাষী ও ভূমিহীন চাষী ছিল ওদের প্রধান খাতক। বল্লভপুর গ্রামের মোট ২৪টি পরিবারের মধ্যে ২৩টি পরিবার ঋণভারগ্রস্ত ছিল ১৯২৬ সালে। দ্র. Nripendra Nath Banerjee, *Ballavpur—A Srinikentan Village Survayed*, Agro-Economic Research Centre, Santiniketan, (Cyclostyled Copy), 1962, p. 87.

৬১ *Census of India, 1951, vol V : Bengal & Sikkim, Part I, report*, p. 271

৬২ ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের সমীপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা যে-স্মারকলিপি দাখিল করেন, তদনুযায়ী এই তথ্য অসম্পূর্ণ। ১৯২১ এবং ১৯৩১-এর সেন্সাসে পদ্ধতি আর পারিভাষিক অভিন্ন ছিল না। জমির স্বত্ব-উপস্বত্ব যাদের গৌণ উপজীবিকা (subsidiary occupation), তাদের খাজনাভোগী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয় নি, ১৯৩১-এর সেন্সাসে। বর্গাদারদের ১৯৩১ সেন্সাসে 'টেন্যান্ট কালটিভেটার' হিশেবে ধরা হয়। ১৯৩১-এর সেন্সাসে যা তথ্য পাওয়া যায়, কৃষক উচ্ছেদের প্রক্রিয়া, প্রকৃত পক্ষে, তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপক। দ্র. 'Memorandum by the Bengal Provincial Kisan Sabha' in *Report of the Land* Revenue *Commission : Bengal*, vol. VI, Alipore, 1941, pp. 28-30, এর পর সংক্ষেপে *কৃষক-সভার-স্মারকলিপি*—এইভাবে উল্লেখিত।

৬৩ ১৯১৪-৩০ এই পর্বে বীরভূমের গ্রামে মহাজনের ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'ধানের সুদ দেড়ী অর্থাৎ এক মন ধানে আধ মন সুদ এবং বৎসরান্তে শোধ না-হলে সুদ

আসল বলে গণ্য হতো। অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারে। টাকার সুদ শতকরা মাসিক আট আনা ছিল প্রথম, তারপর ক্রমে একটাকা, পরে দুটাকা উঠেছিলো। এবং কিছু-কিছু ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হার ছিল। কট কবলা ছিল অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা সময়, পাঁচ বছর-সাত বছর পর শোধ না-হলে সেটা বিক্রয় দলিলে পরিগণিত হতো। আরও ছিল খাই খালাসী। সুদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু জমি মহাজন ঋণ শোধ না-হওয়া পর্যন্ত ভোগ ক'রে যেত। কেউ বা পাঁচ, সাত, দশ বছর জমির ধান ভোগ ক'রে নিয়ে জমি ফেরৎ দিত। এই ব্যবস্থায় কৃষকশ্রেণী সুদীর্ঘ কাল শোষিত হয়ে ক্রমে-ক্রমে নিঃস্ব হয়েই আসছিল, এই অবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধ এসে হানলে একটা আঘাত। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ধানের দর যা বেড়েছিলো তার তুলনায় কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের দর অনেক গুণে বেশি বাড়ল। টাকা দুস্প্রাপ্য হল সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে। ফেঁপে উঠল ব্যবসাদারেরা। আমাদের অঞ্চলে কয়লার ব্যবসায়ী অনেক আছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ যাবার পর তাঁরা লক্ষ-লক্ষ টাকার মালিক হলেন। লোহা চা কাপড় সব ব্যবসায়েই তা-ই হল। মরল মধ্যবিত্ত, তাদের সঙ্গে ছোট জমিদার এবং চাষী। ১৯৩০ সাল নাগাদ দেখা গেল বাংলার চাষীর যা সম্পত্তি অর্থাৎ ভিটে মাটি জমি তার থেকে ঋণের পরিমাণ বেশি। ১৯১৪ থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত চাষীর জমি জেরাত ভিটে—এক কথায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত মহাজনের বড়শিতে গাঁথা হয়ে গেছে।' তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, 'গ্রামের চিঠি', *যুগান্তর*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩।

৬৪ *কৃষক-সভার-স্মারকলিপি*, পৃ. ৫২।

৬৫ তারাশঙ্কর একটা অসুস্থ সমাজের চেহারা ফুটিয়েছেন, সুস্থ জন্তু-জানোয়ারের প্রতিমা দিয়ে, এই বিরোধাভাস থেকে তাঁর শিল্পী-স্বভাবের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টমাস মান বলেছেন, স্বাস্থ্য জিনিসটা জান্তব, প্রাকৃতিক ; আর অস্বাস্থ্য হচ্ছে মানবীয়, মনোময়, প্রকৃতিবিচ্যুত অপ্রাকৃতিক (Thomas Mann, *op. cit*, pp. 108-10)। স্বাভাবিকতা, মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, তারাশঙ্করের চারিত্র-লক্ষণ, মৌলিক শক্তি। প্রথম যুগের অচিন্ত্যকুমার হচ্ছেন তাঁর বিপরীতধর্মের লেখক : নাগরিক, শিলার-এর অর্থে 'সেন্টিমেন্টাল', অপ্রাকৃতিক। প্রতিমা-ব্যবহারের দিক দিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস *বেদে*-র (১৯২৮) সঙ্গে *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র প্রতিতুলনা করলে এই বৈপরীত্য সহজে বোঝা যায়। *বেদে*-র প্রতিমার উদাহরণ :

'কোনো গয়নাপত্র চাই না—না কোঠাবাড়ি, না-বা নাকের একটা নথ—শুধু তোমার বাঁ পাশে সর্ষে ফুলের মত টাটকা, টুকটুকে একটি বউ হোক।—পরে আমি না হয় বউ-কথা-কও পাখি হব।' (*বেদে, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ. ২৪২)।

এই কথাগুলো বলছে পুতলি ; সে পেশায় পানওয়ালি। এখানে প্রতিমা যে অস্বাভাবিক, স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংগতিবিহীন, সে বিষয়ে সচেতন হয়ে অচিন্ত্যকুমার নিজেই লিখেছেন, 'এ যেন খেলো পানওয়ালির কথা নয়।' (*বেদে* উপন্যাসে এরকম চেষ্টাকৃত উপমার সমালোচনা ক'রে অচিন্ত্যকুমারকে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, উপমাগুলোকে 'অনেক সময়েই তুমি টেনে এনেচ।' *কল্লোল*, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ. ৭-৮।) হলুদ সর্ষে ফুলের প্রসঙ্গে 'টুকটুকে' বিশেষণের প্রয়োগ বাংলার স্বাভাবিক বাক্‌রীতিরও বিরোধী। হয়তো বিপরীত মেরুর লেখক বলেই অচিন্ত্যকুমারের প্রতি তারাশঙ্কর প্রথম যুগে এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রথম বই অচিন্ত্যকুমারকে উৎসর্গ করবেন। 'অচিন্ত্যকুমারের চোখ-জুড়ানো পাণ্ডুলিপি দেখে এমনি সুন্দর পাণ্ডুলিপি রচনার উপর খুব একটা ঝোঁক ছিল আমার' (*আমার সাহিত্য জীবন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৬)। গোড়ার দিকে তাঁর ভাষার উপরেও অচিন্ত্যকুমারের কিছু ছাপ পড়ে। ছোটগল্প 'রাইকমল'-এর সমালোচনা-সূত্রে (*শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ৬৩৪-৩৫) সজনীকান্ত যে একদা ব্যঙ্গ ক'রে লিখেছিলেন : 'এই গল্পের ভাষাটিও 'কল্লোলে'র গ্রামাফোনে হুবহু উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে'—তা সম্পূর্ণ লক্ষভ্রষ্ট নয়। অচিন্ত্যকুমারের প্রতি তারাশঙ্করের এই আকর্ষণকে নাগরিকের প্রতি গ্রামীণের—শিলারের পরিভাষায় 'সেন্টিমেন্টাল'-এর প্রতি 'নাইভ'-এর স্বাভাবিক টান বলা যেতে পারে।

৬৬ তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে 'প্রসাদমালা'তে (ফ্রেবুয়ারি ১৯৩১) এবং উপন্যাসের মধ্যে *প্রেম ও প্রয়োজন*-এ (১৯৩৫) বাণিজ্য-নগরী কলকাতার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে। উভয় ক্ষেত্রেই কলকাতার সূত্রে গণিকার অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। দ্র. *প্রসাদমালা* [গল্প সংকলন], কলকাতা, ১৩৫২, পৃ. ৩৫ এবং *প্রেম ও প্রয়োজন*, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৩৭১।

৬৭ *নীলকণ্ঠ*, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৮৪-৮৫।

৬৮ তারাশঙ্করের দ্বিতীয় উপন্যাস *পাষাণপুরী*-র (১৯৩৩) একটি চরিত্র পৃথিবী থেকে টাকা তুলে দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে : 'আমাকে যদি দুনিয়ার রাজা করে দেয়, তো আমি দুনিয়াটাকেই একটা জেলখানা ক'রে দিই। সব বাবা খাট আর খাও, খাও আর খাট, পয়সা কেউ পাবে না।' *পাষাণপুরী*, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৩৯।

৬৯ শহরের তুলনায় গ্রামের প্রতি পক্ষপাত, ধনতন্ত্রের প্রতি এই মনোভাবের অন্য দিক। দুঃখের দিনে গোষ্ঠ আর দামিনী বুঝেছে, শহরের চেয়ে ফেলে আসা গ্রাম ছিল ভালো :

১ ছোট মিস্ত্রী বলে, পাড়াগাঁয়ের বাবু বোধহয়, তাই এমন ধারা ; পাড়াগাঁয়ের মুচীও গ্রামসুবাদে মামা হয়।

গোষ্ঠ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ তাহার গ্রামকে মনে পড়ে...সত্য, সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক ; তবু ক্ষমতা ছিল। [*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ. ৬৪]

২ দামিনীর চোখ দিয়া দুই ফোটা জলও গড়াইয়া পড়িল, আজ মনে হয়, শত দীনতা, শত নির্যাতনের মধ্যে সে ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল। [*চৈতালী-ঘূর্ণি*, পৃ ৬৬]

৭০ সার্ত্রের ট্রিলজির তৃতীয় খণ্ড থেকে নাটসি আক্রমণ-তাড়িত উদ্বাস্তু 'শোভাযাত্রা'-র ছবি এখানে উদাহরণ হিশেবে তোলা যেতে পারে : 'সমস্ত রাস্তাটা ছেয়ে ফেলেছিল লম্বা-কালো পিঁপড়েতে...তাদের সামনে সড়সড় ক'রে এগোচ্ছিল বিশাল, মন্থর, অদ্ভুত সব পোকা...মোটরগুলো আওয়াজ করছিল গলদা চিংড়ির মতো, ডাকছিল ঝিঁঝিঁ পোকার মতো। মানুষগুলো সব সরীসৃপ হয়ে গেছে...আমরা একটা জঘন্য, ব্যবধিহীন পোকার পা ছাড়া কিছু নই।'—Jean-Paul Sartre. *Iron in the Soul*, tr by Gerard Hopkins, London, third impression, 1955, pp. 22-27.

৭১ Jean-Paul Sartre. *Being & Nothingness*, tr by Hazel E Barnes, New York, Washington Square Press Edition, 2nd printing, 1966, p. 747

৭২ *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, প্রথম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫৮, পৃ. ২০২।

৭৩ *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, পৃ ৩৪০।

৭৪ Hegel, *The Philosophy of Fine Art*, tr F.P.B. Osmaston, vol. IV, London, 1920, p 171

৭৫ 'আমার কথা', *শনিবারের চিঠি*, ভাদ্র ১৩৭১, পৃ. ৪০০।

৭৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কথা', *শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ০৯।

৭৭ দ্বন্দ্ব ছিল সেই বহুতর শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে—যেমন, জমিদারের সঙ্গে চাষীর, মালিকের সঙ্গে মজুরের, শহরের সঙ্গে গ্রামের।

৭৮ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and tr by Hoare & Smith, New York, second printing, 1973,pp. 53-60

৭৯ *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৪৮-৪৯

৮০ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার কালের কথা*, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃ. ৬

৮১ *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Birbhum . 1924-1932*, p. 55.

৮২ *Ibid*, p. 50.

৮৩ *Ibid*, p 56

৮৪ *আমার কালের কথা*, পৃ. ৬।

৮৫ *আমার কালের কথা,* পৃ. ৭।

৮৬ *আমার কালের কথা,* পৃ. ৭, ১২।

৮৭ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal : 1903-1908*, New Delhi, 1973, p. 327, pp. 503-06.

৮৮ Gramsci, *op. cit.*, pp. 6-9. গ্রামশি-র বিবেচনায় যাজক-সম্প্রদায় এই পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ইয়োরোপীয় যাজকদের কিছু মিল আছে। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে তারাশঙ্করের জন্ম। তাঁর উপর কৌলীন্যের প্রভাবের বিষয়ে বিনয় ঘোষ আলোচনা করেছেন (*শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ. ২৫০-৫১)। কিন্তু ১৯২৮-৩৮, এই পর্বের উপন্যাসের আলোচনায় কৌলীন্য বা ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব খুব প্রাসঙ্গিক নয়। বরং এই পর্বে প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বারংবার। যেমন, *চৈতালী-ঘূর্ণি*-তে :
১ 'কে রক্ষক ? /রক্ষক ভগবান কতদূরে কে জানে!/লোকে ভগবানকে ডাকেও। /কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।' (পৃ. ৪)
২ 'গোষ্ঠ ধীরে প্রশান্ত কণ্ঠে কহে, শ্মশান তো বুকে-বুকে, ঘরে ঘরে. কিন্তু মা আসে কই, নাচে কই মহান্ত ? ফাঁকি, ও সব ফাঁকি. ওসব মানুষের মন-গড়া কথা।
দুঃখের দিনে চরম নগ্ন বাস্তবতার মাঝে, মানুষের আশা-প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, সর্বরিক্ত মন, পরম প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান চায়।
যুগে যুগে পিষ্ট দারিদ্র্য দেবতার সন্ধান পায় না, সে কয়, সব ফাঁকি, মানুষের রচা কথা ওসব।
গোষ্ঠ আবার বলে, এ এইবার সবাই বুঝেছে, সবাই বলবে, দেখো।
ওই উপলব্ধি হয়তো সত্য ; ওই বাণী বলিবার জন্যই যেন বিশ্বমানবের অন্তর প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।' (পৃ. ২৯)।

৮৯ 'Sir I appeal on behalf of the middle-class people of Bengal, who do ordinarily cultivate their lands under *barga* system.. I appeal to the House to protect the middle-class against the unjust invasion on their rights. They deserve as much consideration as the tillers of the soil It is the middle-class who form the backbone of every country and every community It is the middle-class who are responsible for the spread of civilization and culture through out the country.'—*Council Proceedings . Official Report : Bengal Legislative Council : Thirtieth Session, 1928*, pp. 779-81
মধ্যবিত্তের সমর্থনে এই ধরনের যুক্তির প্যাটার্ন তারাশঙ্করের পরবর্তীকালীন লেখাতেও মাঝে-মাঝে ঘুরে এসেছে। যেমন, তেভাগা-আন্দোলন প্রসঙ্গে : (...ইহারা [বামপন্থীরা] এক সময় তেভাগা আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত যাহারা দেশের বক্ষপঞ্জর মেরুদণ্ড তাহারা সমূলে ধ্বংস হইত।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রামের চিঠি', *যুগান্তর*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

৯০ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সূত্রেই তারাশঙ্কর এবং তাঁর পাঠকসমাজের সম্বন্ধ-বলয় (ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক এসকার্পির ভাষায় 'পারস্পরিক সম্পর্কের সার্কিট', দ্রে. Robert-Escarpit. *Sociology of Literature*, tr. By E. Pick, New Introduction by M. Bradbury & B. Wilson, London. 2nd English edition. 1971, p. 7) প্রথম নির্দিষ্ট অবয়ব গ্রহণ করে। অবশ্য, এর আগেই *কল্লোল কালি-কলম*-এর কয়েকটি গল্প সাহিত্যিক আর পাঠকমহলের নজরে আসে : 'রসকলি' আর 'হারানো সুর' সম্পর্কে সব শুদ্ধ তিন-বাক্যের একটি সমালোচনাও বেরোয় *কালি-কলমে*-র পাতায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, পৃ. ১১৮)। *শনিবারের চিঠি*-তে ('সংবাদ--সাহিত্য', *শনিবারের চিঠি*, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ৬৩৪-৩৫) *রাইকমল*-এর যে-আলোচনা করেন সজনীকান্ত, তাতে মধুর তুলনায় হুল-ই ছিল বেশি। *চৈতালী-ঘূর্ণি* প্রকাশের পরেই প্রথম ব্যাপক রিভিউ পেলেন তারাশঙ্কর। তাঁর প্রথম উপন্যাসকে যদি বলি, পাঠকসমাজকে সম্বোধন-ক'রে-পাঠানো বার্তা, তাহলে এই রিভিউগুলোকে অংশত লেখকের-উদ্দেশে-পাঠানো পাঠকের প্রতিবার্তা বলতে পারি। সঙ্গে-সঙ্গে

যেন পাঠকের সঙ্গে তারাশঙ্করের একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে গেল : লেখক যেমন জানলেন, তাঁর পাঠকের সম্ভাব্য প্রত্যাশা কী, পাঠকও তেমন জানলেন, লেখকের কাছে কী প্রত্যাশিত।
এই প্রত্যাশার মাত্রা অনেকটা নিরূপণ ক'রে দিল *উপাসনা*-র রিভিউ।
উপাসনা-র দীর্ঘ সমালোচনায় তারাশঙ্করকে অভ্যর্থনা জানানো হল, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী নতুন বক্তব্যবাহক অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক রূপে, যে-মূল্যায়ন সজনীকান্ত বা মোহিতলাল সাধারণ্যে পেশ করেছিলেন আরও বেশ কয়েক বছর পরে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করি : 'আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব অস্বীকার ও অতিক্রম করিবার একটি ধুয়া কিছু দিন হইতে শোনা যাইতেছে। প্রায় ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা অবশ্য হাস্যকর রকমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এইরকম চেষ্টামাত্রই যে হাস্যকর একথা কেহই বলিবেন না। বিশেষ করিয়া যখন দেখি, কোনও রচনা এই চেষ্টা কিম্বা আন্দোলনের বিন্দুমাত্র ছাপ না নিয়া ব্যক্তিগত প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ দিতেছে তখন বর্ত্তমানের এই দূষিত সাহিত্যিক আবহাওয়াতেও স্বস্তির নিঃশ্বাস টানিয়া বাঁচি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চৈতালী-ঘূর্ণি" ব্যক্তিগত প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের এমনই একটি প্রমাণ এবং এ-প্রতিভা যে বিদেশী-সাহিত্য পাঠপুষ্ট পরগাছা-প্রতিভা নয়, বইখানি যিনি পড়িবেন, তিনিই একথা স্বীকার করিবেন।... "চৈতালী-ঘূর্ণি"র প্রত্যেকটি অক্ষর দ্রষ্টার আন্তরিকতা ও বস্তুর সত্যতা প্রমাণ করে' (*উপাসনা*, পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৬০৫-০৭)।
তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস প্রশংসার স্তবক সব চেয়ে বেশি পায় রাজনীতি–ঘেঁষা (বিশেষত স্বরাজ্য দলের) পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে—*উপাসনা*, *বিজলী*, *নবশক্তি*, *লিবার্টি* থেকে। সমালোচনার টোনের আরও নমুনা হিশেবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের রিভিউ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যায় : 'তারাশঙ্করের "চৈতালী-ঘূর্ণি" চাষা ও শ্রমিকের সুখ-দুঃখের কথা হলেও এই শক্তিমান লেখকের দক্ষহাতে চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে জীবন্ত জ্বলজ্বল হয়ে... (*নবশক্তি*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ তারিখের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত)।
একই বাক্যে লেখকের আর গোষ্ঠর অনুভব একাকার হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত :
'গোষ্ঠর দেহের হাড়গুলা অবধি কনকন করিয়া উঠিল. উঃ! এতগুলা তীক্ষ্ণ, হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে!' (পৃ. ৩৪)। এই বাক্যের প্রথমাংশ লেখকের কথা : কিন্তু একটা কমার পরেই, 'উঃ! এতগুলা তীক্ষ্ণ. হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে'—এই শারীরিক অনুভূতি গোষ্ঠর। আবার, শিবকালী-তারাশঙ্করের অভেদ *চৈতালী-ঘূর্ণি*-প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে যে-ভাবে বেরিয়ে আসে, তাও লক্ষণীয়। 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর'—উপন্যাসের এই শেষ বাক্য, শিবকালীর উক্তি। কিন্তু কথাগুলোকে লেখকের বিবৃতি হিশেবে ধ'রে নিয়েছিলেন *পরিচয়*-এর সমালোচক : 'লেখকের বিশ্বাস, "চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদুত কালবৈশাখীব" (*পরিচয়*, বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ. ৭১৬)। প্রিয়রঞ্জন সেনও তাই করেছিলেন : 'কলের শ্রমিক-ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে, নায়ক গোষ্ঠ পুলিসের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে চৈতালী-ঘূর্ণির সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে।...অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কি হয় ? কালবৈশাখী আসে কিনা ?'—(*আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৮৯-৯০)। এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তারাশঙ্কর নিজেও শিবকালীর উক্তিকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিশেবেই ধ'রে নিয়েছেন। দ্র. *আমার সাহিত্য জীবন*, পৃ. ৯০-৯২

প্রথম প্রকাশ : *এক্ষণ*, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২।
অদলবদল ১৯৯৯

তারাশঙ্করের নারী চরিত্র : বিষাদ ও বেদনা

মাহমুদা খাতুন

তারাশঙ্করের উপন্যাস সংখ্যা সাতান্ন। এই বিপুল বিশাল উপন্যাস ভুবনে যিনিই পরিভ্রমণ করেছেন, তিনিই একটি গূঢ় বিষাদ, বেদনা ও অচরিতার্থতার ভাব অন্তরে অনুভব করে থাকবেন। বেদনা সর্বত্র : ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের। পুরাতনের পরাজয়ে বেদনা—আবার নতুনেও দ্বিধা, আশঙ্কা। আদর্শবাদ, ঐতিহ্য ও ধর্মাশ্রয়ী সংস্কারের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও কোন দ্বিধামুক্ত বিশ্বাসে তারাশঙ্কর সংহত হতে পারেননি। জীবনদ্বন্দ্বের শক্তিমান রূপকার হিসেবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, দ্বন্দ্বের কারণেই তাঁর শেষ কথাটি বেদনাবিধুর, অনুভববিষণ্ন। 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার' একথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসায় স্রষ্টার মানসের পূর্ণ পরিচয়ের আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাঁর সময়, তাঁর জীবন ও তাঁর বিশ্বাসেই সেই পরিচয় বিধৃত থাকে। সেই জন্য তারাশঙ্করের সময়ে, তাঁর জীবনে ও জীবনবিশ্বাসে এই বিষাদবোধের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

তারাশঙ্কর বিংশ শতাব্দীর একজন আধুনিক সাহিত্যিক। একটি মহাযুদ্ধের পরে আর একটি মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে—কবিতা ও কথাসাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বয়সে যারা নবীন, মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের পরিবর্তন ও ভাঙ্গন তরুণ বয়সে যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরাই তিরিশোত্তর আধুনিক সাহিত্যের স্রষ্টা। মহাযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসক্রিয়া মানুষের এ-যাবৎকাল অর্জিত মূল্যবোধগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষকে রিক্ত, একা ও নিঃস্ব করে দিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই ভাঙ্গনক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল, জীবন হয়ে উঠল পতিতভূমি, খণ্ড খণ্ড, অসংলগ্ন ও গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ। এই বিষাদিত নতুন বোধেই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু একজন কবি যতটা অন্তর্লীনতা উপভোগ করেন, সাহিত্য ধর্মে একই সময়ের একজন ঔপন্যাসিক ততটাই বস্তুবিশ্বের প্রতি দায়বদ্ধ। সাহিত্য মাত্রেই subjective, মন্ময়, কিন্তু কবির নিজ অস্তিত্বে তলিয়ে যাবার যতটা স্বাধীনতা, ঔপন্যাসিককে ততটাই বস্তুবিশ্বের সাথে সংলগ্ন থাকতে হয়। কবি শেষ পর্যন্ত নিজেকেই প্রকাশ করেন, ঔপন্যাসিককে তাঁর চতুঃপার্শ্বস্থ মানবজীবন ও জগৎকে অবলম্বন করেই নিজ কথাটি বলতে হয়। উপন্যাসের মধ্য দিয়েও জীবন যবনিকার ওপারে দৃষ্টিপাত করা চলে। জীবনের রহস্য সম্পর্কে একটি বিষণ্ন বেদনাতুর অভাবের উপলব্ধি পেতে হয়, কিন্তু কবির স্বাধীনতা অনেক বেশি। সেই জন্য তিরিশোত্তর আধুনিক কবিরা ইওরোপীয় প্রভাবে জীবন ও জগৎ সর্ম্পকে যে

যে সংশয়, প্রশ্ন রাখেন, অথবা নিজের মধ্যে যে নৈরাশ্য, অসংলগ্নতা অথবা অর্থহীনতা অনুভব করেন, ঔপন্যাসিকেরা সে পথে না গিয়ে আন্তরিক ভাবেই জীবনের প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা, আশাবাদী প্রেরণা পোষণ করে থাকেন। নতুন যুগের কারণে তাঁরাও বিশ্লেষক, সর্তক, কিন্তু প্রবহমান জীবনধারাটি তাদের কাছে সত্য ও মূল্যবান। তবে এই জীবনেও বেদনা, বিষাদ, বিষণ্নতা আছে, কিন্তু বিফলতাকেই তাঁরা জীবনের এক মাত্র সত্য মনে করেন না। এক শত আঠার বৎসর আগের লালন মানবজমিনকে পতিত ভূমি বলেছেন। তাঁর বহু পরে মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংসলীলার পরে অন্য এক কবি Waste land বলেছেন মানবজীবনভূমিকে। অথচ সময়ে, বিশ্বাসে, বোধে দু'জন কত স্বতন্ত্র। লালন বলেছেন 'মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা'। ব্যক্তির শুভবুদ্ধি, বিশ্বাস, সামর্থ্যের উপর লালনের আস্থা আছে, জীবনের ফসলহীন অচরিতার্থতার জন্য ব্যক্তিকেই তিনি দায়ী করেছেন 'মন তুমি কৃষি কাজ জানো না'। লালন আধ্যাত্মিক ফসলের কথাই বলেছেন সত্য, কিন্তু দুর্লভ মানব-জন্মের জন্য, বিশ্বাস ভালবাসাপূর্ণ মানব-সম্পর্কের জন্য তাঁর কৃতার্থতাবোধ আছে, কৃতজ্ঞতা আছে ঈশ্বরের উপহার এই সুন্দর পৃথিবীর জন্যও। ঈশ্বরানুভূতির ফল একটাই—মনুষ্যজীবনে আস্থা। আর নৈরাশ্যতিক্ত পাশ্চাত্য কবির জীবন পতিত, পরিত্যক্ত ভূমিখণ্ড। কোন পরিচর্যাতেই এই বন্ধ্যা ভূমি সবুজ হয়ে উঠবে না। মানুষের তাই যেন ভবিষ্যৎ নেই, সে একা, সে বিচ্ছিন্ন, Hollow man। জীবনের এই সর্বরিক্ত ও তিক্তরূপ পাশ্চাত্য প্রভাব বেয়ে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিতায় এলেও, উপন্যাসে তার প্রতিধ্বনি নেই। বরং লালনেরই সরল বিশ্বাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল—এই প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ত জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগ বেশি—তবু জীবনকে কি পরিত্যাগ করা যায়, অন্যায়-অবিচার আছে, তাই বলে কি বিশ্বাস হারাতে হবে, স্নেহ সম্পর্কগুলিকে কি ক্ষমা, ধৈর্য, প্রেম, সহনশীলতার জলসিঞ্চনে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? লালনের এই-ই 'কৃষি কাজ'। এই দায়িত্ববোধ, গভীর প্রত্যয় আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা—বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন। জীবনবেদনা ও বিশ্বাসহীন নৈরাশ্য এক নয়—এটিই তাঁদের উপলব্ধি। দেশকালের সঙ্গে উপন্যাসের ভাবমণ্ডলের যোগ সাধন তাঁরা করেছেন গভীর সততার সঙ্গে যা তাঁদের পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য-প্রভাবিত কল্লোলযুগীয় লেখকদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। তাঁরা দেশের সামগ্রিক শ্রেণী, বোধ ও ব্যক্তির সংকটকেই অনুভব করে উপন্যাস রচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ বোধের সংকট, তারাশঙ্কর শ্রেণীর সংকট, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তির সংকটকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন আন্তরিকভাবে। দেশ-জিজ্ঞাসা, বিশ্বরহস্য-জিজ্ঞাসা অথবা ব্যক্তির মানসিক টানাপোড়েন তাঁরা বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ধরতে চেয়েছেন। তাঁদের সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণাই জীবনাগ্রহ। তারাশঙ্কর মূলত হৃদয়ধর্মী ঔপন্যাসিক, তাঁর মানব ও জগৎপ্রীতি নিশ্চয়ই স্মরণীয়, কিন্তু তাঁর

রচনায় জীবনরহস্য ও পরিণাম সম্পর্কে একটি বিষাদানুভূতিই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষাদ লালনের বিষাদের সমগোত্র, এর মধ্যে নৈরাশ্য বা তিক্ততা নেই। তাই তারাশঙ্কর পরিপূর্ণ অন্তরে বলতে পারেন—'জীবন এত ছোট কেনে ?' সুতরাং বলা চলে, তারাশঙ্করের বিষাদভাবনা উত্তরতিরিশের অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী নৈঃসঙ্গ্য বোধের থেকে স্বতন্ত্র। শুধু কবিতায় নয়, প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইওরোপীয় উপন্যাস, বিশেষ করে স্ক্যানডিনোভিয়ান উপন্যাস কল্লোলযুগে লেখকদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কেউ কেউ প্রভাবিতও হয়েছিলেন। কিন্তু তারাশঙ্কর এ দেশের মানুষের কথা বলতে গিয়ে কখনোই পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত হন নি। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনা *কীর্তিহাটের কড়চা* জন গলসওয়ার্দির *ফরসাইট সাগা*-র সমধর্মী, এ অভিমত কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তারাশঙ্করের তথাকথিত 'অনভিজ্ঞতা'র জন্য নয়—মনেপ্রাণেই তিনি এ দেশের মানুষ, এ দেশের জীবনস্বরূপে বিশ্বাসী ছিলেন—তাঁর রচিত সাহিত্যে তাই কোন বিদেশীয় প্রভাব নেই। প্রমথনাথ বিশি একটি রঙ্গ কবিতায় তারাশঙ্কর সম্পর্কে লিখেছিলেন, স্মরণ করা যেতে পারে—'কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল / না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল।' অমর হবার জন্য তারাশঙ্করকে পরের দুয়ারে হাত পাততে হয় নি—এ তাঁর উপন্যাসের গৌরব, বাংলা সাহিত্যের গৌরব।

যদি সময়ের নয়, তবে কি বিষণ্ণতার বীজ তাঁর জীবনে, তাঁর সর্বাত্মক অনুভবেই ছিল? ব্যর্থ পথ সন্ধান, নির্মম ভবিতব্যের কি তিনি দ্রষ্টা ছিলেন ? *তারাশঙ্কর রচনাবলী*-র প্রথম খণ্ডে তারাশঙ্কর পুত্র সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার শেষ অংশে লিখেছেন—'খ্যাতি প্রতিষ্ঠার কামনা (তারাশঙ্করের) নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাই যে তার ধ্যেয় বস্তু ছিল না, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাই যদি হতো, মানুষটি এত বিষণ্ণ ছিলেন কেন ? সাধারণের মধ্যে, পাঁচ জনের মধ্যে তাঁকে চেনা যেত না, তখন তিনি ভুলে থাকতেন। কিন্তু একা হলেই কোন এক বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন থাকতেন। মনে হত তিনি যেন এক দুঃখের পাথারে ভাসছেন, আর সে পাথারের কোন কূল কিনারা নাই।...তারাশঙ্কর সারাজীবন কি খুঁজেছেন তা বলা কঠিন। তা হয়ত তিনি নিজেও জানতেন না। আর তিনি যা খুঁজেছিলেন, তাও পান নি তিনি। মানুষ তারাশঙ্করের অন্তর্জীবনের ইতিহাস না জানা চাওয়ার বস্তুকে এই খুঁজে না পাওয়ার ইতিহাস।[১] সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখিত তারাশঙ্করের শেষ জীবনের বিষণ্ণতা কি শুধুই শেষ জীবনের ? তবে *গণদেবতা পঞ্চগ্রাম*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* অথবা *কবি* উপন্যাসে এত দুঃখ কেন, অনিশ্চয়তা, বেদনা আর বিফলতাই কেন উপন্যাসের শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় ?

তারাশঙ্কর, যাকে সার্থকতা বলা হয়, তা জীবিত অবস্থাতেই পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছিলেন। অর্থ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা কিছুরই অভাব থাকে নি। অর্থের দিক থেকে স্বচ্ছল

হয়েছেন, কলকাতায় নিজ বাড়ি হয়েছে, আট বৎসর পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের, ছয় বৎসর কাল কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্য থেকেছেন। তিনি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্র, অকাদেমি, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ; শরৎচন্দ্র স্মৃতিপদক, জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ; যাদবপুর, কলিকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেছেন। এক জীবনে কত সম্মান সঞ্চয় ! অথচ সমকালীন ও সম প্রতিভাবান বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রাষ্ট্রীয় অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানই পান নি। এদিক থেকে তারাশঙ্কর অপরিসীম সৌভাগ্যবান। তবু 'কেন একা হলেই গভীর বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন থাকতেন?' 'মনে হত তিনি যেন দুঃখের পাথারে ভাসছেন—যে পাথারের কোন কূল কিনারা নাই', এরকমই বা হবে কেন? কি সেই দুঃখ, অপ্রাপ্তি, অচরিতার্থতা? তারাশঙ্কর পরম আস্তিক ছিলেন, আপন মায়ের কাছে গুরুমন্ত্র নিয়েছিলেন—শেষ জীবনে ঈশ্বরসন্ধান, অথবা ঈশ্বরসান্নিধ্য-কামনাই কি তাঁকে বিষণ্ন করে রেখেছিল ? এ কি তাঁর বিরহবোধ? কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা মানুষকে বিষণ্ন করে না—ঈশ্বরবিশ্বাসে হৃদয়ে প্রশান্তি, সান্ত্বনা আসে। কেন তাঁর বিষণ্নতা—অনুসন্ধানের ফলে এই রহস্যের সমাধান হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হবে, তবে সাধারণ জ্ঞানে ও বিবেচনায় মনে হয় তারাশঙ্করের এই বিষাদবোধ শুধু শেষ জীবনের নয়—সারাজীবনেরই। এই ধারণার কারণ হিসেবে তিনটি সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে,—যা তার জীবনের তিনটি পর্যায়ে পাওয়া যায়।

প্রথমত : তারাশঙ্কর পিতৃহীন ছিলেন, বাল্য বয়স থেকে জননী প্রভাবতী দেবী ও পিসিমা শৈলজা দেবীর পরিচর্যায় তিনি বড় হন। প্রভাবতী দেবী নতুন কালের দাবিকে স্বীকার করতেন, এবং পুত্রের মধ্যেও সেই প্রেরণা সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে পিসিমা শৈলজা দেবী উগ্র ঐতিহ্য-পরায়ণা, সামন্ত আভিজাত্যবোধ পুত্র-প্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে জাগ্রত রাখার জন্য সদা সতর্ক। এই দুই বিপরীত ধারা সারাজীবন তারাশঙ্করের মধ্যে বয়ে চলেছে। এই জন্যই কি তিনি "দ্বন্দ্বের শিল্পী, দ্বন্দ্বের শিকার"?[২] এবং এই দ্বন্দ্বের বেদনা শুধু রচনার মধ্যে নয়, নিজের মধ্যেও বহন করেছেন আমৃত্যু?

তারাশঙ্কর নিজের বিবাহে সুখী ছিলেন না। কিশোর বয়সেই অভিভাবিকা পিসিমার আগ্রহে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী উমাশশীর সাথে তাঁর যথার্থ মনের মিল হয়নি। প্রথম জীবনে কলকাতায় থেকে সাহিত্যচর্চা করার সময় নিরুপায় হয়ে তাঁকে স্ত্রীর নিজস্ব অর্থ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করতে হতো, এজন্য গ্লানির অবধি ছিল না তাঁর। তবু সময় আর সংসার থেমে থাকে নি, পুত্র কন্যা এসেছে, দারিদ্র্য দূর হয়েছে, স্ত্রীকেও মেনে নিয়েছেন। সংসারে শান্তি এসেছে হয়ত, তবে উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর জন্য জীবনব্যাপী আক্ষেপ শেষ হয় নি তারাশঙ্করের। নইলে কেন বলবেন—'মনে হয় মনের সাত মহলার কোন গোপন মহলে কোন এক মেয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে, যাকে পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, পাওয়া হয়নি।'[৩] স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের মত মানুষও বলেছিলেন

'মনের কথা বলার লোক রইল না'। [৪] উমাশশী কখনোই তারাশঙ্করের মনের কথা বলার লোক ছিলেন না, এক মন না হলে তো মনের কথার বিনিময় হয় না। এই দুঃখ তারাশঙ্কর সারাজীবন বহন করেছেন। শেষ জীবনে তারাশঙ্কর আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন, সব বিষাদ, বিবাদ ভুলে প্রান্ত-জীবনে দাম্পত্য-সম্পর্কের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য হয়ত তৃষ্ণা জেগেছিল, কিন্তু স্ত্রীর ভগবদ্‌প্রীতি সেই পর্যায়েও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে তিনি একা, এবং আগাগোড়াই বঞ্চিত ভেবেছিলেন হয়ত। এই দাম্পত্য অতৃপ্তি যে তাঁর বিষাদ ও বেদনাকে গাঢ়তর করে নি এমন কথা কি বলা যায় ?

দ্বিতীয়ত : সাহিত্য রচনার দ্বিতীয় পর্বে তারাশঙ্কর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে তাঁর রচনার প্রাচুর্য লক্ষ করার মত। কিন্তু প্রথম পর্বের (স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত) উপন্যাসেই তাঁর শিল্পক্ষমতা চূড়া স্পর্শ করেছিল, দ্বিতীয় পর্বে সেই ক্ষমতা পুনরাবৃত্ত হয়নি। এর কারণ শুধু এই নয় যে তিনি নিজ গ্রামভূমিকে পরিত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে নগরবাসী হয়েছেন, তার শিল্পদৃষ্টির ভিন্নতাই স্পষ্ট হয় এই পর্যায়ে। 'দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস বেদনাজনক ভাবে বাস্তবতা থেকে পশ্চাদপসরণের যুগ।' [৫] বাস্তববোধকে বাদ দিলে তারাশঙ্করের বেশি কিছু বাকি থাকে না। তারাশঙ্করের স্বাভাবিক শিল্পধর্ম থেকে এই বিচ্যুতির কারণ আপন স্বার্থ বিবেচনা। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সমর্থন তাঁকে কংগ্রেস শাসনক্লিষ্ট দেশের সত্য অবস্থা প্রকাশে বাধা দিয়েছে। সতর্ক বিবেক পরিচালিত বাস্তববোধ এই পর্যায়ে অনুপস্থিত। 'তারাশঙ্করের প্রয়োজন ছিলো উপদ্রবহীন স্বস্তি ও নির্বিঘ্ন জীবন আর রাষ্ট্রশক্তির আবশ্যক ছিল সর্বভারতীয় এক সাহিত্যিক প্রতিভার, যিনি শাসকগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য সহায়ক-শক্তিরূপে প্রার্থিত ভূমিকা পালনে পরাঙমুখ হবেন না।' [৬] কংগ্রেসী প্রশাসনের সাথে নৈকট্যের ফলে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন, ১৯৫২ সালে রাজ্য বিধানসভা ও ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্য মনোয়ন লাভ করেন। এই দীর্ঘ সময়ের যথার্থ ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ তিনি দিলেন না। এই আত্মসমর্পণ, বাস্তব থেকে পলায়ন কোন্ মানবিক দুর্বলতা থেকে ? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি কি নিজেকেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ? যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার প্রাপ্তির মূল কারণ অবশ্যই তাঁর সাহিত্য কীর্তি কিন্তু রাষ্ট্রীয় উপাধি পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্যই ব্যক্ত করে। এই আনুকূল্যের ভার তিনি আজীবন বহন করেছেন, এই প্রাপ্তি কি তাঁর অন্তরে, গোপন সত্তায় শিল্পধর্মচ্যুতির অপরাধ হয়ে তাঁর বিষাদকে বর্ধিত করেছিল ?

তৃতীয়ত : আপন সৃষ্টিক্ষমতায় তারাশঙ্কর কি শেষ পর্যায়ে নিরাশ হয়েছিলেন ? ৪৭-এর পরে তিনি এমন একটি গ্রন্থও রচনা করেন নি যা *গণদেবতা, কবি* বা *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র সাথে তুলিত হতে পারে। প্রচুর লিখেছেন তিনি এ সময়ে, কিন্তু প্রথম পর্বের সেই অখণ্ড বস্তুপ্রেরণা, উদ্দীপনক্ষমতা, স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, সামগ্রিকতার বোধ একটি গ্রন্থেও বৃহৎ প্রেরণায় সংহত হলো না। সিনেমা হলো তাঁর উপন্যাস, গড়ন দেখে মনে

হয় সিনেমার জন্যই লেখা। ব্যক্তি, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস ঐতিহ্য এলো তাঁর উপন্যাসে সাময়িক আবেগে, কিন্তু পুরনো তারাশঙ্কর আর ফিরলেন না। শেষ বয়সে যেটুকু পারলেন—শুধু অভ্যাসে, দীর্ঘ কালের শিল্পধর্মের কারণে—তার বেশি কিছু নয়। শেষ জীবনে এই বিচ্যুতি, অক্ষমতা তাঁকে বিষণ্ন করেছিল, নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে সত্যই তিনি হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এই সব মিলেই কি তাঁর ব্যথার পাথার—যার কূল-কিনারা ছিল না বলে তাঁর পুত্রের ধারণা ?

সুতরাং বিষাদ, ব্যর্থতার বোধ, বিপন্নতা ছিল। এবং তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই। তাঁর রচিত সাহিত্যই তা প্রমাণ করে। তারাশঙ্করের গভীর আস্তিক্যবোধ, আশাবাদী প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু তাঁর সব প্রধান উপন্যাসেই দুঃখের চোরা স্রোত বয়ে চলেছে। *ধাত্রী দেবতা*-তে শিবনাথ যে স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করে জেলে যায়—সে স্বাধীনতা কি জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছিল ? তাঁর *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে দেখি নতুনের জন্য পুরাতন কালধর্মই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। শিবশেখর ন্যায়রত্ন পুরাতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে দেশত্যাগ করেন, কিন্তু নতুনের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ অকালে প্রাণ হারায় কেন ? পুরনো জমিদার আর নতুন ভূস্বামী শ্রীহরির পার্থক্য বেদনার মত বুকে বাজে। আর ছোট ছোট বৃত্তে অনিরুদ্ধ কামার, রহম শেখ, ইরসাদের যে জীবনযন্ত্রণা, অসহায়তা তার দুঃখও কি কম? প্রচলিত সমাজবিধি, জীবনব্যবস্থা যদি মানুষের জীবনে শান্তি আর স্বস্তি না আনে তবে নতুন কোন্ ব্যবস্থায় তার সমাধান হবে জানা যায় না। *কবি* উপন্যাসে জগৎ সংসার সম্পর্কে আনন্দময় বোধ ও বুকভরা ভালবাসা নিয়েও নিতাই-এর গৃহ রচনা হয় না—পথেই জীবন কাটে তার। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-তে বনোয়ারী কালধর্মেই হয়ত পরাজিত হয় করালীর কাছে, কিন্তু পরাজিত বনোয়ারীর মর্যাদাবোধ, দায়িত্ব, সাহস, সর্বোপরি সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য মমতা কি করালীর আছে ? সে নতুন কালের প্রতিনিধি, ঠিক, কিন্তু যোগ্যতা কতটুকু তার ? *কালিন্দী*-তে ব্যক্তি ও পরিবারগত ব্যর্থতা ও বেদনার পরেও প্রশ্ন জাগে—*কালিন্দী*-র নতুন বসতি-স্থাপিত চর থেকে বিতাড়িত সাঁওতালদের আসল শত্রু কে—জমিদার অথবা বণিক বিমলবাবু ? তাদের বিতাড়ন, তাদের কন্যা সারীর অপমান পাঠকহৃদয়ে বিঁধে থাকে। তারাশঙ্করের প্রায় সকল উপন্যাসেই এমন একটি বিফলতার, বেদনার বার্তা থাকে। এটিই তাঁর অন্তরতম অনুভব।

সুতরাং তারাশঙ্করের উপন্যাসের চরিত্র জীবন সাপেক্ষেই অচরিতার্থতার বেদনা ও বিষাদ বহন করে। তাঁর উপন্যাসের পুরুষপ্রাধান্য অবিসম্বাদিত। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র—*ধাত্রী দেবতা*-র শিবনাথ, *কালিন্দী*-র রামেশ্বর, অহীন্দ্র, *গণদেবতা*-র দেবনাথ, ন্যায়রত্ন, বিশ্বনাথ, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র বনোয়ারী, *কবি*-র নিতাই কবিয়াল, *আরোগ্য নিকেতনে*-র জীবন মশায়, *সন্দীপন পাঠশালা*-র সীতারাম

পণ্ডিত জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, পরাভূত, অথবা বিষাদাচ্ছন্ন। আমাদের মূল আলোচ্য তারাশঙ্করের উপন্যাসের নারী চরিত্র—তাদের বিপন্নতা, বিষাদ এবং বেদনা। যেখানে মূল উপন্যাস জীবনদ্বন্দ্বের—সমাজ, পরিবার, নীতি অথবা ব্যক্তির, সামগ্রিক সেই দ্বন্দ্ব—সেখানে নারী-চরিত্রগুলিও মূল ধারার অঙ্গীভূত। তারা নিজেদের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীতে চাওয়া পাওয়ার, সার্থকতা-বিফলতার টানাপোড়েনে ব্যথা ও বঞ্চনাক্ষুব্ধ। তারাশঙ্করের সাতান্নটি উপন্যাসে অগণিত নারী চরিত্র এসেছে—অভিজাত, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, কৃষক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহরবাসী, ব্রাত্য-অন্ত্যজ নানা পরিবেশের বিচিত্র নারী তাদের সুখ-দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে আসে। তারা সাধারণ হয়ত, কিন্তু তারাশঙ্কর তাদের সম্পূর্ণতা দিয়েছেন তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই। ছোট বৃত্তে হলেও, আশ্চর্যজনক ভাবে তারা স্বতন্ত্র, বাস্তব, জীবনানুকূল। বার বার ছোট বৃত্তের উল্লেখ করা হচ্ছে এই কারণে যে তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলিতে সমস্যার কেন্দ্রস্থলে নারী চরিত্রকে স্থাপন করা হয়নি—যে-ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র করেছেন। পুরুষেরই সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা নৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্ব উপন্যাসের মূল বিষয়—নারী-চরিত্র জননী, জায়া অথবা প্রেমিকা হিসেবে পুরুষের সর্ববিধ কর্ম ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে না। অন্তত প্রথম পর্বের উপন্যাসে তারাশঙ্কর নারীকে সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠা দেন নি। *ধাত্রী দেবতা*-য় শিবনাথের পিসিমা শৈলজা দেবীর উগ্র পরুষ প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু মনে রাখতে হবে শিবনাথ বাল্যে পিতৃহীন, একমাত্র সন্তান। বয়ঃপ্রাপ্ত শিবনাথ নিজ সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে তারাশঙ্কর দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন অস্থির, সংশয়ক্লিষ্ট নগরজীবনের কথা বলছেন—তখন কিছু কিছু নারী চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই উপন্যাসগুলি তাঁর শিল্পক্ষমতার পরিচয় বহন করে না—বাস্তবতার পরিবর্তে নারীর উগ্র স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকতার চাহিদা অপূর্ণ থাকে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নারীর এই গণ্ডিবদ্ধতার কারণ খোঁজা আবশ্যক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (এই সময়েই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছিল) সমাজ এবং পরিবারে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। তাঁর বস্তু ও বিষয়জ্ঞান সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাই পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে নারীকে বৃহৎ পরিবেষ্টনীতে আনা, সমাজের প্রধান সমস্যার সামনে তাকে স্থাপন করা তারাশঙ্কর যৌক্তিক মনে করেন নি। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক আতিশয্য তারাশঙ্করে অকল্পনীয়, তাই তাঁর নারীচরিত্রগুলি নিজ অবস্থানে স্থিত, তাদের সুখ-দুঃখ, অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই ছোট আধারেই বর্ণিত হয়েছে। নারীজীবনের স্বরূপ ও সত্য সন্ধানে এমন স্বচ্ছ বাস্তবতা, নিরাবেগ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষণকেই প্রমাণ করে। স্ত্রীচরিত্রে কত বিচিত্র ও রহস্যময় অন্তর্জগৎ তিনি আবিষ্কার করেছেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে। হোক সে গ্রাম্য দরিদ্র কৃষক বধূ, বা অভিজাত ধনী-গৃহিণী, শহর অথবা গ্রামের স্বৈরিণী, অথবা শিক্ষিতা আধুনিকা—তারাশঙ্কর

তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবন জটিলতার সমগ্ররূপ সন্ধান করে চলেছেন। নারী চরিত্রের বর্ণনায় বৈচিত্র্যে, গভীরতায় তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তারাশঙ্কর উপলব্ধ যে বিষাদ-অপূর্ণতার কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, সেই বিষাদ বেদনা জননী, জায়া, প্রেমিকা, প্রেমবিরহিতা সকলের মধ্যে বিরাজিত। সত্যকার সুখী, জীবন সংগ্রামে জয়ী একটি মাত্র নারী চরিত্র চোখে পড়ে, সে *অভিযান* উপন্যাসের ফট্‌কি। তার কথা পরে বলা হবে। *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসের পদ্ম চরিত্রও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি পেয়েছে দেখা যায়—কিন্তু সেটিও সর্বসংশয় মুক্ত আনন্দ নয়। তাঁর প্রধান নারী চরিত্রগুলি সর্বদাই বিষাদাচ্ছন্ন, বেদনা ও বঞ্চনার আর্তি তাদের হৃদয়ে। এই সত্যটি বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে।

বাংলা সাহিত্যে মাতৃচরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদর্শায়িত। নারীর স্ত্রী সত্তা, নারীত্ব সকলই মাতৃত্বের কাছে তুচ্ছ। অথচ একই নারী প্রথমে স্ত্রী, পরে মাতা। সন্তানের জন্য নিরন্তর কল্যাণকামনা, সর্বত্যাগস্বীকার আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সর্বদাই আকাঙ্ক্ষিত, এবং অভিনন্দিত হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মা দেশমাতৃকা, মানবী মাতাকে তিনি সংসার-সংকটে আনেন নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম মাকে দেখতে চাইলেন ভিন্ন দৃষ্টিতে *চোখের বালি* উপন্যাসে। ভূমিকায় মায়ের ঈর্ষার প্রাবল্যের কথা বলা হয়েছে—উপন্যাসের আরম্ভেও পুত্রবধূর প্রতি বিরাগ, ঈর্ষা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুঃখের পরীক্ষায় মাতৃসত্তারই জয় হয়েছে। পুত্রের উপর অধিকার নিয়ে মাতৃঅন্তরে যে পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে এই বাস্তব ইঙ্গিত *চোখের বালি*-তে আছে। আনন্দময়ী অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সৃষ্টি, গোরাকে গর্ভে ধারণ না করেও তিনি গোরার মা, এর জন্য যত ত্যাগ, কষ্ট স্বীকার করতে হয় তিনি করেছেন। এমনই তাঁর চরিত্রগৌরব—গোরা তাঁর মধ্যে সমগ্র দেশকে প্রত্যক্ষ করে। শরৎ-সাহিত্যে মাতৃ মাহাত্ম্যকীর্তন বড় স্থান জুড়ে আছে—তবে তাঁর পথ ভিন্ন। তাঁর মাতৃচরিত্রেরা গর্ভের সন্তান অপেক্ষা অন্যের সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণা। *পল্লী-সমাজে*-র জ্যাঠাইমা আপন সন্তান অপেক্ষা দেবরপুত্র রমেশকে বেশি ভালবাসেন। *বিপ্রদাস* উপন্যাসে বিপ্রদাসের বিমাতা আপন পুত্র দ্বিজদাসের চেয়ে সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকেই স্নেহ করেন বেশি। *রামের সুমতি*-তে নারায়ণীর রামের প্রতি স্নেহের কাছে পুত্র গোবিন্দ দাঁড়াতেই পারে না। এরকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। মাতৃত্ব নিয়ে শরৎচন্দ্রে রোমান্টিক আতিশয্য যতটা আছে, বাস্তবতা ততটা নেই।

'মাতৃচরিত্র বেদনার বৃন্তে অধিষ্ঠিত' এ-কথা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। অতি সত্য এই উক্তি। এক অর্থে প্রত্যেক গর্ভধারিণী জননীই সারা জীবন সন্তানবিরহ ভোগ করে। যে অবোধ সন্তান কোলে আসে, সময়ের সাথে কোল থেকে নেমে ক্রমে ক্রমে মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। সন্তান বড় হয়, মা আর তার নাগাল পায় না—অথচ স্নেহ অবিচল, তাই বিরহবোধ মায়ের ফুরায় না। এটি চিরকালের কথা। কিন্তু আধুনিক জীবন জটিল ; লোভ, স্বার্থ, গর্ব, অভিমান, অত্যাচার, অবিচার কোন একটা মূল্যবোধে

মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না। মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না—ক্রোধ, অভিমান, অপমান, ঈর্ষা, অনেক সময় হয়ত মাতৃস্নেহকেও অতিক্রম করে যায়। তিরিশোত্তর উপন্যাসে যে বস্তুবোধ, বিষয়জ্ঞান ও বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে—মাতৃচরিত্র অঙ্কনেও তার স্পষ্ট প্রভাব আছে। তাই উত্তর-তিরিশের উপন্যাসে মাতৃচরিত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ হলো—মাতৃত্বের সম্মান রক্ষা করেই। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা বস্তুধর্মিতা ও বিশ্লেষণের জন্য মাতৃহৃদয়কে ভিন্নভাবে বিচার করতে চাইলেন। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। *জননী*-তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃত্বকে ঘিরে কোন আদর্শবাদ প্রচার করেন নি। শ্যামার স্বামী শীতল খেয়ালী, দায়িত্ববোধহীন ও দুর্বলচিত্ত বলে শ্যামা বধূজীবনেই সংসারের হাল ধরে। শ্যামার প্রথম সন্তানের জন্মে গ্রন্থের আরম্ভ, পুত্রবধূর প্রথম সন্তান প্রসবে গ্রন্থের সমাপ্তি। শ্যামার সুদীর্ঘ জননী-জীবনের বিভিন্ন স্তর—স্বচ্ছল সংসারের স্বপ্ন, দুঃসময়, পরের সংসারে আশ্রয়লাভ ও হীনতা স্বীকার, আবার পুত্রকে অবলম্বন করে নতুন সংসার গড়া, পুত্রের বিবাহ এবং পুত্রবধূর সন্তান জন্মের পরে পুত্রবধূকে গৃহিণীত্ব সমর্পণ—এ সাধারণ সংসারের চিত্র। ফাঁকে ফাঁকে অতৃপ্ত সাধ, বঞ্চনার ক্ষোভ প্রকাশ পেয়ে মানবী সত্তাকে প্রকাশ করে। স্বামী উদাসীন, শ্যামার জীবনে প্রেম ক্ষণস্থায়ী—তাই পুত্রবধূর স্বামীসুখ তাকে ঈর্ষান্বিত করে, কন্যাকে বিবাহযোগ্য বয়স থেকে সতর্ক পাহারায় রেখেছে, তার সুখ ও শোক-উচ্ছ্বাস প্রায়ই অসঙ্গত—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই শ্যামার সংকটকে এত নিবিড়ভাবে দেখেছেন ; তবু ছোট ছোট সাময়িক ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও মাতৃকর্তব্য ও গৃহিণীর দায়িত্ব নিয়ে শ্যামা-চরিত্র পূর্ণতা ও সংগতি পেয়েছে। মাতৃত্বের মাহাত্ম্যকীর্তন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল না—জননী-সত্তায় শ্যামার পুর্ণ পরিচয় সন্ধান করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বাস্তব, পরিচিত মাতৃমূর্তি *পথের পাঁচালী*-র সর্বজয়া। বেদনার বৃন্তেই তার অধিষ্ঠান। মাতা এবং সন্তানের সম্পর্কে সময় স্তরভেদ, পুত্র বিরহকে কেন্দ্র করে রূঢ় বাস্তবতা ও অবুঝ স্বপ্নের এমন সংমিশ্রণ বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নি।

সন্তানের জননী মানুষও। তাঁরও আশা-আকাঙ্ক্ষা দাবি আছে সংসারে। মাতৃত্বের দায়ে সর্বদাই তাঁর উচ্চ মানসিকতা, নিঃস্বার্থতা, ত্যাগ ও সহনশীলতা আশা করা অন্যায়। আশাপূর্ণ দেবীর একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বিধবার একমাত্র পুত্র দুর্ঘটনায় মারা গেল। মায়ের কাছে এর চেয়ে শোকের, বেদনার আর কী থাকতে পারে ? কিন্তু একটি ক্ষেত্রে শোকাতুর মাতা পুত্রবধূর প্রতি প্রতিশোধ কামনায় পুত্রের মৃত্যুকে ব্যবহার করলেন। পুত্রবধূটির বিধবার আহার্যের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনুকম্পা ছিল, শাশুড়ির কাছে তা গোপন ছিল না। পুত্রের মৃত্যুর পর সদ্যবিধবা পুত্রবধূর পাতের কাছে সেই খাবারই সাজিয়ে দিয়ে তিনি গোপন তৃপ্তি অনুভব করলেন। পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের শোকের পরিমাপ কে করে, কিন্তু প্রতিদিন অন্নগ্রহণকালে পুত্রবধূর অনাদব ও অবহেলাও

তো ভোলার নয়। বিচিত্র এই মানব সংসার ; নিয়ম, উচিত-অনুচিত কে বেঁধে দিতে পারে, কতটা বেঁধে দিতে পারে ? নিশ্চিন্দিপুর থেকে একেবারে চলে আসার সময় মৃতা কন্যা দুর্গার কথা একবারও সর্বজয়ার মনে পড়ে নি, অপুই চোখের জলে দিদিকে স্মরণ করেছে। এক দিক থেকে এও কি নির্মমতা নয় ? অথচ এটিই বাস্তব সত্য।

তারাশঙ্কর অঙ্কিত মাতৃচরিত্রগুলির মধ্যেও এই স্বচ্ছ বাস্তবদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-মুখিতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা এই বাস্তব সংসারেরই মানুষ, প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামরত, বাস্তব সত্যের উজ্জীবন তাঁদের চরিত্রে। আদর্শ মা আর সাধারণ মায়ের তফাৎ খোঁজেন নি তিনি, কারণ সকল মাতৃত্বই শেষ পর্যন্ত বেদনাকে বহন করে। সব মা-ই বিষাদময়ী, তবু মায়ের যত বিচিত্ররূপ তারাশঙ্করের আছে—আর কোন ঔপন্যাসিকে এত বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। অভিজাত গৃহের ব্যক্তিত্বশালিনী মা আর নিঃস্ব, রিক্ত, ছোট সংসারবৃত্তে আবদ্ধ মা একই বেদনা-মহিমা লাভ করেছে তাঁর উপন্যাসে। তারাশঙ্করের দ্বিতীয় উপন্যাস *নীলকণ্ঠ*। এই উপন্যাসেই তারাশঙ্করের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের গল্প এক কৃষক দম্পতির। উপন্যাসের গিরিবালা চরিত্রটি মাতৃত্ববোধের দিক থেকে অভিনব, এবং বেদনার রসে অভিষিক্ত। উপন্যাসের দুটি অংশে গিরিবালাকে দুভাবে পাওয়া যায়। সে ও তার স্বামী শ্রীমন্ত সন্তান-হীনতার বেদনা বহন করে। শ্রীমন্তের মাতৃহীনা ভাগিনেয়ী গৌরী তাদের জীবনের সান্ত্বনা। এই পর্বে সন্তান অদৃষ্টে নেই মেনে নিয়ে গিরি বুকভরা মাতৃস্নেহ গৌরীকে দেয়। স্বামী, কন্যাসমা গৌরীকে নিয়ে সে সুখী, সন্তুষ্ট। কিন্তু গৌরীর অমানুষ লোভী পিতা অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য পাত্রের সাথে লুকিয়ে গৌরীর বিয়ে দেয় বলে ক্রুদ্ধ শ্রীমন্ত তাকে হত্যা করতে গিয়ে আহত করে, এবং বিচার শেষে জেলে যায়। দ্বিতীয় পর্বে গিরিবালার অসহায় নিঃসঙ্গ জীবনে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়। ধনী, চরিত্রহীন প্রতিবেশী বিপিনের দ্বারা ধর্ষিতা হয় সে। এবং আশ্চর্য, এতদিন পরে, অনাকাঙ্ক্ষিত ধর্ষণের ফলে সে হয় সন্তান-সম্ভাবিতা। আনন্দ, অপমান, অসহায়তা গিরিবালাকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। সমাজের ভয় নয় শুধু—তার আত্মসম্মানবোধ, স্বামী-প্রেমের স্মৃতি, বিপিনের ক্রমবর্ধমান লালসা তাকে পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আপন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে সে অজানার পথে পা বাড়ায়। শহরে আসে সে নিরাশ্রয়. সন্তান জন্মদেয় সে উদাসীন ভাবে, অনাদরে। অপমান, অভিমানে শেষ পর্যন্ত গিরিবালা আত্মহত্যা করে। জীবনের সঞ্চিত হলাহল পুত্র, নীলকণ্ঠ যার নাম, তার গলাতেই রেখে সে পলায়ন করে জীবন থেকে। মাতৃত্ব ? গিরিবালা তা অস্বীকার করে। উপন্যাস হিসাবে *নীলকণ্ঠ* তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে না. কিন্তু গিরিবালার অসহায় জীবনে একটি বৃহৎ বেদনার আভাস আছে। সে সন্তানহীনা ছিল, তার স্বামীই হয়ত অক্ষম, কিন্তু গৃহজীবনে সে-ই অপরাধী হয়ে থেকেছে। ধর্ষণের মাধ্যমে যে সন্তান এলো, সে কিন্তু তার জীবনের সকল গরলকে অমৃত করে তুলল না।

কারণ স্বামীর ঔরসজাত যে সন্তান নয়—সেই সন্তানকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করে কাঙ্ক্ষিত কৃতার্থতা লাভে তার প্রাণ—সাড়া দেয় না। তার কাছে এ শুধুই অপমান, শুধুই কলঙ্ক গ্লানি। পরম অবহেলায় সে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আত্মজকে পরিত্যাগ করে গেল। মাতৃমূর্তির গতানুগতিক ধারণাকে তারাশঙ্কর অতিক্রম করলেন। অথচ, ভাগ্যের করুণ পরিহাসে, না জেনে শ্রীমন্ত জেল থেকে ফিরে এসে তার আপন গৃহেই পিতৃ-পরিচয়হীন নীলকণ্ঠকে দেখে। কোন অদৃশ্য বন্ধনে, কোন অসহায় মায়ায় শ্রীমন্ত নীলকণ্ঠের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে বিশ্বের পথে। নীলকণ্ঠ যে তারই আদরিণী স্ত্রী গিরিবালার গর্ভজাত—এ কথা সে কোন দিন জানবে না। পুত্র আর স্বামী মিলিত হলো, বেঁচে থাকলে গিরিবালাও মিলতে পারত। হতভাগিনী গিরিবালা!

ধাত্রী দেবতা তারাশঙ্করের প্রায় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। তারাশঙ্করই উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ। বাল্য ও কৈশোরে মা, পিসিমার স্নেহ-শাসন শিবনাথের মত তারাশঙ্করকেও ঘিরে রেখেছিল, তাঁদের অভিভাবকত্ব ও পরিচর্যায় শিবনাথ বড় হয়ে উঠেছিল। শিবনাথের মা জ্যোতির্ময়ী দেবী ও পিসিমা শৈলজা দেবী। তারাশঙ্করের মাতৃচরিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এ-দুটি চরিত্রই, বিশেষ করে শৈলজা দেবী আলোচিত হন। তারাশঙ্করের নিজের মায়ের ও পিসিমার প্রতিচ্ছবি শিবনাথের মা ও পিসিমা। দুটি চরিত্রই যথার্থ মাতৃগৌরবের অধিকারিণী। শৈলজা দেবী যখন তরুণ বয়সে একই দিনে স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ভাই-এর সংসারে ফিরে এলেন, তাঁকে যথার্থ আশ্রয় দিলেন তাঁর ভ্রাতৃজায়া জ্যোতির্ময়ী দেবী। আপন সন্তান, একমাত্রই, শিবনাথকে শিশু অবস্থায় তুলে দিলেন ননদের কোলে। স্বামী-পুত্রের শোক ভুললেন তিনি শিবনাথকে বুকে পেয়ে ; অবরুদ্ধ, শোকার্ত মাতৃস্নেহ যথার্থই মুক্তি পেল। জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র এবং জমিদারি ননদের জিম্মাতেই রইল। তিনি প্রয়োজনে শতবার বললেন শিবনাথ শৈলজা দেবীরই পুত্র, তিনি শুধু তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। আপন সন্তানকে অন্যের কোলে তুলে দেওয়ার জন্য এই গর্ভধারিণী জননীর অন্তরে ব্যথা ও ক্ষোভ কি ছিল না ? ননদের মাতৃ-অধিকারকে সারাজীবন তিনি সম্মান করেছেন, তবু একবার আহত মাতৃত্ববোধে, ক্ষোভের বশে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'আমি কি শিবনাথের মা নই ?' কিন্তু তাঁর চরিত্রে যথার্থই মহানুভবতা, ধৈর্য ও ক্ষমা ছিল—তাঁরই গুণে মৃত্যু পর্যন্ত সংসারে শিবনাথকে নিয়ে কোন চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয় নি। কারণ শৈলজা দেবীর ব্যক্তিত্ব প্রখর, আত্মসম্মানবোধ ও অভিমান প্রচণ্ড, এবং প্রকৃতিতে তিনি ক্ষমাহীন। জ্যোতির্ময়ী দেবী তারাশঙ্করের মাতা প্রভাবতী দেবীর মতই শিক্ষিত পরিবারের কন্যা ; শিক্ষা, উদারতা ও মুক্তবুদ্ধি তাঁর সহজাত ছিল। শৈলজা দেবী যেখানে শিবনাথকে সামন্ত আভিজাত্যে আদর্শ জমিদার হিসাবে গড়তে চান, তা যত ক্ষুদ্র জমিদারিই হোক ; জ্যোতির্ময়ী দেবী মাতার কর্তব্য হিসেবে শিবনাথকে দেশাত্মবোধে, মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরই অনমনীয় ও দৃঢ় প্রত্যাশার কারণে শিবনাথের লেখাপড়া অগ্রসর হয়,

এখানে তিনি আপস করেন না। শিবনাথের বিবাহ শুধু শৈলজার আগ্রহে হয়, কিন্তু বালিকা বধূটিকে তিনিই, পিসিমা নন, স্নেহ ভালবাসায় আপন করে নিতে চান। শিবনাথকে ঘিরে তাঁর মাতৃহৃদয়েও অহরহ ব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু কখনো তিনি আপনার অধিকারকে প্রকাশ করেন নি। বেদনার দাহ অপরিসীম ধৈর্যে সহ্য করেছেন। পুত্রের প্রথম প্রবাস যাত্রাকালে তার বাক্স গুছিয়ে দেবার অনুমতি পাওয়ায় তাঁর চোখ জলে ভেসে যায়—কিন্তু তিনি নিজে এই অধিকার দাবি করেন না—যদি শৈলজা দেবী ব্যথা পান এই বিবেচনায়। শুদ্ধ চরিত্র, উদার মানবিকতা তাঁর, তিনি ধৈর্যের প্রতিমা। পাশে থেকেও পুত্রবিরহ তিনি ভোগ করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। কাউকে বুঝতে দেন নি। মৃত্যুকালে শিবনাথকে তাঁর একমাত্র ও শেষ প্রশ্ন 'কোন অন্যায় করিসনি তো বাবা?' তাঁর অন্তরের উচ্চ ভাবকেই প্রকাশ করে।

পিসিমা শৈলজা দেবী সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। পিতা ও ভ্রাতার পরে তিনিই শিবনাথের জমিদারির হাল ধরেন। পরুষ, উগ্র ব্যক্তিত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট দিক। সর্ব দিকে দৃষ্টি তাঁর, জমিদারি পরিচালনায় সামান্যতম ত্রুটিও দেখা যায় না। কিন্তু শিবনাথের মায়ের প্রশান্তি ও উদারতা তাঁর নেই। শিবনাথকে মায়ের কোল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করেছেন কিন্তু হৃদয় উজাড় করা স্নেহ দিয়ে তাকে ভরেও রেখেছেন তিনি। বস্তুত শিবনাথের যেন দুটি মা। নিজ পিসিমার কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন— 'এই সর্বহারা নারীর জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র অবলম্বন, তাই আমাকে হারাতে, আমাকে ছাড়তে, কাউকে আমার মত বস্তুটিকে হাতে তুলে দিতে তাঁর শক্তি ছিল না। তার চেয়ে মৃত্যু তাঁর ভাল ছিল।' শিবনাথের মাত্র পনের ষোল বৎসরে শৈলজা দেবী সাধ করে তার বিয়ে দিলেন, কিন্তু বালিকা বধূটিকে বুকে তুলে নিতে পারলেন না। বধূর তিল মাত্র ভুলত্রুটি তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। অযৌক্তিক ভাবেই তিনি গৌরীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। এ ঈর্ষার চেয়েও অধিক। শিবনাথের বিবাহিত জীবন যে সুখের হলো না—কিছুটা দুই পরিবারের মর্যাদার সংঘর্ষ, বেশিটাই গৌরীর প্রতি শৈলজা দেবীর বিরাগ। বিচিত্র মাতৃস্নেহ—তিনি শিবনাথকে সুখী দেখতে চান—অথচ গৌরীকে প্রাপ্য অধিকার দিতে তাঁর অস্বীকৃতি। আসলে তাঁর সকল দাপটের মধ্যেও একটি নিঃস্ব রমণী লুকিয়ে আছে। শিবনাথ তাঁর গর্ভজাত পুত্র নয়—সামান্য আঘাতেই এ সত্য তাঁর মনে পড়ে। বধূর কাছে যখন তিনি শোনেন শিবনাথ মায়ের নামে, বধূকে নিয়ে কবিতা লিখেছে, বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে যান—এ ঈর্ষার অধিক—এ যেন সর্বস্ব হারানোর বেদনা। তিনি কি সত্যই শিবনাথের কেউ নন, শিবনাথ কি তাকে মায়ের মত, বধূর মত ভালবাসে না ? দুঃখে তাঁর জগৎ ভরে যায়—কতদিন পরে আবার তাঁর মূর্চ্ছা রোগ আক্রমণ করে। এ-রকম আঘাত আসে, আঘাত ভুলে শিবনাথের সংসার তিনি আগলান। কিন্তু শিবনাথের মায়ের মৃত্যুর পর গৌরী ঘর করতে এলে তিনি যথার্থই অনুভব করেন বয়ঃপ্রাপ্ত

শিবনাথের পরিবর্তন হবে, পিসিমার আঁচল ছেড়ে সে এবার বধূর আলিঙ্গনে ধরা দেবে। সেজন্যই তাঁর আকস্মিক কাশীবাসের সংকল্প। মাতৃহীন শিবনাথকে ছেড়ে যেতে যদি বা অন্তরে কষ্ট অনুভব করেন—কিন্তু জেদ ও অভিমানই বড় হয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথ ও গৌরীর প্রথম মিলনরাত্রিটি অবসান হবার আগেই তিনি কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। দীর্ঘ আড়াই বৎসর নির্বাসনে কাটে, শিবনাথের পুত্রের জন্ম হয়, শিবনাথ বাড়ি ছেড়ে কোন চরে দেশের কাজ করে বেড়ায়—কিছুই তাঁকে বিচলিত করে না। তিনি ঈশ্বরেই সব সমর্পণ করেছেন। তবু মমতা যায় না—আবার ফিরে আসেনও। শিবনাথ দেশের কাজে জেলে গেলে তাকে বন্ড দিয়ে নত হয়ে ফিরে আসতে বলেন না সেই পূর্ব তেজেই, কিন্তু এবার শিবনাথের অনুতপ্তা, লজ্জিতা স্ত্রীকে আপনার বক্ষে মায়ের মতই আশ্রয় দেন, শিবনাথের অনুপস্থিতিতে তার শিশুপুত্রকে 'শিবনাথের মত' করেই মানুষ করার দেন প্রতিশ্রুতি। তাঁর আরাধ্য দেবতা আর শিবনাথ এক হয়ে যায়। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব—মর্যাদাবোধ, ঈর্ষা-অভিমান-স্নেহ-ক্ষমা শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে অশ্রুসিক্ত মাতৃ—মমতাতেই শেষ পরিণতি লাভ করে।

তারাশঙ্করের উপন্যাস বক্তব্য প্রধান। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসসমূহে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা প্রখর। *ধাত্রী দেবতা*-র পর এই ধারার উপন্যাস *কালিন্দী*। জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতি। রামেশ্বর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। যৌবনে মিথ্যা সন্দেহে স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করার পর অপরাধবোধ থেকে তাঁর ধারণা তাঁর দুটি হাতেই কুষ্ঠ হয়েছে। দিনের আলো তাই তিনি পছন্দ করেন না—ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে একা থাকাতেই তাঁর আগ্রহ। কিন্তু তাঁর রয়েছে গভীর কাব্যাসক্তি, সংস্কৃত-সাহিত্যে অগাধ অধিকার। সুনীতি নম্র ও কোমল স্বভাবা, স্ত্রী হিসাবে একেবারেই মৃদু, কারণ দুটি সন্তানের জন্মদান করা ছাড়া স্বামীর সাথে তার হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। সেজন্য সুনীতি একটু কুণ্ঠিতও, গৃহিণীপনায় বাকপটু অথবা প্রখর নয়। সুনীতি তারাশঙ্করের একটি সুন্দর ও গভীর বেদনাতুর চরিত্র। স্ত্রী ও মাতা দুই হিসাবেই তার ব্যর্থতা ও দুঃখ গভীর। তার দুটি পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র। দুটি পুত্রই কারাদণ্ড ভোগ করে, প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধে একজনকে গুলি করে মারার জন্য, আর কনিষ্ঠ অহীন্দ্র রাজনীতি করার অপরাধে। অপ্রকৃতিস্থ স্বামী, দুটি পুত্র 'সোনার মহীন, সোনার অহীন' জেলে ; সুনীতির দুঃখের পাত্র কানায়-কানায় পূর্ণ। তার উপর অহীন্দ্র সদ্য বিবাহিত। মাতৃচরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী-হীনা অথবা পরিণতবয়স্কা। সুনীতি রামেশ্বরের দ্বিতীয় স্ত্রী, তাদের বয়সের ব্যবধান অনেক। স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা একাকিনী নারী সে। জ্যেষ্ঠপুত্রের দীর্ঘমেয়াদী জেল হওয়ার বেদনা স্বামীর সাথে ভাগ করে নিয়ে হৃদয়ভার লাঘব করতে পারে নি। অসীম ধৈর্যে সে সকল যাতনা নিজের মধ্যেই রাখে, সংসারের দায়দায়িত্ব সাধ্যমত নীরবেই মেটায়। মাতা হিসেবে তার প্রাপ্তিও খুব বেশি নয়—মহীন্দ্র মাকে জমিদার-গৃহিণী হিসেবে অনুপযুক্ত মনে করে,

আর অহীন্দ্র উদাসীন। সুতরাং বেদনা আর বিষাদই তার সঙ্গী। সুনীতির বয়স বেশি নয়, স্বামীসঙ্গকামনা খুবই স্বাভাবিক, হয়ত স্বামীরই নির্দেশে সন্ধ্যায় প্রসাধিতা হয়ে কাব্য পাঠ শোনার জন্য স্বামীর কাছে যায়—রামেশ্বর সে প্রত্যাশা পূরণ করেন না—তিনি আবার আত্মমগ্ন। স্বামীসম্ভাষণ হয় না—কাব্যপাঠতো দূরের কথা—ব্যর্থ সুনীতি আবার নিজ নির্জনতায় ফিরে আসে। সুনীতির প্রত্যাশাপূর্ণ সন্ধ্যার বিফলতা পাঠকমনে বিষণ্ণতার ছায়া ছড়ায়। উপন্যাসের মূল বক্তব্যের বাইরে থেকেও সুনীতি *কালিন্দী* উপন্যাসের একটি ব্যথাদীর্ণ চরিত্র।

গণদেবতা - পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী পদ্মকে শুধুই মাতৃচরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না, তবু 'পঞ্চগ্রামে' তারাশঙ্কর তাকে মাতৃমূর্তিতেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, সেই কারণে এই পর্যায়ে পদ্ম চরিত্র আলোচিত হতে পারে। 'গণদেবতার' অনিরুদ্ধ কামার সমাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহের আগুনে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য, দাম্পত্য সুখ-শান্তি, শেষ পর্যন্ত আত্মমর্যাদাজ্ঞান পর্যন্ত আহুতি দিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। তার স্ত্রী পদ্ম কৌতূহল-উদ্দীপক চরিত্র। শ্যামল দীর্ঘাঙ্গী সুগঠিত দেহের অধিকারিণী মেয়েটি মনের দিক থেকেও শক্তিময়ী। অনিরুদ্ধ শক্তিমান পুরুষ, পদ্ম তার যোগ্য স্ত্রী। অনিরুদ্ধ পদ্ম পরস্পরের প্রতি আসক্ত দম্পতি। সন্তানহীন তাদের দাম্পত্য জীবন। যতদিন অনিরুদ্ধ-স্বাভাবিক কাজ কর্ম করেছে, তাদের সংসার ঠিক ছন্দে চলেছে। সন্তানহীনতার দুঃখ পদ্মর ছিল, প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রেমে সে আশা হারায় নি। কিন্তু অনিরুদ্ধের ক্রমাগত অবিবেচনা, আপন কর্মে অমনোযোগ, মদের নেশা, দুর্গা মুচিনীর প্রতি আগ্রহ—পদ্মের সংসারের ভিত্তি নাড়িয়ে দিল—দেহ মনে নানা জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তার মধ্যে একটা কর্মশক্তির অভাব, উদাসীনতা ও অসাড়তার সৃষ্টি হলো। ফলে দেহে ভাঙ্গন, মূর্ছা রোগের আরম্ভ। এর মধ্যেও নিরুদ্ধ সন্তানকামনা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। নিরন্ন গৃহে পদ্মের পেটের অন্ন চাই, কিন্তু একার জন্য নয়—অন্ন সে তার স্বামীকে, সন্তানকেও পরিবেশন করতে চায়। মাতৃত্ব ও গৃহিণীত্ব দুই-ই তার কাম্য। এর মধ্যে সন্তানক্ষুধাটা প্রায় বিকার হয়ে দেখা দেয়। এমন সময়ে ডেটিনিউ যতীন পদ্মের জীবনে আসে খেলাঘরের পুত্রের মত। পদ্মর দুরবস্থাতে দুর্গা অনিরুদ্ধের ঘরে যতীনের থাকার বন্দোবস্ত করে দেয় মাসিক অর্থের বিনিময়ে। পদ্মের অর্থাভাব কিছুটা ঘোচে, যতীনও সহজ বুদ্ধিবলে পদ্মকে 'মামনি' ডেকে সম্পর্ক সহজ করে নেয়—গ্রামের লোকের কিছু বলার থাকে না। তরুণ যতীনের মাতৃসম্বোধনে পদ্ম আনন্দ পায়, কিন্তু এই ছেলেখেলা তার পুত্রক্ষুধাকে প্রশমিত করে না। যতীনের সভ্য, সতর্ক 'মামনি' ডাকের বদলে শুধুই প্রাণ-জুড়ানো 'মা' ডাকের জন্য সে ব্যাকুল হয়। গাঁয়ের পথের ছেলে উচ্চিংড়েকে সে আশ্রয় দেয়, উচ্চিংড়ের মা হবে, দুরন্ত বালকের স্নেহ-অত্যাচারে তার মাতৃস্নেহ উথলে উঠবে এই তার বাসনা। এরপর অনিরুদ্ধ জেলে যায়, কলেরায়

দেবুর স্ত্রী-পুত্র মারা যায়, যতীনেরও বদলির আদেশ আসে। পদ্মের দুঃখের বোঝা বাড়ে আবারও।

দেবু অনিরুদ্ধর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কে পদ্মকে 'মিতেনী' বলে ডাকে। অনিরুদ্ধ জেলে যাওয়ার পরে স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধুর অসহায়া স্ত্রীকে সাহায্য করতে চায়, আসা যাওয়া চলে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পদ্মকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে খেয়েছেও ক'দিন, কারণ পদ্মকে সাহায্য করা কঠিন। এক উগ্র আত্মসম্মান বোধ পদ্মের মধ্যে আছে। দেবু গ্রামের বিশিষ্ট জন, সকলে দেবুকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে—পদ্মও তার ব্যতিক্রম নয়। দেবুর স্ত্রী বিলুর সাথে তার প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এখন দেবু স্ত্রীপুত্র হীন, একা। অনিরুদ্ধ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গ্রামে ফিরে আসে নি। সুতরাং পদ্মও একা। দেবুকে ঘিরে পদ্মর মনে আবার এক স্বপ্ন জাগে, অভিমান হয় যদি ভালবাসাই না থাকে তবে দেবুর সাহায্য সে নেবে কেন ? মনে সে কল্পনা করে হয়ত কোন রাত্রে দেবু তার কাছে আসবে— অসম্ভব এক ভালবাসার কামনা তাকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তিতেই এক বর্ষা রাত্রিতে সে নিজেই দেবুর কাছে যায়—অকপটে নিজ আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়। এই সাহস পদ্মতেই সম্ভব—সঙ্কোচলেশহীনভাবে সে দেবুকে বলে 'আমি এসেছি মিতে। ও ঘরে আর থাকতে পারলাম না। তোমার ঘরে থাকব আমি। দু'জনায় নতুন ঘর বাঁধব। তোমার খোকন আবার ফিরে আসবে আমার কোলে। যে যা বলে বলুক। না-হয় আমরা চলে যাব দুজনায় দেশান্তরে।' সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার আকুল আকাঙ্ক্ষা পদ্মর! কিন্তু দেবু আত্মসংবরণ করে, সহজভাবে বলে 'চেপে জল আসছে, বাড়ী যাও কামার বউ।' দেবুর এই নিরুত্তাপ প্রত্যাখ্যানে পদ্ম প্রবল আক্রোশে, অভিমানে সেই রাত্রিতেই শ্রীহরির ঘরে গিয়ে ওঠে। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়ে, শ্রীহরির দীর্ঘদিনের লালসার বলি হবার আগেই সকলের অজান্তে শ্রীহরির গৃহ ত্যাগ করে। এর পর পদ্মকে গ্রামের লোক ভুলেই যায়। কয়েক বৎসর পরে আকস্মিক ভাবেই স্টেশনে পদ্মর সাথে দেবুর সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু 'সেই পদ্ম? চোখে জ্বল জ্বল অসুস্থ দৃষ্টি, শঙ্কিত, সন্তর্পিত অপরাধীর মত পদক্ষেপ, জীর্ণ কাপড়, শীর্ণদেহ, কণ্ঠস্বরে উষ্মা, তিক্ততা, কথায় উগ্রতা—সেই কামার বউ ? দেবু দেখিল একটি দীর্ঘ শ্যামবর্ণ মেয়ে জুতা পায়ে, আধুনিক রুচিসম্মতভাবে ধবধবে পরিষ্কার একখানি মিলের শাড়ী পরিয়া তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পাশেই তাহার আঙ্গুল ধরিয়া আড়াই তিন বছরের একটি ছোট ছেলে।' দেবুর চোখ জলে ভরে যায়। পদ্ম একজন দেশী ক্রীশ্চানকে, যোসেফ নগেন্দ্র রায়, খুবই সাধারণ নিরীহ মানুষ, বিবাহ করে ধর্মান্তরিত হয়েছে—অথবা পদ্মের কি ধর্ম পদ্মই জানে, বহু আকাঙ্ক্ষিত সফলতা এসেছে তার জীবনে। সে ঘর পেয়েছে, মা হয়েছে। তার লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই—সেই আগের পদ্ম, অনিরুদ্ধ বেঁচে আছে জেনেও কোন বিকার নেই তার মধ্যে। সে গর্বভরে বলে—'আমি এই সব চেয়ে সুখে আছি পণ্ডিত। আমার খোকন—-আমার ঘর—অনেক দুঃখে আমি গড়ে তুলেছি। পরকাল ? বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, পরকাল

আমার মাথায় থাক। একালেই আমি স্বর্গ পেয়েছি।' সুখী, সার্থক পদ্ম। বিচিত্রও। ছেলের নাম ডেভিড দেবনাথ রায়। দেবনাথকে তাহলে পদ্ম ভোলে নি, বিষাদের একটু স্মৃতি কি জড়িয়ে আছে এই সুখী মাতৃত্বের চরিতার্থতায়ও ? কে জানে।

ফরিয়াদ তারাশঙ্করের শেষের দিকের রচনা। তারাশঙ্করের এই পর্যায়ের উপন্যাস চিত্রায়িত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। উপন্যাসে জটিল নাটকীয়তা ও ঘটনাগত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি সিনেমা তৈরির পটভূমিকা তৈরি করে—*ফরিয়াদ* অনেকটা এই ধরনের উপন্যাস। উপন্যাস মূল্য যাই হোক, এক পতিতা নারীর বেদনামথিত মাতৃত্বের ইতিহাস এই উপন্যাসে আছে। এ্যাডভোকেট সুধাংশু বসু একজন রাজনৈতিক, মানবচেতনা সম্পন্ন মানুষ। এক সংকটের রাত্রিতে দেহব্যবসায়িনী চাঁপা তাঁকে কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সেই অল্পসময়েই আপন শিশু সন্তানের প্রতি চাঁপার নির্মম হৃদয়হীন আচরণ, অবোধ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর ঘৃণা তাঁকে বিস্মিত করেছিল। আশ্রয় ত্যাগ করে এলেও সুধাংশুবাবু চাঁপাকে ভুলতে পারেন নি। এর পরেও তিনি চাঁপাকে দেখেছেন—শিশুটি বড় হয়েছে, কিন্তু সন্তানের প্রতি চাঁপার ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হয়নি। তেমনি নিষ্ঠুর, স্নেহহীন সে, এমনকি পুত্রের প্রতি বিদ্বিষ্টও যেন। 'বড় হয়ে সেই সন্তান মাতৃদ্রোহী হয়েছিল, মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ঘৃণার বদলে ঘৃণা, বিদ্বেষের বদলে বিদ্বেষ।' আর হয়ে উঠেছিল দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত ও খুনী। এই খুনের মামলার সূত্রেই সুধাংশু বাবু জেনেছিলেন চাঁপার সন্তানের প্রতি বিদ্বেষের করুণ কাহিনী। চাঁপা একটি দুঃখিনী নারী। ভদ্র পরিবারেই তার জন্ম, অভাবে পড়ে তার বাবা তাকে যৌবনারম্ভেই এক ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল। পিতা কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা করে নি, বিবাহের পরে স্বামীও স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করে নি। এমনই ভাগ্য তার। স্বামীও বিপাকে পড়ে দুই হাজার টাকায় তাকে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করে। চাঁপার গর্ভে তখন এই সন্তান। স্বামীর অসময়ে মৃত্যু হলো, সমস্ত অপমানের শোধ নিতে চাইল চাঁপা তার শিশু পুত্রের উপর, যার মুখে পিতৃমুখের প্রতিচ্ছায়া। শিশুটি যে নিরপরাধ, আগুনে পুড়তে পুড়তে চাঁপা সে কথা ভুলল, মাতৃস্নেহ তার জাগলো না। সে দেহব্যবসায়িনী হয়ে চুক্তি মত সপ্তাহে একদিন সেই লোকটির লালসার ক্ষুধা মেটাতে যেতে লাগল। সে যে বিক্রীতা। তার পুত্র নীলু এতদিন নিজেকে পিতৃপরিচয়হীন ভেবে এসেছে—হঠাৎ একদিন ছবিতে মায়ের স্বামীর মুখের সাথে তার মুখের মিল দেখে মায়ের কাছে সব জানতে চাইল। চাঁপা তাকে সব খুলে বললে মাতার অপমানে উন্মাদ হয়ে সেই মাতৃদ্রোহী দুশ্চরিত্র মাস্তান ছেলে সত্য সত্যই সেই লোকটিকে খুন করলো। ধরা পড়ার আগে চাঁপাকে শুধু বললো 'যা এবার তোকে খালাস করে দিলাম।' পিতৃকৃত অপরাধের সকল দায় সে নিজের কাঁধে নিয়ে মাকে মুক্তি দিল জীবনব্যাপী অপমান থেকে। চাঁপা এবার মুক্ত। কিন্তু পুত্রের জীবনের মূল্যে। সুধাংশু বাবুর কাছে এসেছে সে পুত্রকে বাঁচাবার জন্য। এতকাল পরে সে চাঁপার ছেলে হয়েছে, তার অবরুদ্ধ মাতৃস্নেহ এতদিনে মুক্তি পেল। তার সীমাহীন নিষ্ঠুরতাকে

এবার সে বুঝতে পারলো, কিন্তু প্রতিকারের তো সময় নেই আর। পুত্রের ঋণ—অপরিশোধ্যই থেকে গেল। ঘৃণ্য জীবিকার অন্তরালে এই অসহায় নারীর সম্মানবোধ ও মাতৃত্ব তারাশঙ্কর করুণা ও বিষাদে বর্ণনা করেছেন।

তারাশঙ্কর জীবনকেই দেখেছেন প্রধানত। জীবন থেকেই মাতৃচরিত্রগুলি তুলে ধরেছেন, তারা যেমন, তেমন করেই। বিষাদবৃন্তেই মাতৃত্বের নীল পুষ্প ফুটেছে, তাকে তারাশঙ্কর আদর্শের রঙে রাঙাতে চেষ্টা করেন নি। উল্লেখের বাইরে কত বিচিত্র মাতৃচরিত্র আছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। *সন্দীপন পাঠশালা*-য় ধীরানন্দর মায়ের এত গুণ, এত ধৈর্য ও উদারতার পরেও কেন সামান্য জাতের পার্থক্যের জন্য ধীরানন্দের ভালবেসে বিবাহ করা স্ত্রীকে ঘরে নিতে পারেন না ? সন্তান স্নেহ কি তাঁর কম? পুত্রের সুখেই মায়ের সুখ—এ ক্ষেত্রে কেন তা হয় না ? *মন্বন্তর* উপন্যাসের কানাই-এর মাকে স্মরণ হয়। ছাত্র পড়িয়ে কানাই যখন অতিরিক্ত এক শত টাকা পায়—তিনি নিষ্ঠুর অবিবেচনায় কানাই-এর কাছ থেকে হিসাব করে টাকটা নেন। তাঁর কাছে সংসারের প্রয়োজন বড়, সেজন্য সবকটা টাকা নিতে তাঁর সঙ্কোচ হয় না। অথচ রাত্রে ফিরে কানাই দেখে তার বাবার জন্য মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে, একটা মদের বোতল এসেছে পর্যন্ত। এ আয়োজন শুধু তাঁর স্বামীর জন্য, অথচ কানাই-এর ছোট ছোট ভাই-বোন রয়েছে। এই স্বার্থপরতার ব্যাখ্যা কী ? মা সন্তানকে বঞ্চিত করে স্বামীকে ভাল খাওয়াচ্ছেন সন্তানেরই অর্জিত অর্থে—এর একটাই ব্যাখ্যা—জীবন নির্মম, নিষ্ঠুর। অথচ কানাই গৃহত্যাগ করলে তার মা শোকে শয্যা নিয়েছেন এ খবর জানা যায়। এই শোকও হয়ত অকৃত্রিম। দুই অস্তিত্বেই তিনি বাস্তব—স্ত্রী ও মা।

মাতৃসত্তার বাইরে তারাশঙ্করের ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়। তাদের বৈচিত্র্য, চাওয়া-পাওয়ার স্বতন্ত্রতা যে-কোন ঔপন্যাসিকের গর্ব হতে পারে। চরিত্রসৃষ্টিতে বহু-বিচিত্রের স্বাদ, কাহিনী নির্বাচনে, বয়নে অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি, কল্পনার এত সম্পদ সমকালীন লেখকদের মধ্যে, অথবা পরেও বেশি পাওয়া যায় না। উপন্যাসে তাই বিচিত্র পুরুষ চরিত্রের সাথে বিচিত্র নারী চরিত্র এসেছে। জীবনকে দর্শন করে জীবনের আকুতি, প্রত্যাশা, বেদনা তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলির মত নারী চরিত্রেও সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র দামিনী চরিত্রটির কথা ধরা যাক। দরিদ্র কৃষক গোষ্ঠর স্ত্রী সে। একটি সন্তানের মা, স্বামীকে ভালবাসে, সে সুখী। কিন্তু অভাব আঘাত হানল, সন্তানটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। সন্তান হারানোর দুঃখ, অভাব অনটনই দামিনীর জীবনের একমাত্র সমস্যা নয়, তার বধূজীবনের আরম্ভ থেকেই প্রতিবেশী বৈষ্ণব সুবল তার অনুরক্ত। সুবলের দামিনীর প্রতি আকর্ষণ সেই বালক বয়স থেকেই। বালিকা-বধূ দামিনী সুবলকে খেলার সাথী হিসাবেই দেখেছিল, যৌবনে স্বামীই তার ভালবাসার পাত্র। কিন্তু সুবলের পরিবর্তন হয় না। দামিনীকে সে ভালবাসে, গোষ্ঠর

সাথে বন্ধুত্বের সূত্রে দামিনীর বাড়িতে তার অবাধ আসা-যাওয়া। সুবল ভিক্ষা করেও অবস্থাপন্ন, দামিনীকে সে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু বিনিময়ে দামিনীকেও চায়। অভাবের সংসারে দামিনী প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছে এই লোভকে দমন করার জন্য। গোষ্ঠ সুবলকে সন্দেহ করে না—সুতরাং বন্ধুর অর্থ সাহায্য গ্রহণে তেমন গ্লানিও তার নেই। কিন্তু সুবল দামিনীকে রেহাই দেয় না—এক রাত্রিতে সে দামিনীর দেহ উপভোগ করে, দামিনীর ঘৃণাকে উপেক্ষা করেও। এই অপমানে দামিনী পোড়ে, কিন্তু সাহস করে স্বামীকে জানাতে পারে না। এর পরই ঋণগ্রস্ত গোষ্ঠ এক ঝড়ের রাত্রিতে জমিদারের চাপরাশীকে খুন করে স্ত্রীসহ পালায়। মোহান্ধ সুবল তাদের অনুসরণ করে। দামিনী এবার সুবলের প্রতি রুষ্ট, সুবলের পূর্বকৃত সকল উপকার, সে মনে করে তার দেহ মূল্যে শোধ করে দিয়েছে। একটি আধা-শহরে গোষ্ঠ কলের শ্রমিকের চাকুরি নেয়—অবস্থা ফেরে না, অভাব, অনাহার তাদের সঙ্গী। দামিনী গ্রামত্যাগ করেও দেখলো এখানেও লুব্ধ চক্ষুর অভাব নেই, তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে হাত বাড়ায় তার দিকে। সুবল তো আছেই। অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, গোষ্ঠর নেশার অত্যাচার—দামিনী ক্রমশই দিশেহারা হয়ে পড়ে। দেহের মূল্যে তাকে সাহায্য করার জন্য সুবল বা অন্য কেউ প্রস্তুত, কিন্তু সরলা পল্লীবধূর অন্তঃকরণ তাতে শিহরিত হয়। অথচ দারিদ্র্যক্লিষ্ট যে সমাজে সে আছে, সেখানে অভাবে দেহ বিক্রয় নতুন নয়। খেঁদী, এমন একজন প্রকাশ্যেই বলে—'সগ্গে আমার কাজ নাই ভাই, সেথায় নাহয় তোরাই যাবি ; হেথায় তো খেয়ে পড়ে বাঁচি'। অন্য একজন যার স্বামী আছে, হাঁপানী রুগী, সেও দেহ বিক্রী করে—সে বলে—'সতীগিরি ফলাতে গেলে স্বামীকে শুকিয়ে মারতে হবে, তা এতে যদি ও বাঁচে, আমিও বাঁচি সেই আমার ভাল।' এই দুই রমণী লোভে নয়, বাঁচার প্রায়োজনেই এই পথ বেছে নিয়েছে। আর সুবলতো দামিনীকে একরকম ভালবাসে, দামিনীর জন্য সর্বস্ব দিতে পারে—কিন্তু এই পথ দামিনীর নয়। সে স্বামীকে ভালবাসে, 'দুঃখী-স্বামীর ম্লান মুখখানি' সর্বদা তার অন্তরে। দামিনী তাই লুব্ধ হাতগুলি সরিয়ে দেয়, অভাবের সাথে যুদ্ধ করে, অনাহারে দিন কাটায়। আশায় বুক বেঁধে স্বামীকে বলে—'ওগো পরতে কাপড়, আর খেতে ভাত তুমি আমায় দিওগো।' এ বিশ্ব সংসারে এর চাইতে কম চাওয়া আর কী থাকতে পারে, অথচ এটুকুর অভাবেই দামিনীর অপমান অসম্মান। ভবিষ্যতের তারাশঙ্করের আগমন ঘোষণা করে এই অশ্রুমুখী অপমানিতা নারী চরিত্রটিও, কলমজুরদের বিদ্রোহ নয় শুধু।

ধাত্রী দেবতা উপন্যাসে শিবনাথের স্ত্রী গৌরীও উল্লেখের দাবি রাখে। পিতৃ-মাতৃহীন গৌরী দিদিমার তত্ত্বাবধানে মামার সংসারে মানুষ। সংসারে কন্যাকে মা যে শিক্ষা দেন, দিদিমা সেই শিক্ষা তাকে দিতে পারেন নি। বাল্যবিবাহ তার, শিবনাথের পিসিমা ও নিজের দিদিমার উগ্র মর্যাদার সংঘর্ষের ফলে শ্বশুরগৃহের প্রতি ভীতি ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার সেই বালিকা বয়সেই হয়। স্বামীর সাথে দীর্ঘকাল বিচ্ছেদে কাটে, ডোমের মেয়ের সাথে

শিবনাথের সম্পর্কের মিথ্যা রটনায় স্বামীকে কঠিন চিঠি লেখে অভিভাবকদের প্ররোচনায়, যার ফলে শিবনাথ স্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হয়। শিবনাথের মায়ের মৃত্যুর পরে যখন সে শিবনাথের ঘরে আসে তার বয়স পনের ষোল, কিন্তু দাম্ভিকতা, ধনগর্ব, অহঙ্কার শিবনাথের সাথে তার প্রকৃত মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পিসিমা গৃহত্যাগ করলে স্ব-অধিকারে স্বামীগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভালবাসা, মমতায়, ঔদার্যে সে শিবনাথের যথার্থ জীবনসঙ্গিনী, সুখ-দুঃখের সাথী হতে পারল না। বয়সও হয়ত অন্তরায় ছিল। সন্তান-সম্ভাবিতা হওয়ার পরে তীব্র অভিমানে আবার তাদের বিচ্ছেদ হয়। সে দিদিমার কাছে ফিরে যায়। একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। কিন্তু শিবনাথ তখন গৃহত্যাগ করে তার আদর্শমত জীবনযাপন করছে। গৌরী আড়াই বৎসর শিবনাথের দেখা পায় না। এবার সন্তানের জননী হয়ে গৌরী আপনার অবস্থা বুঝতে পারে, সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব সজাগ হয়, শিবনাথকে সে অহরহ স্মরণ করে। আইন অমান্য করার কালে যখন দলে দলে কিশোর যুবক জেলে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে, তখন অনেক চোখের জলে গৌরী শিবনাথকে বুঝতে পারে, নিজের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়। শিবনাথ জেল গেটে পরিবর্তিত গৌরীকে দেখে, পরিবর্তনকে বুঝতে পারে। কত বেদনা, কত মর্মযাতনার পরে শিবনাথ-গৌরীর এই চোখে চোখে মিলন!

গণদেবতা–পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্র প্রধান—পদ্ম, বিলু ও দুর্গা মুচিনী। পদ্মর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিলু দেবনাথের স্ত্রী। তাদের চার বৎসরের একটি পুত্রও আছে। দেবনাথ ঘোষের গৃহটি আনন্দ ও শান্তিনিকেতন। 'দেবুর জীবনে এই এক পরম সম্পদ। ঘরে তাহার কোন দ্বন্দ্ব নাই, অশান্তি নাই।' 'বিলু বড় ভাল মেয়ে, সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপর দেবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে।' বিলু জটিলতাহীন, সুখী আনন্দময়ী চরিত্র। স্বামী, সন্তান, সংসারই তার সুখ-স্বর্গভূমি। সে আপনার সুখে স্বার্থপর নয়, গ্রামের সকল মেয়ের সাথে তার প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক। সে যে দেবু পণ্ডিতের স্ত্রী, পাঁচ খানা গ্রামের লোক যাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে আপনার ব্যবহারে সেই মর্যাদা যেন লজ্জিত না হয় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি আছে। দেবু দেড় বৎসরের জন্য জেলে গেলে, শুধু দেবুর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই নয়, বিলুর ব্যবহারেও সমস্ত গ্রাম তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ভাগ্যতাড়িতা পদ্ম, স্বৈরিণী দুর্গা, অসহায়া বৃদ্ধা রাঙাদিদি সকলের প্রতিই বিলুর সস্নেহ ব্যবহার। তার গৃহের রাখাল ছেলেটিও বিলুর স্নেহধন্য। ধর্মে মতি, স্বভাবে উদারতা, স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাকে মর্যাদা দান করেছে। বিলু ও খোকনের অকালমৃত্যু শুধু দেবুকে নয়—সমগ্র গ্রামকে শোকার্ত করেছে। এই মৃত্যুশোক বজ্রাঘাত তুল্য, তেমনই আকস্মিক। পরিপূর্ণ সংসার থেকে বিলুর বিদায় পাঠকচিত্তকেও বিষণ্ণ করে তোলে। আদর্শবাদী উচ্চ চরিত্রের নিঃসঙ্গতা, স্ত্রীর সাথে মানসিক যোগাযোগের অভাব বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়। *চরিত্রহীন* উপন্যাসের উপেন্দ্র, *বিপ্রদাসে*-র বিপ্রদাস

তাদের বৃহত্তর চিন্তা ও কর্মের অংশীদার করতে পারেনি তাদের স্ত্রীদের। দাম্পত্য সম্পর্কে তাদের ফাঁক ছিল—সেজন্য অকালে উভয়েরই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরে যেন ভালবাসা প্রকাশের জন্যই দৃঢ়স্বাস্থ্য উপেন্দ্র ক্ষয় রোগে মারা যায়, আর বিপ্রদাস সংসার, সন্তান ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, কিন্তু বিলু ও দেবনাথের দাম্পত্যে ফাঁক অথবা ফাঁকি ছিল না—স্ত্রী ও সন্তানকে সে অনন্যচিত্তেই ভালবাসত। তাদের অভাব কিছুই পূর্ণ করতে পারে নি। স্বামীর দেশপ্রেম ও সমাজকল্যাণ চিন্তায় তার অংশগ্রহণ ছিল না বলে বিলুর কোন অভাববোধ অথবা হীনমন্যতা ছিল না, আপন সংসারে তার আসন পাকা ছিল। 'পঞ্চগ্রাম' অংশে দেখি দেবু কিশোরী বিধবা স্বর্ণকে প্রায় নিজের হাতে তৈরি করেছে। এবং দ্বিধামুক্ত হয়েই আপন শূন্য গৃহে তাকে আহ্বান জানায়। তারাশঙ্করের অসাধারণ জীবনমুখিতা দেবু-স্বর্ণের ভালবাসার কারণ, স্বাভাবিক জীবনেই দেবুকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন তিনি, সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীকে দিয়ে সমাজের প্রত্যক্ষ উপকার হতে পারে না—এই জীবনপ্রাণিত উপসংহার 'পঞ্চগ্রাম' অংশের। কিন্তু বিলু ও খোকনের মৃত্যু শুধু দেবনাথের জীবনেই নয়, 'গণদেবতা' অংশেও রিক্ত, বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

স্বৈরিণী দুর্গা তারাশঙ্করের *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র। বিলুকে শুধু 'গণদেবতাতে' পাওয়া যায়, দুর্গা উপন্যাসের উভয় অংশেই উপস্থিত। দুর্গা বাস্তব চরিত্র। নিম্ন মুচি ঘরে তার জন্ম, তার মায়ের চরিত্রেও দোষ ছিল, কে জানে কোন জন্ম-সূত্রে গৌরবর্ণ ও দেহ-সৌন্দর্য সে পেয়েছিল। বিয়ের পরে শাশুড়ির অর্থলোভে প্রথম তার দেহ ভোগ করে শাশুড়ির মালিক। তারপর সে চলে আসে মায়ের কাছে, তার মা তার দেহ-সৌন্দর্যকে মূলধন করে তাকে পুরোপুরি দেহ ব্যবসায়ে নামায়। অথচ দুর্গা সমাজেই থাকে, গ্রামাধিপতি শ্রীহরি তার প্রতি অনুকূল, শ্রীহরির প্রয়োজনে থানার দারোগা পুলিশ বা অন্যান্যরাও দুর্গার সুন্দর দেহ ভোগ করে। একথা সবাই জানে। সবচেয়ে বড় কথা সেজন্য দুর্গাও কুণ্ঠিত নয়। প্রাপ্ত অর্থে সে কোঠাবাড়ি করে, গহনা গড়ায়, আপন মাকে অন্নের বিনিময়ে তার ঘরকন্নার কাজে নিয়োজিত করে। দুর্গা প্রখর, স্পষ্টভাষিণী ও বুদ্ধিমতী। স্বৈরিণী নারীর এত শক্তিতে বিস্মিত হতে হয়। প্রথম পর্যায়ে দুর্গা আত্মসর্বস্বা, সে ভাল থাকে, ভাল খায়, গহনা পরে এমন কি স্বৈরিণী জীবনকে উপভোগও করে। কেন নয় ? তার মা চরিত্রহীনা, তার দাদার স্ত্রী অন্যের সন্তান গর্ভে ধরে, বাবুরা মদ মেয়ে মানুষ খোঁজে, সমাজ নীরব, তার লজ্জার কিছু নেই। পদ্মর সন্তানের জন্য কাঙালপনা তার কাছে অর্থহীন পাগলামি মনে হয়, ভুলেও সে সন্তান কামনা করে না। কিন্তু দুর্গারও পরিবর্তন হয়—এই কপট, ভণ্ড, স্বার্থপর গ্রামে যতীন আছে, আছে দেবু। যতীন দেবু দেশের কাজ করে—তার যথার্থ স্বরূপ সে জানে না, কিন্তু তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। তাদের রাতের সভায় পুলিশ হামলার কথা বিচিত্র বুদ্ধিতে আগাম জানিয়ে আসে, পুলিশকে বোকা বানায়। শ্রীহরির আনুকূল্যপুষ্ট ছিল সে,

কিন্তু শ্রীহরির কদর্য চরিত্রে, গরীবের প্রতি তার অত্যাচারে সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। লোক সমক্ষে শ্রীহরি, বর্তমানে জমিদার শ্রীহরি ঘোষ সম্পর্কে নির্ভয়ে বলে— 'লোকটি যে এক কালে আমার ভালবাসার নোক ছিল, তখন পাল বলেছি, তুমি বলেছি, মাল খেয়ে তুইও বলেছি। অনেক দিনের অভ্যাস কি ছাড়তে পারি জমাদার বাবু ?'

এই প্রকাশ্য স্বৈরিণীর জীবনেও প্রেম আসে। দেবুর জন্য তার হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার হয়। এই প্রেমে প্রাপ্তির আশা নেই বুদ্ধিমতী দুর্গা ভালভাবেই জানে। কোন গ্রাম সম্পর্কের দাবিতে সে বিলুর বোন হয়, হয় দেবুর শ্যালিকা, ডাকে 'জামাই পণ্ডিত' বলে। দেবু দুর্গাকে পছন্দ করে না—কিন্তু দুর্গার সহজ গ্রাম্য দাবিকে অস্বীকারও করতে পারে না। তা ছাড়া এই পর্যায়ে দুর্গার কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়েছে, তার সহজ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, যথাসাধ্য সাহায্য করে মানুষের বিপদে। দেবুকে সে ভালবাসে ভালবাসে বিলু আর খোকনকেও। বিলু ও খোকনের মৃত্যুতে তার শোক অকৃত্রিম, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কেঁদেছে সর্বহারা দেবুর জন্য। দেবুর শূন্য, শোকার্ত জীবন তার সহ্য হয় না। দেবুর শূন্য ঘরের সে পরিচর্যা করে, দেবুর খাওয়া-দাওয়ার প্রতি খেয়াল রাখে, এইটুকুই তার অধিকার, সীমা অতিক্রম করার কথা স্বপ্নেও সে ভাবে না। এক বিভ্রান্তির রাত্রে ছেলে কোলে বিলু বলে ভুল করে দেবু যখন তাকে জড়িয়ে চুম্বনে চুম্বনে তার মুখ ভরে দিয়েছে, আত্মসংবরণ সেই-ই করেছে প্রথম—'পাগল হয়ে গেলে নাকি জামাই' বলে। এবং নিজের নীচ পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে দেবুকে রান্না করতে যাওয়ার আগে কাপড় ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে। বিস্মিত দেবু কারণ জানতে চাওয়ায় সলজ্জভাবে সে বলেছে 'আমাকে ছুঁলে যে।' এত অকপট, সহজ সে। দেবুকে বন্যার তোড়ে ভাসিয়ে নিলে এক গ্রাম জল সাঁতরে সে ঠিকই পৌঁছে যায় অজ্ঞান দেবুর শিয়রে। ফিরে পাবার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তার, শুধু শুভ কামনায়, ভালবাসায় দেবুকে সে সুস্থ নিরাপদ দেখতে চায়। শীঘ্রই এই বারবিলাসিনী রমণী তপস্বিনী সাজে, পূর্ব ব্যবসা ছাড়ে, অভিসারিকার সাজ চিরতরে খুলে ফেলে। প্রেম লুকোবারও তার চেষ্টা নেই, দীর্ঘ কালের অদর্শনের পর দেবুকে দেখে সকলের সামনেই বলে—'প্রাণটা জুড়োলো পণ্ডিত।' আপনার মনে দেবুর পথেই সে চলার চেষ্টা করে। শেষে, দীর্ঘ কারাবাসের পর দেবু গ্রামে এসে দেখল 'দুর্গার সব গিয়াছে—কিন্তু ডাগর চোখ দুইটি আছে, মুহূর্তে দুর্গার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। ডাক্তার বলিল—দুর্গা আর সে দুর্গা নেই। দান ধ্যান—পাড়ায় অসুখ বিসুখ সেবা—দুর্গা লজ্জিত হইয়া বলিল—থামুন ডাক্তার দাদা।' তপশ্চর্যা নয় স্বৈরিণী রমণীর? দেবু বিলুকে ভালবাসত, এখন স্বর্ণকে বাসে, স্বর্ণকে নিয়ে এবার সে ঘর বাঁধবে, এজন্য দুর্গার দুঃখ ঈর্ষা নেই। তার প্রার্থনা আর একটি জন্মের—'আমি আসব এই মর্তে, তোমার জন্য আসব, তুমি যেন এস। আমার জন্যে একটি জন্মের জন্য এস।' অন্তরেই লুকানো থাকে এই কামনা। কিন্তু এই আকুতিতে, বিষাদ অথচ বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমে দুর্গা তার জীবনের মালিন্যকে

ছাড়িয়ে ওঠে, হয়ত বা দেবুর প্রেমের উপযুক্তই হয়ে ওঠে। কিন্তু এ জীবনে কিছুই হবার নয়, দেবু-স্বর্ণ নতুন ঘর বাঁধবে, তাদের ঘরের বাইরে দাওয়ায় বসেই দুর্গার জীবন চলে যাবে, তার নিজের ঘর হবে না। তার আকুলতাটুকু, অশ্রুটুকু যিনি গ্রহণ করবার তিনিই করবেন হয়ত।

কবি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নায়ক নিতাই গ্রাম্য কবিয়াল হলেও বৃহৎ মানব জগতে তার অধিষ্ঠান। দরিদ্র, নম্র, আত্মসন্তুষ্ট, সাধারণ হয়েও সে অসাধারণ, কারণ সেও একজন স্রষ্টা। মানব-সর্ম্পক ও জগৎ-সৌন্দর্যে বিমোহিত এক কবি সে। কবি নিতাই প্রেমিকও। *কবি* উপন্যাসে দুটি নারী চরিত্র, দুইটি নারীই নিতাই-এর সৃষ্টির প্রেরণা। অসাধারণ শিল্প সংযমে তারাশঙ্কর নিতাই-এর জীবন-দ্বন্দ্ব—তার প্রেম, প্রাপ্তি, ব্যর্থতাকে পরিণতি দান করেছেন, *কবি* উপন্যাস নিতাই চরিত্র সুরভিত। অথচ নিতাই খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙ্গাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র। 'রীতিমত একটা বিস্ময়। Son of a Dom, স্যার, He is a poet।' 'বল কি নেতাই চরণের আমাদের এত গুণ! বাহবা, বাহবা রে নিতাই!'—এই হলো ভদ্রমহলে নিতাই-এর কবিতা রচনার প্রতিক্রিয়া। কবির আসরের প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালও ছেড়ে কথা কয় না, তার বংশের উল্লেখ করে গান রচনা করে 'আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতার সগগে যাবার আশা গো।' পরম বিনয়ে ও ঔদাসীন্যে এই সব বিদ্রূপ, অপমান-বাক্য মেনে নেয়, কলহে যায় না।

এই কবি নিতাই অজান্তেই প্রেমে পড়ে। তার বন্ধু স্টেশন পয়েন্টসম্যান রাজনের শ্যালিকা মেয়েটি, বিবাহিতা। রাজা তাকে ঠাকুরঝি বলে ডাকে, নিতাইও তাকে ঠাকুরঝি বলে। ঠাকুরঝি গ্রাম থেকে এসে দুধ বিক্রয় করে, নিতাই দৈনিক এক পোয়া দুধ নেয় তার থেকে। সম্পর্ক এইটুকু। মেয়েটির বয়স অল্প, পনের ষোল, গায়ের রঙ কালো, কিন্তু তার দীর্ঘ শ্যামল দেহশ্রীতে অপরূপ লাবণ্য। তার কোমল কালো শ্রী, দীঘলভঙ্গি, সলজ্জ সরলতা নিতাই-এর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। মেয়েটির মনেও তার চেনা জগতের বাইরে, নিতাই-এর কবিত্ব শক্তিতে, তার ভদ্র আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধতা আসে। মুগ্ধতা যে ভালবাসাতে পরিণতি লাভ করতে পারে—নিতাই বা ঠাকুরঝি সচেতন ছিল না। নিতাই দুপুরে তার নিত্য প্রতীক্ষা করে, পরনে শাদা শাড়ি, মাথায় ঝকঝক করে মাজা পিতলের ঘটি, দ্রুত সে এগিয়ে আসে রেল লাইন ধরে। তাকে নিতাই-এর মনে হয় স্বর্ণ শীর্ষ বিন্দু চলন্ত কাশ ফুল। নিত্য দেখা হয়—ঠাকুরঝি নিতাই-এর কোমল ব্যবহারে একটি দুটি কথা বলে, বড় জোর নিতাই তাকে একেক দিন একটু চা করে খাওয়ায়। এতেই ভালবাসা হয় কিন্তু অনুক্তই থাকে সে ভালবাসা। ঠাকুরঝি বিবাহিতা, সংসার স্বচ্ছল, তার স্বামী তাকে ভালবাসে। তবে কোন্ অবুঝ ভালবাসা ঠাকুরঝিকে বাস্তব ভুলিয়ে দেয়? ভালবাসার কথা একটিও বিনিময় হয় নি, তবু হৃদয় থেকে হৃদয়ে ভালবাসা ছড়িয়ে যায়। ঠাকুরঝিকে কালো বলে বিদ্রূপ করলে ঠাকুরঝি ব্যথা পায়—সমব্যথী কবি নিতাই গান রচনা করে 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ

পাকিলে কাঁদ কেনে'। পরের চরণ আর মনে আসে না নিতাই-এর, যতক্ষণ না দেখে কালো মেয়ে কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজেছে, মুহূর্তে তৈরি হয় পরবর্তী চরণ— 'কালোকেশে রাঙাকুসুম হেরেছ কি নয়নে?' নিতাই গান গেয়ে পাওয়া মেডেলটি ঠাকুরঝিকেই দেয়—সেটি সে গলায় পরেছে—'হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্ত দিনের বাতাসে অশ্বত্থের কচি পাতার মত।' কিন্তু গলায় এই উপহার তো সে পরে থাকতে পারে না, আঁচলের খুঁটে বেঁধে গোপন রাখে। এই ঠাকুরঝির প্রেম, গোপন প্রেম। নিতাই আর্থিক অনটনে দুধ নেওয়া বন্ধ করে দিতে চাইলে ঠাকুরঝি আকুল হয়, সে পয়সা চায় না—বাপের বাড়ির থেকে পাওয়া গাভীর দুধ দেবে সে নিতাইকে—'লেবে না কবিয়াল?' চোখ দুটি অশ্রু টলমল—

নিতাই বলে—আমাকে বিনি পয়সায় দুধ কেনে দেবে ঠাকুর ঝি ?
ঠাকুরঝি স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—বল কিসের লেগে?
ঠাকুরঝি বলিল—আমার মন।
নিতাই অবাক হইয়া গেল—তোমার মন?
ঠাকুর ঝি বলে—হ্যাঁ। আমার মন।

স্বামী সংসার থাকার পরও ঠাকুরঝির মন নিতাই-এর জন্য। কোন সংশয় নেই। নিতাই বুঝল তার ভালবাসার প্রতিদান সে পেয়েছে। এই নিতান্ত কম কথা বলা মেয়েটি আর কী বলবে? কিন্তু ভালবাসার ভবিষ্যৎ নিতাই খুঁজে পায় না । তাই সে আত্মসংবরণ করে, ঠাকুরঝির সুনাম সংসার সে নষ্ট করতে চায় না, তাকে জীবনে সুখী দেখতে চায়। ঠাকুরঝিকে একাকিনী তার ঘরে বসতে নিষেধ করে। ঠাকুরঝির অভিমান হয়, দূরে থাকে। ঠাকুরঝি নিতাইকে ভুল বোঝেনি, নিতাই-এর মন সে পেয়েছে এটা সে জানে। তাই দূরে সরে গেলেও নিতাই-এর ভালবাসা তাকে ভরে রেখেছিল। কিন্তু যে রাত্রে ঝুমুর দলের বসন ও নিতাইকে নিভৃতে এক ঘরে দেখল—অমনি যেন ভূমিকম্পে তার সব বিশ্বাস ভালবাসা একসঙ্গে গুড়িয়ে গেল। জানালা থেকে সরে গিয়ে সে রাত্রিতে একা তার বাড়ির পথ ধরলো, ফিরে তাকাল না, প্রশ্ন করল না ; সর্বস্ব হারিয়েই যেন সে নিতাই-এর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। নিতাই দেখলো—'হ্যাঁ ওই যে দুধ বরণ সাদা জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথায় কেবল স্বর্ণ বিন্দুটি নাই।' ঠাকুরঝিকে নিতাই-এর এই-ই শেষ দেখা। এবং 'এই বিপুল জ্যোৎস্নাময়তার মধ্যে ঠাকুরঝি হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবই যেন হারাইয়া গেল।' এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ও বেদনা ভারাতুর। দুর্বহ হৃদয়ভার সহ্য না করতে পেরে ঠাকুরঝি পাগল হয়ে গেল ও মৃত্যুবরণ করল। এত দুঃখ পৃথিবীতে!

নিতাই-এর জীবনে দুটি নারী, প্রথমে ঠাকুরঝি, পরে বসন। দুঃখ বেদনা ছাড়া কি জীবন হয় ? স্বামী থেকেও ঠাকুরঝি নিতাইকে ভালবাসল, তার জন্য জীবন দিল। আর

স্বৈরিণী বসন্ত নিতাইকে ভালবেসে, পেয়েও জীবনকে ধরে রাখতে পারল না। কী বৈপরীত্য ঠাকুরঝি ও বসন্তে! ঠাকুরঝি ভীরু লজ্জিতা, ভালবাসাকে বুকের বাইরে আসতে দেয় না, আর ঝুমুর দলের বসন্ত দেহোপজীবিনী, রঙ্গিণী, ভালবাসা তার খেলা। প্রতি রাত্রে সে ভালবাসার খেলা খেলে অর্থের বিনিময়ে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরঝিকে খাঁচার পাখি বলেছেন, যে খাঁচায় মাথা কুটে কুটে মরে গেল। সে তুলনায় বসন্তকে বনের পাখি বলা যায়—কিন্তু সে পাখি তীরবিদ্ধ। সে নিরাশ্রয়, আত্মীয় পরিজন নেই, ঝুমুর দলের ব্যবসায়িনী মাসির ঘরই তার ঘর। যতদিন রূপ যৌবন আছে ততদিনের জন্য। তার গানের বোধ ও গলা আছে, আছে রূপ, নৃত্য কুশলতা। কিন্তু কোন দিক থেকেই সে জীবনের আনুকূল্য পায়নি—দেহও তার কীটদষ্ট, যৌন ও ক্ষয় রোগে সে আক্রান্ত। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও সে সমবয়সিনী ও সমব্যবসায়িনীদের থেকে পৃথক। তার বোধ তীক্ষ্ণ, আত্মসম্মান-বোধ বিচিত্র। প্রথমে তাকে তীক্ষ্ণ, আঘাত করার প্রবৃত্তিতে হিংস্র, বেপরোয়া জীবনভোগে আসক্ত এ-রকম দেখা যায়। নিতাই নিতান্তই আকস্মিক ভাবে তার জীবনে আসে, নিতাই-এর সরলতা, শুদ্ধতা, কবিত্ব তাকে আকর্ষণ করে। বসন বহু পুরুষের সংস্পর্শে এসেও কাউকে ভালবাসেনি, এবার সে নিতাইকে ভালবাসলো। নিতাই হল বসন্তের কোকিল। বসন্তের প্রতি নিতাই-এর মমতা, এ পর্যায়ে ভালবাসা বলা যায় না—তার জীবনের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে প্রথম কোমল জলভরা মেঘের শ্যাম ছায়া বিস্তার করল। বসন্ত প্রখরা থেকে স্নিগ্ধা হলো। নিতাই-এর সাথে নিতান্তই ছেলেখেলার গাঁটছড়া বেঁধে আশ্চর্য প্রাপ্তি এল বসন্তের জীবনে। কিন্ত এ পর্যায়েও তারাশঙ্কর তাকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেন নি। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে, শুধু প্রয়োজনেও নয়, আগ্রহেও সে কখনো-কখনো রাত্রির অতিথিকে বরণ করে নেয়। নিতাই তখন নির্জনে রাত্রি কাটায়, কিন্তু অসহায় বসন্তকে ত্যাগ করার চিন্তা তার মনেও আসে না। হয়ত বসন্ত একদিন গণিকাবৃত্তির পঙ্ক থেকে নিজেকে উদ্ধার করত, কিন্তু নির্মম ভাগ্য সময় দিল না। প্রথমে লুকানো যৌন রোগে বিশীর্ণ হয়ে, পরে যক্ষ্মায় নিতাই-এর কোলে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর আগে ভগবানের নাম করতে বললে বসন্ত সেই চরম সময়েও বলে—'না কি দিয়েছে ভগবান আমাকে ? স্বামী পুত্র সংসার দিয়েছে? না।' মৃত্যুকালেও সেই পুরোনো অভিযোগ, অতৃপ্ত বাসনার দুঃখ অভিমান বসন্তের অন্তর থেকে যায় না। পরে অবশ্য নিরুপায় বিশ্বাসে বলে 'গোবিন্দ, রাধানাথ দয়া কর। আসছে জন্মে দয়া কর।' বসন্ত মরল, ব্যবসায়িনী মাসি তার গায়ের টুকরো সোনাটুকু খুলে নিলে নিরাভরণ বসন্তের দেহখানি নিতাই চিতায় চাপিয়ে দেয়। জীবনে ও মরণে এই পরিপূর্ণ নিঃস্বতাই নিতাই-এর অন্তরে বসন্তের জন্য ভালবাসা জাগায়—আগে করুণা ও মমতাই বড় ছিল। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বসন্তের শেষ স্মৃতি তার পিতলের আংটিটি নিতাই গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পারল না—'বসনের আর কিছু নাই। শুধু এই টুকু! না থাকুক এই টুকু। তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাক।' মৃত্যুর পরেও

বসনের প্রাপ্তি নিতাই-এর এই ভালবাসা। তাই নিজভূমিতে ফিরে এসে নিতাই ঠাকুরঝি ও বসনকে এক হয়ে যেতে দেখে। আসলে ভালবাসাই এক হয়ে যায় হারানোর বেদনায় ও প্রাপ্তির প্রশান্তিতে। কবি নিতাই-এরই জয় হয়। উদ্ধৃত করি কবি নিতাই এর উপলব্ধি—'আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার চোখের জলেরে।'

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসে সমাজ প্রান্তে গোষ্ঠীবদ্ধ কাহার জীবনের কথা বলা হয়েছে। তারাশঙ্করের এটিই বোধ হয় সর্বাধিক পুরুষ প্রধান রচনা—এই উপন্যাসে একক কোন নারী চরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠে নি। কাহার সর্দার বনোয়ারীর জীবনে তিনটি নারী এসেছে—প্রেমিকা কালো বৌ, গোপালীবালা তার স্ত্রী, সুবাসী দ্বিতীয় স্ত্রী। সুচাঁদ বুড়ি, পাখী, নসুবালা প্রভৃতি অন্যান্য নারী চরিত্র। সব নারী চরিত্রেরই বিস্তার কম। নবীন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বই উপন্যাসের মূল কথাবস্তু। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নারীর ভূমিকা নগণ্য। পাখীর মধ্যে বিদ্রোহ আছে, রুগ্ণ স্বামীকে ত্যাগ করে সে করালীর সাথে ঘর বেঁধেছে। তার মধ্যে সংস্কার অতিক্রম করার সাহস দেখা যায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত করালীর একনিষ্ঠতা সে পায় না। করালী গ্রাম ত্যাগ করে কলে চাকরি করতে গেলে সেখানে অন্য নারীর প্রতি তার আসক্তি দেখা দেয়। সুতরাং গ্রামে যে পাখী-করালীর প্রেমে গরবিনী ছিল, শেষে তার মধ্যেই বঞ্চিত এক নারীর ঈর্ষাপরায়ণতা প্রকাশ পেয়ে পাখী-করালীর প্রেম সাধারণ হয়ে যায়। বনোয়ারীর যৌবনের প্রেমিকা কালোবৌ প্রায় নেপথ্যেই থেকে যায়। বনোয়ারীর সাথে তার গোপন দেহ-মিলন কারোরই গৌরববৃদ্ধি করে না। কালোবৌ-এর অপমৃত্যু বনোয়ারীর বিবেকে অপরাধবোধই শুধু সৃষ্টি করেছে। কালোবৌ-এর সাথে সাদৃশ্য আছে বলে সুবাসীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বনোয়ারী, কিন্তু সুবাসী লঘুচিত্ত, অবিশ্বাসী—করালীর সাথে তার সম্পর্ক বনোয়ারীর জীবনে বিপর্যয়ই এনেছে শুধু। গোপালীবালা সাধারণ কাহার রমণী, বনোয়ারী তার স্বামী, এই তার একমাত্র গৌরব। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে তার আপত্তি অত্যন্ত মৃদু হয়। তার যৌবন গত, শক্তিমান পুরুষ বনোয়ারীর দেহ- বাসনা তাকে নিয়ে তৃপ্ত হয় না, একথা সে জানে। তাই বনোয়ারীর দেওয়া কয়েকটা টাকা নিয়ে সুবাসীকে সে আপন জায়গা ছেড়ে দেয়। তার অপমান, অসহায়তা ও নীরব বেদনা উপন্যাসে অনুভব করা যায়। কিন্তু গোপালীবালার মৃত্যুর পর আন্তরিক শোক বনোয়ারীর। গোপালীর সাধ ছিল মরার পর যেন তাকে একটি নতুন কাপড়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার শেষ সাধ বনোয়ারী পূরণ করতে পারে না অর্থের অভাবে। সাধারণ দরিদ্র রমণী, অল্প তার সাধ, আকাঙ্ক্ষা—তাও পূরণ হয় না—গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার মতই এটি সাধারণ ঘটনা। এর বেশি ছাপ গোপালী উপন্যাসের পাঠকের মনে রাখে না।

আরোগ্য নিকেতন তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম। এই উপন্যাসে শুধু পুরুষের প্রাধান্য নয়, প্রায় একক প্রাধান্য রয়েছে। প্রধান চরিত্র জীবন মশায় পুরাতন

প্রথার চিকিৎসক। তিনি কবিরাজ। এই উপন্যাসে মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধিই মূল বিষয়বস্তু, সেজন্য অন্য উপন্যাসের মত চরিত্রসৃষ্টি অথবা ঘটনা সংস্থাপনের কুশলতা তেমন প্রয়োজন হয় নি। গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও অধ্যাত্মবোধ জীবন মশায়ের পেশাগত উপলব্ধি থেকেই এসেছে। *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাস হিসেবে তাই ব্যতিক্রমধর্মী। জীবন মশায় তরুণ বয়সেই, ছাত্রাবস্থায় প্রেমে পড়েন। কিন্তু প্রেমপাত্রী মঞ্জরীর ছলনাময় আচরণে তাঁর মোহ ভঙ্গ হয়। কিন্তু প্রথম যৌবনের আশাভঙ্গের বেদনা তাঁর জীবনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। যথাসময়ে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর সম মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন না। বিবাহের পরে জীবন মশায়ের স্ত্রীকে আতর বৌ নাম দেওয়া হয়। আতরের মত সৌরভ ছড়িয়ে বধূ সংসারকে আমোদিত করে রাখবে, এই হয়ত জীবন মশায়ের মায়ের ইচ্ছা ছিল। তাঁর স্ত্রীর প্রাক্-বিবাহ-জীবন সুখের ছিল না, পিতৃমাতৃহীনা এই কিশোরী মামা-মামির অশ্রিত ছিল। স্বপ্ন হয়ত ছিল তার একটি আপন সংসার, স্বামীর প্রেম, একটি নিশ্চিন্ত নীড়। সম্পন্ন গৃহে উপযুক্ত পাত্রে তার বিবাহ হয়। জানতে পারে স্বামী অন্য নারীকে ভালবাসে, তার সাথে বিবাহ হয়েও হয়ে ওঠেনি। এই বঞ্চনা, ভাগ্যের এই নিদারুণ প্রহার আতর বৌকে প্রখর, মুখরা এবং স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুর নিরাসক্ত আচরণ করতে বাধ্য করেছে। জীবন মশায় স্ত্রীর এই গূঢ়, নির্বাক অভিমান বোঝেন নি এমন নয়, কিন্তু অপরাধস্খালনের মিথ্যা চেষ্টা তিনি করেন নি—তাঁর ব্যক্তিত্ব, কঠোর আত্মমর্যাদা-জ্ঞান স্ত্রীর কাছে তাকে নম্র হতে দেয় নি। তাঁর দিক থেকেও তিনি স্বাভাবিক গৃহজীবন, শান্তি, আশ্রয় ও সমর্পণ স্ত্রীর কাছ থেকে পান নি। তিনিও বঞ্চিত থেকে গেছেন। মঞ্জরীকে ভালবাসেননি—এমন মিথ্যা বলে স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন—এটাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং জীবন মশায়ের দাম্পত্য জীবনে একটা ফাঁক, শূন্যতা ছিল,—সত্যাশ্রয়ী জীবন মশায় স্ত্রীকে ঠকাতে চাননি, আর উগ্র আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্না আতর বৌ স্বামীর কাছে প্রাপ্য প্রেম প্রার্থনা করেন নি। সংসার করেছেন তাঁরা, সন্তান এসেছে সময়ে, নানা সমস্যা সংকট কাটিয়ে উঠেছেন একত্রে, কিন্তু সেতুবন্ধন হয়নি। বিশেষ করে আপন পুত্রের অসুখের কালে জীবন মশায়ের নিদান হাঁকাকে মাতৃহৃদয় দিয়ে আতর বৌ কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। মানসিকতার বিন্দু মাত্র মিল নেই দু'জনের, নিদারুণ দাম্পত্য-জীবন জীবন মশায় ও আতর বৌ-এর। অথচ আতর বৌ স্বামীকে দশজনের উর্দ্ধে জানেন, পেশাগত উৎকর্ষ ও সততাতে সন্দেহ প্রশ্নাতীত, বিবাহের পূর্বে মঞ্জরীর প্রতি আকর্ষণ ছাড়া কোন মালিন্য স্বামীকে স্পর্শ করেনি এটাও বিশ্বাস করেন। তবু চিরজীবন তিনি জ্বললেন। জীবন মশায়ের নির্লিপ্তিও কি নিরঙ্কুশ ছিল ? শান্ত স্থির গৃহজীবন, স্ত্রীর ভালবাসা কি তাঁরও কাম্য, প্রাপ্য ছিল না? স্ত্রীর মুখরতা, রূঢ়তা তাঁকেও কি আঘাত করেনি ? করেছিল বলেই মনে হয়, আতর বৌ যখন ঠাট্টাচ্ছলে বলেন সবার নিদান হেঁকে বেড়াও, বলতো আমি কবে মরবো,—তিনি স্থির কণ্ঠে বলেন—'দেখেছি, আমার মৃত্যুর পরে।' অর্থাৎ আতর বৌকে বৈধব্যভোগ

করতে হবে। বৈধব্যের নিঃস্বতার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিজ আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পুত্র শোক প্রথমে, স্বামী শোকও পরিণত বয়সে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। ভালবাসা নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু প্রকাশ পেতে পারে নি। জীবন মশায়ের মৃত্যু হলে সর্বহারার মত লুটিয়ে পড়ে বলেছেন—'মাধবকে তুমি পেলে ? এবার আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।' বেদনা বিষাদে ভরা এই যে জীবন, কত অনায়াসে, কত স্বল্প ভাষণে তারাশঙ্কর তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন—বিষাদিত অনুভব কত সহজে পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।

রাইকমল তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মানুষই প্রধান—এই উপন্যাসে বৈষ্ণবসমাজ ও ধর্ম-জীবনের মধ্যেই মানুষের সুখ দুঃখ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' বৈষ্ণব-সমাজব্যবস্থায় নরনারীর প্রণয়, ত্যাগ, বিরহ বেদনার গল্প। *রাইকমল* এই সমাজের মানুষেরই আরও পরিণত, গভীর জীবনের গল্প। উপন্যাসটি নায়িকা প্রধান—যা তারাশঙ্করের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে দুর্লভ। বৈষ্ণবীর কন্যা কমল বালিকা বয়সে ছিল হিন্দু রঞ্জনের খেলার সাথী। বয়স বাড়লে দুজনের মধ্যে ভালবাসা হলেও হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবের স্থান নীচে বলে তাদের অনুরাগ স্বাভাবিকভাবে পরিণয়-বন্ধনে পরিণতি পেল না। গ্রাম ত্যাগ করে কমল মায়ের সাথে নবদ্বীপে আসে। সঙ্গী হয় রসিকদাস বাউল। বয়সের সাথে কমলের রূপ বাড়ে, সে হয় রাইকমল। রঞ্জনকে সে ভোলেনা—সুতরাং বিবাহে তার অসম্মতি। শেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মাতার অনুরোধে সে কথা দেয় বিবাহ করবে। রসিকদাসের ধর্মের কারণে নারী সঙ্গ নিষেধ, কিন্তু কমল মাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে সংসার বিরাগী প্রৌঢ় রসিকদাসের গলাতেই মালা দেয়। রসিকদাস কমলের প্রতি বরাবর স্নেহ পরায়ণ, কিন্তু সে সংসার নির্লিপ্ত উদাসীন পুরুষ। কমল ভেবেছিল এই বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, রসিকদাসের সাথে তার দেহ সম্পর্ক হবে না। কিন্তু রসিকদাস অবদমিত কামনার মুক্তি দেয় কমলকে গ্রহণ করে। কমল মেনে নেয়, কিন্তু রসিকদাস গ্লানি ও অপরাধ বোধে ভোগে। তার ধর্ম সাধনা ও কমলের দেহ কামনার দ্বন্দ্বে সে হয় ক্ষতবিক্ষত। অস্থির, চঞ্চল হয়ে সে কমলকে নিয়ে পথে নামে, ঘুরতে ঘুরতে কমলের নিজ গ্রামে উপস্থিত হয়। এখানে এসে কমল জানতে পারে রঞ্জন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেনি, বৈষ্ণব হয়ে বাল্যসঙ্গিনী পরীকে বিবাহ করেছে। রসিকদাস শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে পরাজিত হয়ে কমলকে ত্যাগ করে, কমল বাধা দেয় না। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনে-কমলে দেখা হয়,—একে অন্যকে গ্রহণ করে, কিন্ত রঞ্জন পরিষ্কার করে বলে না যে পরী বেঁচে আছে, কমল রঞ্জনের কথায় মনে করেছিল পরী মৃত। কমল রঞ্জনের আখড়ায় আসার পর পরী প্রাণত্যাগ করে বিপুল বেদনা নিয়ে। কমলের তখনই রঞ্জনের প্রকৃতি বোঝা উচিত ছিল, কারণ রঞ্জন রোগ বিশীর্ণা পরীর প্রতি দয়াহীন। পরীকে ঘরে রেখেই সে কমলকে ঘরে তুলেছে, এজন্য বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ তার নেই। যৌবন পুষ্পিতা

কমলের দেহই তার প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু কমলের তো তা নয়। সে যে চিরকাল রঞ্জনকে ভালবেসেছে। তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে রঞ্জনের প্রণয়-উৎসাহ কমে আসে, টের পায় কমল। অন্তরে ব্যথা জাগে, তবু আশা ফুরায় না। কিন্তু যেদিন রঞ্জন নতুন এক বৈষ্ণবীকে সাধনসঙ্গিনী হিসেবে ঘরে তুলল, বড় বেদনার সাথে কমলের পরীকে মনে পড়ল। রঞ্জন অবশ্য ক্ষমা চাইল, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলো না, দেরীও করলো না। সে আর-এক পরী হবে না এইটুকু শক্তি, এইটুকু সম্ভ্রমবোধ তার আছে। ঘর ছেড়ে পথে নামল রাইকমল—তার আর কোন মোহ নেই, রঞ্জনের প্রতি ভালবাসার পিছুটান নেই, এমন কি কোন অভিযোগও নেই। উদাসীন বৈরাগ্যে গান গেয়ে সে পথ চলে, ঠিকানাবিহীন, মনে প্রশান্তি। লোকে মুগ্ধ হয়ে বলে তোমার হাসিটি বড় সুন্দর, সে সবিনয়ে জবাব দেয় 'বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু।' দুঃখকে জয় করার আনন্দ তার, সকল বঞ্চনা ব্যথার পরেই তো সে এই হাসি হাসতে পারে। সে 'রাইকমল'—যে কখনো শুকায় না।

তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষের বিশ্বাসকে তিনি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, উদাহরণ—*কালান্তর, বিচারক, সপ্তপদী, উত্তরায়ণ, মহাশ্বেতা, যোগভ্রষ্ট* প্রভৃতি উপন্যাস। সংশয়, দ্বন্দ্ব, সংকটের মধ্যে তারাশঙ্কর জীবনে সত্য অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু অখণ্ড বাস্তবতার মধ্যে, জীবনের সমগ্র স্বরূপের মধ্যে তার সন্ধান ব্যাপ্ত হয় নি,—সেজন্য সত্যানুসন্ধানে এক প্রকারের সীমাবদ্ধতা লক্ষিত হয়। উপন্যাসগুলিতে গভীর মানবজীবন-জিজ্ঞাসা থাকলেও মহৎ শিল্প পরিণতি লাভ দেখা যায় না—অপূর্ণতা, খণ্ডন থেকে যায়।

সপ্তপদী উপন্যাসের রিনা ব্রাউন একটি বিচিত্র ও জটিল চরিত্র। তার জন্য তার প্রেমিক কৃষ্ণেন্দু ক্রিশ্চান হয়েছিল, রিনা তাকে গ্রহণ করে নি। তার ধারণা একটি মেয়ের জন্য যদি এতদিনের ধর্মত্যাগ করা যায়, তবে অন্য প্রলোভনে সেই মেয়েটিও পরিত্যক্ত হতে পারে। রিনা কৃষ্ণেন্দুকে ভালবাসে, কিন্তু ধর্মান্তরিত কৃষ্ণেন্দুকে সে বিবাহ করতে পারেনা। বাকি জীবন সে নান হয়ে কাটিয়ে দেবে এই তার সংকল্প। ধর্মত্যাগী কৃষ্ণেন্দু শেষ পর্যন্ত রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী হয়ে বিশ্বাসের মধ্যে মুক্তি খোঁজে। রিনা কৃষ্ণেন্দুকে প্রত্যাখ্যান করেই জানতে পারে ক্রিশ্চানধর্মে তার কোন অধিকার নেই, সে জন ব্রাউনের জারজ কন্যা, আয়া কুন্তীই তার জননী। তার ব্যাপটিজম হয়নি, বাইবেল আর ক্রশ তার খেলনা মাত্র। তিন প্রজন্মের ব্যভিচারের রক্ত তার শরীরে। ব্রাউন কৃষ্ণেন্দুকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রচণ্ড ক্রোধে আর ঘৃণায় তার এই জন্ম-পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। ধর্ম থেকে, বিশ্বাস থেকে, পরিবার ও সমাজ থেকে সম্মিলিত প্রত্যাখ্যান রিনাকে প্রায় উন্মাদ করে দেয়, এক বিশ্বাসহীন, ঈশ্বরহীন চরম শূন্যতা তাকে গ্রাস করে। 'ঈশ্বর ধর্ম কোন কিছুর উপর আমার কোন অধিকার নেই। ঈশ্বর মূক, কোন ভাষা নেই তাঁর, তিনি প্রতিবাদ করেন নি, ধর্মের মধ্যে তালা রীতির কোডে মেলেনি বলে খোলেনি। আমি

সামনে দেখেছি নরকের সিংহদ্বার খোলা—তার মধ্যে ঢুকেছি।' রিনা গৃহত্যাগ করে তার মা কুন্তীকে নিয়ে। অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে অর্থ সে রোজগার করে দেহ বিক্রয় করে। শিক্ষা, রুচি, সম্ভ্রম প্রবল অভিমানে ভেসে যায়—সে অভিমান ঈশ্বরের প্রতি। স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়ে বন্য আনন্দ অনুভব করে ; লজ্জা নয়, গ্লানি নয়। যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার সৈন্যদের সাথে মিশে ব্যভিচারে সে নির্বিচারে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নরকের সীমানা দেখতে চেয়েছে। এই আত্মধ্বংসী অভিমান তাকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে, মৃত্যু বা আত্মহত্যার প্রান্তে যখন পৌঁছায়, তখনই দেখা হয় কৃষ্ণেন্দু, রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীর সাথে। ধর্ম ছেড়েছিল বলে রিনা এক দিন যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই কৃষ্ণেন্দুই পরম মমতায় তাকে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনে। কৃষ্ণেন্দুর ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস, তার অন্তরের প্রশান্তি, তার মানবসেবার মহত্ত্ব রিনাকে ফিরিয়ে আনে ধ্বংসের মুখ থেকে। সে আবার জীবনের দিকে ফেরে। জয় হয় কৃষ্ণেন্দুর। রিনার জীবনের পরম বিপর্যয়, বেদনা, লুণ্ঠিত নারীত্ব পাঠককে বিষণ্ন করে তোলে।

কিছু সংশয় ও প্রশ্ন জাগে *সপ্তপদী* উপন্যাস পাঠে। ধর্মত্যাগের কারণে কৃষ্ণেন্দুকে ফিরিয়ে দেওয়ার পটভূমি তারাশঙ্কর তৈরি করেন নি। রিনার কি প্রেমের চেয়ে ধর্মের বোধ বড় ছিল ? অথবা ধর্মের চেয়েও গভীর কোন বোধ ? এর সম্ভবপর কোন দিক রিনা চরিত্রে উন্মোচিত হয় নি। রিনার বয়স, পরিবেশ, কৃষ্ণেন্দুর প্রতি প্রেম কিছুই তার অস্বীকৃতির অনুকূল নয়। কৃষ্ণেন্দুর জীবনে ব্যর্থতার হাত ধরে বিশ্বাস এসেছে—পরমের সন্ধানে সে প্রশান্তি পেয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবসেবাই তার জীবনের লক্ষ্য, এইটুকুই কি যথেষ্ট ছিল না ? সকল ব্যথা বেদনা অতিক্রম করে কৃষ্ণেন্দু মানুষই। তাকে Saint—বানানোর প্রয়োজন ছিল না, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত করে শ্রদ্ধার পাল্লা ভারি করার চেষ্টাও নিষ্কারণ। মনে হয় তারাশঙ্কর কিছু স্থির বক্তব্য প্রকাশে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে গেছেন—বিচারের চেয়ে আবেগই বেশি কার্যকর হয়েছে।

মহাশ্বেতা-তে তারাশঙ্কর কলকাতার দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কলকাতার অবক্ষয়ের চিত্র ফুটেছে এ উপন্যাসে। অবক্ষয় সর্বত্র—সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তিতে। টাকার জন্য মানুষের উন্মত্ততা, চোরা কারবার, কালো টাকা, চারিত্রিক অধঃপতন সর্বত্র। এই পরিবেশেই উপন্যাসের নায়িকা নীরা বড় হয়ে উঠেছে। পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে তাকে জ্যাঠার বাড়িতে অনেক কষ্ট, অবিচার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে। তার ফলে সে হয়ে উঠেছে উগ্র, অস্থির ও ক্ষমাহীন এক নারী। তার পরিণত আত্মপ্রকাশ ও প্রেম-উপলব্ধি এই পথ ধরেই। তার বিবাহ বাসরে যখন সে জানতে পারল সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পিতার শিক্ষিত-পুত্র বর আগেই একটি বিবাহ করেছে (কালীঘাটের বিয়ে) এবং তার পত্নী সন্তানসম্ভবা, পিতাপুত্রের এই ছলনাতে মানুষের উপর তার বিশ্বাস চলে যায়। সেই মুহূর্তেই, অঙ্গে বিবাহসজ্জা নিয়েই সে গৃহত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পায়

সমাজসেবী বিনোদার আশ্রমে। এখানে সে শিক্ষিকা হিসাবে আসে, সাথে তার বি. এ. পড়াশুনাও চলে। মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, সহকর্মিনীদের আন্তরিকতা, শিশুদের সাথে মেলামেশা তাকে কিছুটা স্নিগ্ধ করে এনেছিল। বিশেষ করে আশ্রম কর্তা বিনোদার ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী নীরা কোন কিছুর গভীরে যেতে চায় না। তাই প্রতিমা ও বিনোদার সম্পর্কের জটিলতা না বুঝেই ধারণা করে নেয় তারা পরস্পরকে ভালবাসে। সে জানে না—শুধু কর্তব্য ও মমতার বশেই বিনোদা প্রতিমার প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল, তার মেজাজ, রুষ্ট আচরণ—মেনে নেন। অথচ বিনোদা তার প্রতিই আকৃষ্ট, চল্লিশ বৎসর পার করে তাকে ঘিরেই তাঁর মনে ভালবাসা জেগেছে। বিনোদাকে সে শ্রদ্ধা করে, অজান্তে ভালও বাসে, কিন্তু অস্থির বিবেচনায় সে বিনোদার প্রেম ও বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, সর্ব সমক্ষে এই শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে করে চরম অপমানও। সে সেই রাত্রেই আশ্রম ত্যাগ করে, কিছুদিন পর বিলাত যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য, যেটা বিনোদার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। ফিরে এসে কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই সহকর্মিনী অনিমার কাছে জানতে পারে বিনোদার মহানুভবতা, তার প্রতি ভালবাসার বিশ্বস্ততা. তখনই কার্শিয়াং গিয়ে বিনোদার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তার সংকল্প মৃত্যুর হাত থেকে বিনোদাকে, তার ভালবাসার মানুষটিকে ছিনিয়ে আনবে, তাঁকে সুস্থ করে তুলবে। সমগ্র উপন্যাসে নাটকীয়তার আতিশয্য, কষ্ট-কল্পনা নীরাকে প্রায় অবাস্তব করে তুলেছে। তারই মধ্যে, তারাশঙ্করের লেখনীর গুণে নীরার জীবনের দুঃখ-বেদনা, মাতৃস্নেহের জন্য, সহৃদয়তার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, ভালবাসার জন্য তার গোপন ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতি সঞ্চার করে। নীরা আসলে নিতান্ত একাকিনী। মৃত্যু পথযাত্রী বিনোদার কাছে আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনা সেই একাকিত্ব ঘোচাবারই শেষ চেষ্টা। বিনোদা চলে গেলে নীরার আর থাকে কী ?

এ পর্যন্ত তারাশঙ্করের উপন্যাসে নারীর দুঃখদহন ও ব্যর্থতাবোধের কথাই বলা হয়েছে। নারী জীবনে পূর্ণ সফলতা তারাশঙ্করে ব্যতিক্রম। একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র আছে, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার কথা—সে *অভিযান* উপন্যাসের ফট্‌কি চরিত্র। ফট্‌কির জীবনেও বিড়ম্বনা, অপমান ও দুঃখের পরিমাণ কম নয়, পঙ্ককুণ্ডেই তার অবগাহন—তবু সংশয়মুক্ত আনন্দ ও জয় পেয়েছে সে জীবনে। সকল অসম্মান ও বেদনার পরে তার সফলতা তৃপ্তির অনুভব সৃষ্টি করে পাঠকের মনে। এ উপন্যাসেও তারাশঙ্কর জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত—তাঁর বাস্তবানুভূতিকে বিন্দুমাত্রও সংকুচিত না করে ফট্‌কির জীবনের চরিতার্থতা তিনি বর্ণনা করেছেন, ফট্‌কি জীবনগ্রাহ্য চরিত্র।

ফট্‌কি এই নাম তার বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের জন্য। স্ফটিক, তার থেকে ফটিক, পরে স্ত্রী লিঙ্গে ফট্‌কি। তাঁর দেহসৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব অপূর্ব। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। দেহে যৌবন আসে, ফট্‌কি গ্রামের পুরুষদের প্রার্থিতা হয়ে ওঠে। তাকে

দেখে তৃষ্ণাতুর যুবকেরা 'ফটিক জল' 'ফটিকজল' বলে ডাকে। যৌবন প্রাপ্তির পর ফট্‌কিরও দেহতৃষ্ণা জাগে। বিধবার বিবাহ হবার নিয়ম নেই সেই কালে, অন্ধকার পথই বেছে নিতে হলো। গ্রামের মোড়লের ছেলে এক রাত্রে জোর করে ঘরে ঢুকে ফট্‌কির দেহ ভোগ করে। ফট্‌কির তাতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। অত্যাচারটা যেমন সত্য, দেহের তৃপ্তিও তেমন সত্য। When the rape is inevitable, enjoy it—এই নির্মম cynic উক্তি ফট্‌কির জীবনে সত্য। গ্রামেই ফট্‌কির জীবনে একাধিক পুরুষ এলো, কেউ কেউ ফট্‌কিরই আমন্ত্রণে। কিন্তু এক রাত্রে যখন চারজন একসাথে তাকে উঠিয়ে নিয়ে ভোগ করলো, গ্রামের সমাজ চুপ করে থাকল না—তার বাবাকে সমাজে পতিত করলো। এর আগে ফট্‌কির বাবা গোপনে ফট্‌কির দেহমূল্য-বাবদ জমি এবং টাকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এবার ফট্‌কিকে আর ঘরে রাখা গেল না সমাজের শাসনের কারণে। ফট্‌কির বাবা আড়াইশো টাকায় তাকে বিক্রি করে দিল এক শেঠের কাছে। এখানেই ফট্‌কির জীবনের পরিবর্তনের সূচনা। ছত্রী নরসিং ট্যাক্সির ড্রাইভার ও মালিক। পথে যেতে দুর্ঘটনায় ফট্‌কি ও শেঠের সাথে তার পরিচয় হয়। তার গাড়িতেই নরসিং শেঠের গৃহে তাদের নিয়ে আসে এবং নিজেও সাময়িক আশ্রয় নেয়। ফট্‌কির রূপ নরসিং-এর নজরে এলো।

নরসিং উগ্র ছত্রী জাতির বংশধর। নিজ গ্রাম ত্যাগ করে একটি ট্যাক্সির মালিক হয়ে নানা জায়গায় সে ট্যাক্সি চালিয়ে রোজগার করে। সে বিপত্নীক, মৃতা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ছিল তার। তার স্ত্রী জানকীর অনুরোধ ছিল—সে দরকার হলে দুটো বিয়ে করতে পারে—কিন্তু ব্যভিচার যেন না করে। স্ত্রীর অনুরোধ সে রেখেছে—সে মদ খেয়ে নেশা করে, কিন্তু নারীর মোহ তার নেই। ফট্‌কি বিক্রিতা, শেঠের কাছে এ কথা জানার পর, ফট্‌কির প্রতি তার সহানুভূতিই জাগে, লোভ নয়। ফট্‌কি কিন্তু নরসিংকে লক্ষ করেছে। শেঠের অন্তঃপুরে থাকলেও নরসিং তার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে। পুরুষের একটি চেহারাই তার জানা, তার সাথে নরসিংকে মেলানো যায় না। তাই নরসিং-এর প্রতি ফট্‌কির আগ্রহ জন্মায়। নরসিং-এর শক্তিশালী দেহ, তার ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি নরসিং-এর উদাসীনতা ক্রমেই ফট্‌কিকে আকৃষ্ট করেছে, তার কামনা তীব্র হয়েছে। এক রাত্রে দুঃসাহসে ভর করে সে নরসিং-এর ঘরে এসেছে, স্বেচ্ছায় নিজেকে দিতে চেয়েছে, কিন্তু নিরাশ্রয় এই হতভাগিনী মেয়েটিকে নরসিং গ্রহণ করতে পারে নি, সস্নেহ ব্যবহারে তাকে শান্ত করেছে। ফট্‌কির জীবনে ভালবাসা ছিল না, সে ভালবাসেনি কাউকে, শুধু দেহক্ষুধার তৃপ্তি দিয়েছে ও পেয়েছে, এই ছিল পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক। এবার ধীরে ধীরে ফট্‌কি নরসিংকে ভালবাসল—দেহের মধ্যে মনও যে আছে এই প্রথম সে বুঝল। এই ভালবাসাতেই নরসিংকে বলল—আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাও, চলো আমরা ঘর বাঁধি। এদিকে ভালবাসা এলো নরসিং-এর জীবনেও। নিম্নজাতির একটি খ্রিস্টান মেয়ে—মেরী নীলিমা দাসকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। মেরী

নীলিমা সুন্দর নয়, কালো, কিন্তু সে শিক্ষিতা, শিক্ষা তাকে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। কিন্তু ড্রাইভার নরসিং-এর কাছে সে চাঁদের মতই সুন্দর, চাঁদের মতই দূর। মাস দুয়েকের মধ্যেই অবশ্য অভিমানিনী ফট্‌কিকে সে গ্রহণ করেছে, কিন্তু নীলিমার নীল তার অন্তরে থেকেই যায়। দ্বিধাগ্রস্ত সে—এক দিকে ফট্‌কির আকুল আত্মসমর্পণ—অন্য দিকে মেরী নীলিমার আশা। সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায় যেদিন শেঠ উপভোগ শেষে তার পরিচিত এক উকিলের কাছে ফট্‌কিকে বিক্রি করে তার বাড়িতে তুলে দিতে আসে। নরসিং উপস্থিত ছিল, ফট্‌কিকে বাহুর আশ্রয় দিয়ে সে বলে 'না'। পা বাড়াবার আগে ফট্‌কি তার দিকে তাকিয়েছিল—কী ছিল সেই দৃষ্টিতে—শেষ প্রার্থনা ? তাকে ফেরাতে পারল না নরসিং, আবার বলল 'এ আমার।' শেঠ ও উকিল ছেড়ে দিল না তাকে—আদালতে অভিযুক্ত হলো নারী হরণের দায়ে। কিন্তু ফট্‌কি, যেন আর এক ফট্‌কি বাঁচিয়ে দিল নরসিংকে, নিজেকেও করলো মালিন্যমুক্ত। আদালতে নিজ জীবনের সব কলঙ্ক মেনে নিল, ভয় পেল না, লজ্জা করল না। আদালতে নরসিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল—'আমি হুজুর, ওই মানুষের চরণতলায় পড়ে থাকতে চাই ; বাপ চাই না, দেওর চাই না ; শেঠজীর ঘরের, উকিল বাবুর ঘরের সুখ চাই না ; আমি একেই চাই। ওর কোন দোষ নাই ; ওকে খালাস দেন। আমি ওর সঙ্গেই যাবো। ও যদি না নেয়—নদীতে জল আছে, দোকানে দড়ি মেলে, কল্কে ফুলের গাছে ফলের অভাব নেই—আমি মরব।' বিশ বৎসরের বেশি বয়স ফট্‌কির, সে সাবালিকা, তার কথায় নরসিং খালাস পেল। 'নরসিং কোর্টের বারান্দায় বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কি এসে সেই জনতার মধ্যেই তার বুকে মাথা রেখে, কাঁধে একটি হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নরসিংও তাতে লজ্জা পায় নি। গিরবরজার ছত্রীর ছেলে সে, পেশায় সে মোটর ড্রাইভার, তার আর এতে লজ্জা কী ? কিসের লজ্জা ? সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল ; সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কির সেই চোখের লোনা জলে নরসিং-এর মনে আগেকার দেখা যত মেয়ের মুখের ছাপ পড়েছিল, সে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। জানকীর মুখও মনে নাই তার। নীলিমাকেও আর মন পড়ে না। ফট্‌কি, শুধুই ফট্‌কি।' বিজয়িনী নয় ফট্‌কি ? সাধারণ মানুষ, ছোট জীবন, জীবন ভরা দুঃখ বেদনা, অপমান-অসম্মান—তবু মাঝে মাঝে মানুষ পরিপূর্ণ হয়, কৃতার্থ হয়। এই আশাতেই তো মানুষ বাঁচে, পথচলা থামায় না।

সবশেষে আর একটি ছোট চরিত্র। 'নসুকে, ভাদুর মাকে পার কর' কার এই প্রার্থনা, কে এই ভাদুর মা ? *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র নসুবালাকে অনেকে হয়ত ভোলেন নি। নসু সেই রঙ্গিণী মেয়েটি, যে নাচে গানে ছড়া কেটে সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। বয়স হয়ে *শুকসারী-কথা* উপন্যাসে সেই-ই ভাদুর মা হয়েছে। মেয়েরা 'না বিইয়ে কানাই-এর মা' হতে পারে, নিঃসন্তান রমণীকে 'নেই রামের মা' বলেও সম্বোধন করা যেতে পারে, কিন্তু একটি পুরুষ কি মা হতে পারে, ভাদুর মা ? নসুবালা আদৌ মেয়ে নয়, সে পুরুষ, বাল্যাব্যধি মেয়েসুলভ বেশবাস, আচার আচরণে সে নসু থেকে নসুবালা হয়ে

গিয়েছিল। ভাদু কে ? লোক-সংগীত, লোক-সংস্কৃতির প্রতি তারাশঙ্করের সহজাত আগ্রহ ছিল, তাঁর বহু উপন্যাসেই গ্রামীণ উৎসব, মেলা, পূজা-পার্বণের বর্ণনা আছে, তার মধ্যে ভাদু পূজার উল্লেখ আছে। এক জমিদার কন্যা কৃষ্ণকে ভালবেসে জীবন দিয়েছিল, সেই থেকে মানবী ভাদু মানুষের পূজা পেয়ে আসছে। জমিদার কন্যা ভাদু, দেবী হয়ে গিয়েছে। এই ভাদুরই মা নসুবালা।

শুকসারী কথা-ত নসু শহরে বাসা বেঁধেছে। গান গেয়ে লোক-মনোরঞ্জন করেই তার দিন চলে। তার নারী স্বভাবে পরিবর্তন হয়নি, বয়সের সাথে সাথে চাপল্য সরে গিয়ে ধীরতা এসেছে। এসেছে ঈশ্বরের জন্য ভক্তি, মানুষের জন্য স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি। তা কেউ নিক না নিক। জীবনকে বিস্ময়ের সাথে, আনন্দের সাথে দেখার শক্তি তার আছে। নসুর নারী অস্তিত্বই সত্য, মাতৃরূপেই সে ঈশ্বরের কৃপা চায়—'ভাদুর মাকে কৃপা কর।' নসুর স্নেহদৃষ্টি সর্বত্র, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি। 'নসু বলে—একটি দুটি রেখে [ফুল] লিয়েন মা। ফুলের গাছ ফুল বিইয়েছে—ওর তো ছেলে, সব লিলে পরাণে লাগবে। আর শোভা ? মা শোভা হারাবে।' সর্বত্রই তো শোভা হরণের, বেদনা দেবার প্রতিযোগিতা চলছে, তার মধ্যে নসুর এই আকুতি, শুভবোধ পাঠক হৃদয়কে আঘাত দেয়। যার নিজ জীবনবৃক্ষই রইল শুষ্ক, নিষ্পত্র, ফলফুলের কথাই ওঠেনা—সেখানে জগৎ শোভার জন্য এই না-পুরুষ না-রমণীর আকুলতা হৃদয়কে এক বিষাদিত বোধে আচ্ছন্ন করে দেয়। ভাদুর মাকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

এই বিষাদিত জীবনবোধেই তারাশঙ্কর মহৎ শিল্পী।

তথ্যনির্দেশ

১ *তারাশঙ্কর রচনাবলী* ১ম খণ্ড প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

২ অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৩ উদ্ধৃত *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* ; নিতাই বসু, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮৮, কলকাতা।

৪ ইন্দ্র মিত্র ; 'মনের কথা বলার লোক নেই', *শারদীয় দেশ* ১৩৯৮, পৃ. ২৩

৫ অশ্রুকুমার সিকদার : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৬ ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্র. প্র. ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪১

৭ নিতাই বসু ; প্রাগুক্ত।

❑ তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রকাশিত *তারাশঙ্কর রচনাবলী*-র বিভিন্ন খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।

কীর্তিহাটের কড়চা : অধুনা মহাকাব্য

বেগম আকতার কামাল

জাতিসত্তা গঠনের ঊষাকালে সংঘটিত ঘটনার প্রণালীবদ্ধ আখ্যায়িকা হিসেবে মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। তবে সমকালের নয়—এই রচনা পরবর্তী বংশধরের বা গ্রন্থিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি যা অব্যক্তিক উচ্চারণে, শ্লোকমাল্যে, বিস্ময়রস ও মহিমাকীর্তনের অলঙ্কারে সজ্জিত। আমাদের অপসৃত অতীতের মহার্ঘ উপলব্ধি ও জীবনবীক্ষাজাত প্রজ্ঞান এর আধারে সংরক্ষিত থাকে। এ সেই অতীত যা ঘটেছিল স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী, আমাদের জন্য আজ যা অনভিগম্য। সম্পদসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে বীরত্বের উত্থান, জাতিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, বহির্দেশের শ্রম ও সম্পদ করায়ত্ত করার উগ্র বাসনা নিয়ে গড়ে ওঠে মহাকাব্যের ইতিবৃত্ত। বিস্তৃত আয়তনে শাখাপ্রশাখার তন্তুজালে পরিবেষ্টিত আখ্যান বয়ন করাই এখানে লক্ষ্য, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জাতি হিসেবে আধিপত্য লাভের সূত্রে সংঘটিত রক্তপাত-ষড়যন্ত্র-মৃত্যু মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কোনো এক মহানায়কের আবির্ভাব ও বিলয়ের নিয়তি-নির্ধারিত ছকবদ্ধ জীবনপটে পরিবেশিত হয় মানবজীবনের নৈসর্গিক চক্র, সৃষ্টিসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এবং প্রতীতির মায়াজাল। এর সঙ্গে দ্যোতিত হয় মানবচেতনা উন্মেষকালের প্রবৃত্তি ও সত্তার সংঘাতদ্বন্দ্ব, জড় ও প্রাণের সম্পর্ক-পরম্পরা ও কল্পনাবৃত্তির অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। ফ্যান্টাসির বিচিত্র প্রকাশ, মানবস্বভাবের টাইপ এবং দুর্জ্ঞেয় নিয়তির ভয়ঙ্কর রূপের সমন্বয়ে মহাকাব্য অতিকায় সৃষ্টি। মহাকাব্যের রচয়িতা সৃষ্টি বা নির্মাণ করেন না, গ্রন্থিবদ্ধ করেন বহুবিধ ক্রিয়াকাণ্ড, মিশ্র স্বরপ্রবাহ, শিল্পরূপের আদিবৈশিষ্ট্য, ধর্ম-প্রবৃত্তি-কীর্তি-যশ-ধ্বংসক্রমের দৃশ্যমান রূপজগৎ।

উপন্যাস মহাকাব্যের উত্তরসূরি—এ-জাতীয় বক্তব্য রূপতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার অন্তর্গত। একালের কোনো কোনো উপন্যাস মহাকাব্যিক রূপধর্ম অর্জন করে নেয়—যদিও দুইয়ের সম্পর্ক দ্বিমুখী বৈপরীত্যে বাঁধা। অবিচল, স্তরীভূত, মূল্যাঙ্ক-বিশিষ্ট মহাকাব্যের বৃত্ত ভেঙে উপন্যাস বিচরণ করে মুক্ত আঙ্গিকে, এর গতি ঘূর্ণমান ও অস্থির। স্থানে-কালে বিবর্তিত মানবচরিত্র ও তার অভিজ্ঞতারাজি, কর্মযজ্ঞ, অনুভূতির প্রতিরূপাত্মক বাস্তবতাই উপন্যাসের আরাধ্য। অতীতের স্থিরাদর্শ, সুমহান অনুভব বা বিধিবদ্ধ কোনো মূল্যবোধ নয়, উপন্যাসের অভীষ্ট ভবিষ্যতের নিরবয়ব-অস্তিত্বকে বর্তমানের প্রতিমুহূর্ত দিয়ে অভিজ্ঞতায়-স্বপ্নে-যন্ত্রণায় বিনির্মাণ করা। জীবনের জন্য তাৎপর্য রচনা এখানে পূর্বনির্ধারিত নয়. তা পরীক্ষিত হয় ঘটনাবর্তে, এখানে জীবনের গতিপথ সম্মুখে ধাবিত,

কিন্তু মহাকাব্য বৃত্তময়, তাৎপর্য সেখানে পূর্ব-অস্তিত্বগত। উপন্যাস-রচয়িতা আত্মসচেতন, জীবনদর্শন-সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞাবান এক প্রতিভা—স্বকীয়, একক, স্বাধীন। তাঁর নিজস্ব বিশ্ববীক্ষার অর্থেই গড়ে ওঠে শিল্পকর্মটির অবয়ব। তবে মহাকাব্যিক বস্তুবৈচিত্র্য, চিরায়ত আবেগমাল্য ও জীবনভাবনার উচ্চরূপ ধ্যানের মধ্য দিয়ে উপন্যাস গ্রহণ করতে পারে এপিক-ধর্ম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কীর্তিহাটের কড়চা* [প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩] উপন্যাসটি আকৃতি ও কতিপয় বৈশিষ্ট্যসূত্রে মহাকাব্যধর্মী, শ্রেণীভিত্তিক ইতিহাসধারায় বিবর্তিত বিশিষ্ট দেশকালবদ্ধ সমাজজীবনের এক মহা-আখ্যান। কিন্তু এখানে মূলত লেখকের আধেয় হচ্ছে উপন্যাসের আত্মা। পরিবর্তনশীল সমাজ ও ব্যক্তির বস্তুবিশ্বকেন্দ্রিকতার সঙ্গে বিজড়িত মনোলোকের সুগ্রন্থিত বিন্যাসে আত্মাটি প্রতিবিম্বিত। তবে আখ্যানবৃত্ত ও ইতিহাস-বহির্ভূত মানবস্বভাবের মৌল বৃত্তি-প্রবৃত্তির অপরিবর্তনীয় কিছু সূত্রাবলি এই উপন্যাসের মূল নিয়ন্ত্রক। ফলে এতে নির্মিত জগৎটি কালগত দিক থেকে ইতিহাস-অন্তর্গত সময়ের অধীন বা স্থানের প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট হলেও দৃষ্টিবিন্দুতে ধরে রাখে এক মহাকাব্যিক সময়বৃত্ত, আখ্যানপটের বিস্তৃত ও জটিল বয়ন, পাত্রপাত্রীর স্বভাবধর্ম ও কর্মযজ্ঞের দ্বন্দ্ব এবং নিয়তি-নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। *কীর্তিহাটের কড়চা* দ্বৈতরূপাশ্রয়ী রচনাকর্ম, উপন্যাসের গর্ভে নিষিক্ত মহাকাব্যের উপাদানবীজ-বিশিষ্ট এবং পাশ্চাত্য প্রচল-মডেলের উপন্যাসরূপ থেকে আলাদা। আমাদের দেশজ মহাকাব্যিক উপন্যাস তৈরির দৃষ্টান্ত হিসেবেও উপন্যাসটির বিবেচনা সম্ভব। এতে যদিও গড়ে উঠেছে মিশ্র, বৈপরীত্যমুখী, স্ববিরোধী এক কাঠামো, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ভিন্ন ও নতুন রূপাভাসও হয়েছে সংকেতিত। তারাশঙ্কর প্রাকরণিক সূত্রে কতিপয় রীতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অঙ্গীভূত করেছেন উপন্যাস-পূর্ব ধারার শিল্পসৃষ্টির বিক্ষিপ্ত ফর্ম।

কীর্তিহাটের কড়চা-য় উপন্যাসোচিত ঘটনা ও খণ্ডসময়ের সঙ্গে বিজড়িত হয়েছে পুরাণকালের মহাসময়চক্র, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির পটে ব্যক্তিমানুষের আত্মানুসন্ধানের প্রতিরূপক, আদিপাপের অভিশাপ, প্রবৃত্তিজাত বাসনার উন্মার্গগামিতা ও রক্তগত সম্পর্কের জটিলতা এবং কর্মফল ও দৈবের প্রতিফল। এছাড়াও রয়েছে মহাকাব্যধর্মী বস্তুবৈচিত্র্য, বর্ণনা ও কথকতার মায়াজাল—বেষ্টনীর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরীক্ষার বিবিধ পদ্ধতি ; চিত্রকলার প্রযুক্তি, মনোবাস্তবতার রহস্যকুঞ্চিকা, নাটকীয়তা, সাঙ্গীতিক প্রতিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এ-উপন্যাসের শৈলী। ব্যক্তিচরিত্রে ও সময়-অভিজ্ঞতায় বিবর্তিত মানবজীবন-পটভূমে প্রতিফলিত তারাশঙ্করের শ্রেণীচেতনা, অভিজ্ঞতার বাস্তবতা, আত্মদর্শন ও শিল্পচর্যার অনুশীলিত রূপটি এখানে সুনিশ্চিত, পরিণত এবং শিল্পিত। এ-উপন্যাসে তিনি অতীতমুগ্ধ বা পারিবারিক ও শ্রেণীউত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ প্রতীতির অন্তর্গ্রন্থনায় সশ্রদ্ধ হয়েও শেষপর্যন্ত থেকেছেন নির্মোহ বিশ্লেষক। ইতিহাসবুদ্ধিতে তিনি বিবেচক ও

বিচারক, অথচ প্রত্নপ্রতীতি সূত্রে মানবস্বভাবগত মৌলবৃত্তিসমূহের প্রতিও আবেগময়, সমর্পিতচিত্ত অর্থাৎ এপিক-স্বভাবী। তাই *কীর্তিহাটের কড়চা* জীবনপটভূমির বিস্তৃতি ও উপন্যাসোচিত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সময়বিধৃতির রূপচিত্র অঙ্কনেও আন্তর্গভীর এবং নিরীক্ষাপ্রসূত।

মহাকাব্যের লক্ষ্য মহৎ ও বৃহৎ জীবনপ্রতিভাসে বিমণ্ডিত, উপন্যাসের অন্তর্জীবনপটে আজ এরই অনুসন্ধান হয়ে ওঠে রচয়িতার অভিজ্ঞান এবং সময়তাৎপর্যের গভীর স্তরযুক্ত। আমাদের স্বর্গীয় যুগ, বীরত্বময় অভিযানপর্ব অতিক্রান্ত, মানববন্দনার কালটিও অবসিত, কিন্তু উপন্যাসের গর্ভে এসবের বীজাঙ্কুর মুকুলিত হতে পারে। মানুষের স্বর্গতৃষ্ণা, বীরত্ব ও মানবকায়ার বিশালত্ব সম্পর্কে গৌরববোধ বর্তমানে ব্যক্তিমনের একাকিত্ব, সংশয় ও নষ্ট বিবেকের ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে আবারও হতে পারে সংজ্ঞায়িত। এরই দৃষ্টান্ত টলস্টয়ের *ওয়ার এ্যান্ড পীস*—যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্যক্তিচিত্তের নৈতিকতার মর্মস্বরধ্বনিত যন্ত্রণার গদ্যভুবন, অথবা রোমাঁ রোলাঁর *জাঁ ক্রিস্তফ*, গলসওয়ার্দির *দি ফর সাইট সাগা* [*কীর্তিহাটের কড়চা*-য় যার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত], টমাস মানের *ম্যাজিক মাউন্টেন* কিংবা জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*। আধুনিক উপন্যাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময়মাত্রায় ও স্থানিক-তাৎপর্যে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য ও বিচূর্ণকৃত-বিশ্বটি পরিস্ফুটিত করে এবং তখনই তাতে এপিকরূপ অর্জিত হয় যদি নির্মিত হয় চিরকালীন প্রামাণ্য মানুষের প্রমূর্তি। ব্যক্তির প্রতীকতায় eternal passion ও eternal pain সঞ্চারের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় authentic-self existence-এর জয়যাত্রা। তবে এপিক উপন্যাস জাতিক সংগ্রাম ও যুদ্ধপ্রতিবেশের মতো বহির্জীবন ও ঘটনার আবহে সক্রিয়তা পায় অর্থাৎ একটি বৃহত্তর চঞ্চল ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস-চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব এতে অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—হতে পারে তা প্রত্যক্ষ বা প্রতীকী। সর্বোপরি বস্তুবৈচিত্র্য বা ব্যক্তিমানবের উচ্চ-অবস্থান সত্ত্বেও উপন্যাসে এপিকত্ব গড়ে ওঠেনা, যদি তা দেশজাতির গোষ্ঠীবদ্ধতার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত না করে।

বাংলা উপন্যাসে মহাকাব্য-ধর্ম জীবনবোধের গভীরতা দ্বারা যতটা বিমণ্ডিত, আকৃতি ও আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে ততটা নিবিষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* ইতিহাসের বিশালতায় দণ্ডায়মান হলেও তার চলন একমুখী গতিতীব্রতায় বাঁধা ; রবীন্দ্রনাথ *গোরা*-য় আত্ম-অন্বেষণের মহাকাব্যিক বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং ব্যক্তির মহাউত্তরণকে সম্পৃক্ত করেন দেশজাতিকেন্দ্রিকতায়, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিরই রূপালেখ্য। অবয়বগত বিশালতায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের *সত্যাসত্য* এপিকরূপের দৃষ্টান্ত, এতে রূপকধর্মও অবলম্বিত। আধুনিক কালধর্মানুযায়ী ইডিওলজির সংঘাতস্পৃষ্ট ব্যক্তিমানুষের চৈতন্য, পূর্বপুরুষ বনাম উত্তরপুরুষের দ্বন্দ্বসম্পর্ক এবং মানুষের সৃজনীক্ষমতার অতৃপ্তি-আর্তি-অন্বেষা উপন্যাসটিকে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি দিয়েছে, কিন্তু দেশজাতির সংকটভূমে যুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর পূর্বাপর মহাকাব্যসদৃশ জীবনপটের রূপকার—যা

দেশজাতিভিত্তিক, বিশেষত ভারতীয় সনাতন-গ্রাম ও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্রে গৃহীত। জীবনপ্রবাহের বিবর্তিত গতিরেখা-চিত্রণে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রেরণায়িত, তাঁর অভিজ্ঞতাই শিল্পিসত্তার মূলবৈশিষ্ট্য তথা মহৎবোধ ও কল্পনাশক্তির বিকল্প। জীবনঘনিষ্ঠ রূপাঙ্কণে ও রচনাক্রিয়ার অব্যাহত-ধারায় তারাশঙ্করের লেখনী পেয়েছে বিজ্ঞতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। *কীর্তিহাটের কড়চা* এরই সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে জীবনধর্ম বিষয়ক মৌল কিছু মাত্রা ও কালোচিত প্রকাশরূপের যাথার্থ্য।

দুই

উপন্যাসটির ইতিবৃত্ত ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশকালে উত্থিত সামন্তশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা-বিকাশ-অবক্ষয় অর্থাৎ একটি শ্রেণীর অস্তিত্বগত প্রবাহ। ইতিহাসসময়ের বিশেষ আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে জন্মপ্রাপ্ত সামন্তশ্রেণীর সমৃদ্ধি ও পতন স্থানকাল নির্ধারিত, কিন্তু ব্যক্তিপাত্রের অস্তিত্বে ও তাদের মনোলৌকিক বিশ্বে মহাসময়ের কিছু অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি-বাসনা-আবেগ ঐ স্থানকালের পটে হয়েছে পৌনঃপুনিক। ফলে এ-উপন্যাসের কালমাত্রা দ্বৈত, খণ্ডসময়ের পরিধিতে ঘটনা ও ব্যক্তিস্বভাবের বৃত্তধর্মী প্রকাশ অর্থাৎ সংঘটনা-আবির্ভাব-বিলয়ের অশেষ সময়টি বিধৃত। ইতিহাস-নির্ধারিত কালবিস্তৃতি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তন থেকে ১৯৫৩-তে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ পর্যন্ত। এই সময় সুচিহ্নিত, সনাক্তযোগ্য, কালগর্ভে উজ্জ্বলিত। কিন্তু মহাকাব্যিক প্যাটার্নসদৃশ একটি উপক্রমণিকা ও অন্তিমপর্ব সংযোগের ফলে সময়ের আরম্ভ ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধকাল থেকে এবং সমাপ্তি ঘটেছে সামন্তবংশীয় শেষ প্রজন্ম সুরেশ্বর রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উপক্রমণিকায় আছে পলাশীতে নবাবের পতন পর্যায়ের বিপর্যয়, নব্যশাসকের আবির্ভাব, আর্থ-সামাজিক রূপান্তর এবং সামন্তশ্রেণীর আদিপ্রতিষ্ঠাতা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের জীবনবৈচিত্র্য। অসংখ্য ব্যক্তি ও ঘটনার বিচিত্র প্রবাহে উপন্যাসটির গ্রন্থনা মহাকাব্যিক উচ্চতার স্মারক, সমাপ্তিতে প্রতীকী তাৎপর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা হয়ে উঠেছে বৃত্তাবদ্ধ কালের আবহ-ভাস। সুরেশ্বর রায়ের পুত্র মানবেশ্বর রায়ের উত্থানের সংকেত দেখিয়ে ঔপন্যাসিক বিবর্তিত কালের রৈখিক গতিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রায় দুশো বৎসরকালে সংঘটিত ঘটনাক্রম উপন্যাসটির আশ্রয়, চার খণ্ডে সুবৃহৎ পরিসরে বিন্যস্ত হয়েছে রায়বংশের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও ধ্বংস। শ্রেণীমানবের জন্ম ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে জাতিক ইতিহাসের প্রতিরূপক সৃষ্টিই এই উপন্যাসের আধেয়, বিশেষ করে আমাদের স্বদেশ-পটভূমির ইতিহাস অন্বেষা এখানে এপিকতুল্য। এ-সূত্রে লেখক নির্বাচন করেছেন একটি বংশের পুরুষানুক্রমিক বিন্যাস। সময়চিহ্ন দ্বারা বিশেষায়িত নরনারীর বিচিত্র সম্পর্কের ধরনকে এ-বিন্যস্ত করা হয়েছে বাঙ্ময়।

উক্ত ইতিহাসকালের অবতলে অন্তঃস্রোতরূপী ভারতীয় বিচিত্র জাতিরূপ ও তাদের বহমান জীবন বিরাজিত, রায়বংশের শৌর্যবীর্য-প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে এই জাতিজীবনের উপস্থাপন ঘটে পশ্চাৎপট হিসেবে। অগ্রপটে রয়েছে ভারতের ক্রমজাগ্রত জাতীয় অভ্যুত্থানের দ্বন্দ্বজটিল আর্বত, পরিশেষে ইতিহাসগতির তাৎপর্যবহ নতুন কালের অভ্যুদয়। একটি জনপদের মানবগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক জীবনচর্যা ও লৌকিক বাস্তবতা, অলৌকিক ধর্মসংস্কার, হিংসাদ্বেষক্রোধ ইত্যাদি আবহমান জীবনের বিচিত্র মৌলিক উপাদান। কথকতার রীতিক্রমে সুরেশ্বর রায়ের জবানিতে কাহিনী বর্ণিত হলেও [উপন্যাসের প্রকরণ অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেক্ষণবিন্দু] ঘটনা ও ব্যক্তিবর্গের স্বয়ংক্রিয় অস্তিত্ব এখানে স্বাধীন সম্মিলিত স্বরের উদ্‌গাতা—তা বহুজনের বর্তমান ও অতীতের টানাপোড়েনে গ্রন্থিত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিতর্কমূলক, পুনরাবৃত্তধর্মী। শ্রেণীপরিচিতির খণ্ডসত্য এখানে জাতিসত্তার বৃহৎ সত্যে উত্তীর্ণ—ব্যক্তি ও জাতির যুগলবন্দিত্বেই গড়ে ওঠে আধুনিক উপন্যাসের এপিকধর্ম। ঘটনাবৃত্ত ইতিহাসগত হয়েও যেমন তা সময়াতিক্রমী চিরায়ত মানবমানবীর স্পৃহা ও চৈতন্যের আদিলড়াই-সদৃশ, তেমনি সমাধানটিও মহাকথার মত মিথিক্যাল—অভিশপ্ত, পাপী মানবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জনের পৌরাণিক প্রতীতির মতো। এ-উপন্যাসে জন্ম ও মৃত্যুর মোটিফ ব্যবহৃত, প্রতিটি মৃত্যুঘটনাই সাংকেতিক ; জন্মসূত্রও অতিপ্রাকৃত ক্রিয়া-নির্দেশিত। কিন্তু জীবনকালটি ইতিহাস-ঘটনার মধ্যে অন্তরীণ, তবু uniqueness of death-কল্পনায় উপন্যাসটি পুরাণের মতো অতিঘটনাবহ।

কাহিনীর আরম্ভে কথক সুরেশ্বর রায়ের ব্যক্তিসত্তা ও কালপরিসর মুখ্যপট, সে প্রথমত একজন সময়ান্বিত মানুষ। ১৯৫৩-এর নভেম্বর মাসের হৈমন্তিক সন্ধ্যায় কলকাতার জানবাজার অঞ্চলের বাড়িতে পূর্বপ্রণয়িনী সুলতার কাছে প্রদত্ত জবানবন্দির মধ্য দিয়ে আখ্যানের শুরু, চিত্রশিল্পী সুরেশ্বর নিজের অঙ্কিত পূর্বপুরুষদের চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করছে। তাদের চরিত্র-প্রতিবিম্ব ও ঘটনাকালের অর্থবহ বিশেষ দৃশ্যাবলি সুরেশ্বরের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত। মহাকাব্যের আখ্যায়িকার মতোই এখানে বাস্তবে অন্তর্হিত ব্যক্তিবর্গের অবাস্তব উপস্থিতি ও ক্রিয়াকলাপের কুহকী বাস্তবতা সৃষ্টির পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে দেশকালের রঙরেখা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইম্প্রেশনিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুরঞ্জিত ও গবেষকের অনুসন্ধিৎসায় বিনির্মিত হয় এবং অর্জন করে নৈর্ব্যক্তিকতা। বিক্ষুব্ধ বর্তমানে জীবনযাপনকারী সুরেশ্বরের ঘটনাবহুল জীবনচিত্র বা তার একাকী, বিষণ্ণ, সংশয়াপন্ন অস্তিত্ব ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার যুগ্মধারা ঘটনাস্রোতের মধ্যে পরস্পরিত, অন্তিমেত তারই মৃত্যুদৃশ্যে ঘটে কাহিনীর যবনিকাপাত। এক অর্থে সুরেশ্বর রায়ের ব্যক্তিঅহম ও তার সত্তায় উত্তরণের দ্বান্দ্বিকতা উপন্যাসটির প্রসঙ্গসূত্র, কিন্তু গভীর অর্থে এর আধেয় কালের-অবগুণ্ঠনে ঢাকা মানবজীবনের মহাকথা। অতীতের স্মৃতিবীজ অঙ্কুরিত হয়েছে বর্তমানের বাস্তবে,

সুরেশ্বরের মগ্নচৈতন্য ও রক্তপ্রবাহ এই বীজের ধারক, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তা অঙ্কুরিত। যেসব চরিত্র ও ঘটনা জীবনমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত, সেই মহানাট্যের পুনরাভিনয় আমরা প্রত্যক্ষ করি কখনো সুরেশ্বরের কথনে, কখনো অন্যচরিত্রের বাচনে এবং লেখকের বর্ণনায়। অর্থাৎ কাহিনী সংগঠনে বিচিত্র উচ্চারণ ব্যবহৃত হলেও প্রেক্ষণবিন্দু সুরেশ্বরের মতাদর্শে ও জীবনকেন্দ্রে স্থিত।

রায়বংশের শেষ প্রজন্ম হিসেবে সে ঘটনাক্রমে জড়িত হয়ে পড়ে কীর্তিহাটের জমিদারির সঙ্গে ; ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেটেলমেন্ট দফতরের বাধ্যতামূলক সমন পেয়ে সুরেশ্বর কীর্তিহাটে উপস্থিত হয় এবং দেবোত্তর সম্পত্তি ও দরপত্তনির মাধ্যমে রেকর্ডকৃত ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের প্রশ্নে জটিলতার মুখোমুখি হয়। জমিদারির পুরানো সিন্ধুক অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয় কুড়ারাম ভট্টাচার্য লিখিত বংশপরিচয়বাহী পাঁচালী 'কালিকামঙ্গল', পূর্বপুরুষদের ডায়েরি, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি। ইতিহাসবিদের জিজ্ঞাসা নিয়ে সুরেশ্বর সত্তাসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। কীর্তিহাটে প্রত্যাবর্তন তার জীবনের এমন এক পরিঘটনা যা তাকে করে তোলে আত্মসন্ধিৎসু, উৎসমূলে অভিগমনের নায়ক। মহাকাব্যিক বীরের মতোই সে কীর্তিহাটে তথা অস্তিত্বকেন্দ্রে প্রত্যাগমন করে বর্তমানের প্রশ্ন, চিত্তবাসনা, যুক্তিবোধ ও ব্যাখ্যা নিয়ে। একইসঙ্গে মানুষ হিসেবে তার স্বভাবে অন্তর্লীন থাকে প্রেম ও মানবতা, মানবপ্রজাতিরূপে সে বহন করে নির্জ্ঞানমনের রহস্যপূর্ণ গূঢ়প্রবৃত্তির সর্পিল-অস্তিত্ব. আর্কেটাইপে ধারণ করে পূর্বপুরুষের ঔদ্ধত্য-অহমিকা-ভোগবাসনা ও পাপবোধ। অতীত ও বর্তমানের দ্বৈতমাত্রায় সুরেশ্বর দ্বন্দ্বসংঘাত পর্যায় থেকে ক্রমে উত্তীর্ণ হয় মানবীয় প্রেমে, ফলে এ-উপন্যাসে স্থিরতর অতীতহ্রদে বর্তমানের আকাশপটই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সুরেশ্বরের শৈল্পিক দৃষ্টি ওই প্রতিবিম্বে দেখে অতীত মানুষের গোপন পাপ ও ভোগের চিত্র। *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় ঘটনাদৃশ্য চিত্রিত হলেও কথনরীতির মাধ্যমে তা স্ফূর্ত, ব্যাখ্যাত ও বয়নকৃত। চিত্র ও কথনের দ্বিমুখী গতি উপন্যাসটির রূপকল্প। এরকম শিল্প-আঙ্গিক লক্ষণীয় তাঁর *অরণ্য-বহ্নি* [১৯৬৬] উপন্যাসেও—যার পটভূমি সাঁওতাল বিদ্রোহের [১৮৫৫] ইতিকথা—পটচিত্রকে কথনরীতিতে সংযুক্ত করে tribal heroism। এর রূপাখ্যান গড়ে তোলা হয়েছে,- এসব উপজাতি আবার ভারতীয় জাতিসত্তার সংলগ্নধারা।

প্রস্তাবনা রূপে যে দৃশ্য তা ভারতীয় গ্রামজীবনে সামন্তবাদের আরম্ভকালের ইঙ্গিত; সুরেশ্বরের অঙ্কিত প্রথম চিত্রটিতে রয়েছে একটি বিবাহদৃশ্য [বিবাহ এ-উপন্যাসের বিশেষ প্রতিরূপক], রায়বংশের প্রথম সামন্ত সোমেশ্বর রায়ের বিবাহ [কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পুত্র]; দৃশ্যটিতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সূত্র ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রতীকায়িত, দৃশ্যটি :

একখানি গ্রাম্যপথের। তবে গোটা গ্রামের আভাস আছে। নদী আছে, বন আছে—গ্রাম আছে পটভূমিতে—ছবির সম্মুখে গ্রাম্যপথ, সেই পথের উপর একখানা পাল্কী। পাল্কীর ভেতর বর আর বধূ—বরের হাতে একখানা গুটানো কাগজ। পিছনে গ্রাম্যনরনারী। [দ্রষ্টব্য : *তারাশঙ্কর রচনাবলী*]

রায়বংশের প্রথম জমিদারের কীর্তিহাটের পত্তনিদলিল হাতে গ্রামপ্রবেশ তথা ভারতবর্ষের জনপদে ইংরেজ উপনিবেশের প্রবর্তন। বিবাহ-দৃশ্যটিতে আরো গভীর এক অর্থবাচকতা বিদ্যমান, এ-উপন্যাসে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বা দাম্পত্যসম্পর্ক প্রবৃত্তিগত ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগ বা ভালোবাসার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ ছক গঠন করে। এটি মিথপ্যাটার্নের মতোই পুনরাবৃত্তময় এবং বদ্ধনিয়তি ও মুক্তপ্রবৃত্তির চিরকালীন দ্বিত্বকে নির্দেশ করে। প্রতিটি ব্যক্তিই উপনিবেশবদ্ধ ইতিহাসঘটনার বাইরে তাদের স্ব-স্ব অন্তর্ভূমে প্রোথিত করে রাখে শাস্ত্রসম্মতির সঙ্গে বাসনার আবর্ত। তারাশঙ্কর শাস্ত্র বা সমাজের বদ্ধতাকে কেন্দ্রীয় সমস্যারূপে জিজ্ঞাস্য করেন না, স্বভাবের উদ্দামপ্রকাশকে দেন প্রেমশুদ্ধতা, প্রবৃত্তির অবিনাশী ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাবকে কখনো-বা গণ্য করেন রক্তীয় ধারা কিংবা নিয়তি হিসেবে। ফলে উপন্যাসটিতে ইতিহাসের অবতলে চলিষ্ণু ব্যক্তিস্বভাবের আদিবৃত্তির অজেয়, দুর্মর অস্তিত্ব ও তার ভয়ঙ্কর পরিণাম নির্দেশিত হয়েছে, এ-সূত্রে উপন্যাসধর্ম অনুযায়ী তারাশঙ্কর সন্ধান করেছেন ব্যক্তিস্বভাবকে, তার অস্তিত্ব ও সত্তার দ্বান্দ্বিকতাকে। এ-সন্ধান কুড়ারাম ভট্টাচার্য থেকে ধারাবাহিকভাবে বাহিত হয়েছে শেষ বংশধর সুরেশ্বর রায় পর্যন্ত।

ইতিহাসধৃত ব্যক্তিরূপে কুড়ারাম ভট্টাচার্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিশ্বস্ত অনুগ্রহভাজন গোমস্তা মুহুরি, সুকৌশলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন'-এর রন্ধ্রপথে অর্জন করেন কীর্তিহাটের জমিদারি। তার ঘটনাবহুল জীবন পলাশীর যুদ্ধসময়ের পরবর্তীধারায় প্রবাহিত। অন্তর্জীবনে তিনি নির্দ্বন্দ্ব, বৈষয়িক উন্নতির প্রচেষ্টায় চতুর ও আত্মসংকটমুক্ত ; মুসলমান বাঈয়ের সঙ্গে একত্র জীবনযাপনে একনিষ্ঠ, পরবর্তীকালে বিবাহ জীবনেও সুখী। তবে পুত্র সোমেশ্বর রায়কে ক্ষয়িষ্ণু রাজপরিবারের রূপবতী কন্যা কাত্যায়নির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে 'খেয়ালীপনা পাগলামির বীজ রায়বংশে ঢুকিয়েছিলেন কুড়ারাম রায়।...আদিমকালে ওইটেই ছিল জীবনধর্ম, জীব-ধর্মতো বটেই।' ইতিহাসের সময় সামন্তের উত্থান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করলেও রায়বংশগতিতে 'লুন্যাসি আর প্রতিভা'র যুগ্মধারা প্রবিষ্ট হয়েছিল জীবনধর্মের তথা জৈবধর্ম ও মৌলবাসনার মগ্নস্রোত থেকে। প্রতিটি প্রধান-প্রধান চরিত্রে শিল্পপ্রতিভা, সৌন্দর্য ও আদি প্রবৃত্তির উন্মত্তরূপটি বিদ্যমান, যা বহুগুণিত হয় সামন্তের ভূমিনির্ভর ক্ষমতা ও আভিজাত্যে। কীর্তিহাটে কাগুজে-ক্ষমতাস্বত্বে বলীয়ান জমিদারির শ্রেণীসত্তাই জৈবধর্মপ্রাবল্যের সঙ্গে ঘটায় প্রতিভা ও সৌন্দর্যের সংযোগ। এখানেই ইতিহাস ও পুরাণের তন্ত্রী বিজড়িত হয়ে পড়ে।

তারাশঙ্কর উক্ত প্রসঙ্গকে আরও বৈধ ও সংকেতবহ করেন কীর্তিহাটের জনপদে বসবাসরত গোয়ান ক্রিশ্চান সম্প্রদায় ও বৃহত্তর জনজীবনের প্রবাহ সংযোগের মধ্য দিয়ে। এই প্রবাহ আদিজীবন ধর্মের লক্ষণাত্মক—নারী ও ভূমি যার প্রতিভূ। সুরেশ্বরের অঙ্কিত চিত্রেও অন্ত্যজ শ্রেণী ও বৃহত্তর জনজীবনটি ব্যাপ্ত–পটভূমিরূপে অস্তিত্বশীল, তা ঘটনার মূলপটকে সংসক্ত করে এবং রায়বংশের সঙ্গে প্রেমজসম্পর্কে বা মোহবন্ধন রচনায় থাকে গভীরভাবে যুক্ত। এ-উপন্যাসের সময়চেতনার সূত্রও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত, যাকে আমরা অভিহিত করেছি মহাকাব্যিক বৃত্তাবদ্ধ সময়। অন্ত্যজ শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাকৃতরূপ ও কৃষিজীবীর জীবনধারণা ঐহিক জীবননিষ্ঠ সময়ানুভবের স্মারক, তাদের সময় যৌথ। সামাজিক দৈনন্দিন সময়কে যৌথতায় বিভক্ত করা হয় কৃষিশ্রমের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে বিজড়িত অবকাশযাপন ও উৎসব অনুষ্ঠানের ঋতুভিত্তিক পর্যায়ক্রমে। এবং এই সময়বোধ উৎপাদনমূলক সৃষ্টিপ্রবাহের সঙ্গে বিজড়িত বলেই জন্ম ও মৃত্যুর চক্র এখানে চেতনার নিয়ামক, ভবিষ্যৎ ও অতীত ঘটনার আবির্ভাব এখানে প্রত্যক্ষীভূত সত্য ; তবে তা পুনরাবৃত্তিতে বৃত্তময় ও রিচ্যুয়াল ক্রিয়াকলাপে হয়ে পড়ে বদ্ধ। আধুনিক উপন্যাস স্থানের মধ্যে সময়বীক্ষণকে দেয় ইতিহাসের বাস্তবতা আর মহাকাব্যের লক্ষ্য ছিল সময়ের একটি অন্তহীন প্রবাহের মধ্যে ব্যক্তি ও স্থানকে আবদ্ধ করে ফেলা। তারাশঙ্কর লোকবৃত্তে অনুস্যূত সময়ের সমান্তরালে উপস্থিত করেন সামন্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভিঘাত-সৃষ্ট বিচ্ছিন্ন সময়বৃত্তে বসবাসকারী ব্যক্তিজীবন ও যৌথ সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বপট। এ উপন্যাসে অন্ত্যজ মানুষগুলো নিয়ন্ত্রিত–শাসিত-শোষিত, আবার তারাই বিপর্যস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ করে সামন্তব্যক্তির ভোগ ও ক্ষমতাকে অর্থাৎ কাহিনীর সম্মুখগতিকে করে আন্দোলিত। উপনিবেশতন্ত্রে প্রতিপালিত রায়দের তারা নিয়ে যায় সহস্র বৎসর ধরে প্রবাহিত জীবনপ্রবৃত্তির গুহায়, এক প্রাক-পৌরাণিক বৃত্তবন্দী আবর্তনে। সুরেশ্বরের শৈল্পিক. বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে প্রসঙ্গটি বিবৃত হয় :

> বিবিমহলের নিচেই কাঁসাই। তার ওপারেব জঙ্গলের মধ্য থেকে কাঁসাইয়েব কিনারায় এসে কতদিন ওরা দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়ে যায়—তিলেক দাঁড়াও হে নাগর।...তাদের অর্ধনগ্ন দেহে সাঁতার দিতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য যেন জগতের আদিম যে ঊষায় পুরুষ এবং প্রকৃতি নব এবং নারীরূপে এসে দাঁড়িয়েছিল সে ঊষাকে প্রত্যক্ষ করেছি।...ওদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছেটা ঠিক কথা নয়, ঠিক কথাটা হল 'বাসনা'।...নদীর জলে তখন বিকেলের হলদে রোদের ছটা পড়ে রঙিন ঝকমকানি উঠছে। কাঁসাইয়ে জোয়ার আসে নীচের দিকে, এতদূর আসে না। ওপারের বন উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। পাখির ডাক উঠছে প্রচুর। কল-কল, কল-কল। কিচি-মিচি। কিন্তু সব আমার কাছে নিঝুম মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর সমবেত কণ্ঠের গানের অভাবে আর হাসির খিলখিল শব্দের অভাবে। এবং মনে হচ্ছে সামনের ওই ছবিটা শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড, কটা মেয়ের ছবির অভাবে অসম্পূর্ণ।

কীর্তিহাটের কড়চা-য় নারীর প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ও মুগ্ধতা প্রধান মোটিফ। বিবাহিত স্ত্রী ও প্রেমিকা এই দ্বৈতপরিচয়ে নারী হয়ে ওঠে পুরুষের আকর্ষণ-বিপর্যয়ের

কেন্দ্রশক্তি। নারীসঙ্গ বাসনায় দগ্ধীভূত চরিত্রের উন্মত্ত-রূপ ও হত্যাপাপ এ উপন্যাসে বিধৃত হয় elemental force of life হিসেবে। প্রথম পুরুষ কুড়ারাম ভট্টাচার্য মুসলমান বাঈয়ের সঙ্গে জীবন যাপন করে। দ্বিতীয় পুরুষ সোমেশ্বর রায় বামাচারী তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের সাধনসঙ্গিনী উন্মাদিনী মনোরমাকে অধিকার করার উদ্দেশ্যে শ্যামাকান্তকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তৃতীয় পুরুষ বীরেশ্বর রায় স্ত্রী ভবানীর প্রতি তীব্র প্রেম সত্ত্বেও সন্দেহ পোষণ করে ও স্ত্রীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়, তার জীবনের ভোগ চরিতার্থ করে সোফি বাঈ ; চতুর্থ পুরুষ রত্নেশ্বর রায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সামন্ত জমিদার, সংযমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও ধর্মনিষ্ঠ হয়েও অঞ্জনা নাম্নী নারীর প্রতি রুদ্ধ আকর্ষণবশত মনোজগতে প্রতিমুহূর্তে রক্তাক্ত, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। পরবর্তী দেবেশ্বর রায় ইংরেজি শিক্ষিত কলোনিয়াল নব্যজাগরণে উদ্বুদ্ধ-চিত্ত, তারুণ্যে প্রোজ্জ্বল, রোমান্টিক জীবনতৃষ্ণায় চঞ্চল, শিল্পচর্চাকারী ; সেও ক্রিশ্চান নারী ভায়োলেটের প্রতি মনোদৈহিক আকর্ষণে বিপর্যস্ত। ষষ্ঠ পুরুষ যোগেশ্বর রায় কলকাতাবাসী আধুনিক পুরুষ, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও উচ্চশিক্ষিত, সে চন্দ্রিকা মালহোত্রার মোহে স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগী। শেষ প্রজন্ম সুরেশ্বর রায় প্রথমে বিপ্লবী, পরে বোহেমিয়ান চিত্রশিল্পী, আধুনিক আত্মসচেতন প্রগতিশীল নারী সুলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েও ঘটনাসূত্রে ক্রিশ্চান কুইনীর সঙ্গে অদম্য আকর্ষণে বিজড়িত হয়ে পড়ে। নারী চরিত্রসমূহ এখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হয়েও পৌরাণিক সংস্কার চেতনায় বিমণ্ডিত ; নারী সম্পর্কিত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রটি হচ্ছে :

> মেয়েরা দুর্জ্ঞেয়...। নারীপ্রকৃতির আদিম স্বরূপ নাকি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রির অন্ধকারকে একসঙ্গে জমিয়ে তৈরি হয়েছে। ওকে জানা যায় না। নারীও বোধ হয় নিজেকে নিজে জানে না।...নিজের অন্তরের দিকটা থেকে সে মহারাত্রির মত নিবিড় অন্ধকার। সে জানে না সে কি চায়, বোঝে না কেন সে কাঁদে, কেন সে হাসে।

বংশপরম্পরায় নারীর দেহকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রক—শক্তি পুরুষকে নিয়তি-তাড়িত করে, এই দেহবাদ ধর্মশক্তি ও সম্পদভোগের পরিপুষ্টিতে দুর্দমনীয় রূপ পায় ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় ; 'রায়বংশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে ধর্মশক্তি ও সম্পদের লালনে এই দেহবাদ দুর্দান্ত-দুর্দমনীয় শক্তি হয়ে রক্তের মধ্যে' মিশে থাকে। ভূমিস্বত্বাধিকারের বংশানুক্রমিক আধিপত্যবাদ এই শক্তিকে দেয় প্রবলতা,

> পৃথিবীতে যাহারাই ভূমির স্বামীত্ব ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফসল ও ফল ভোগ করে, তাহারাই সেই ভূমিশ্রেষ্ঠ রূপবতী নারীর অধিকার পাইয়া থাকে।...কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভূম্যধিকারীর এই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই বা হইবে না।

সুরেশ্বরের অঙ্কিত চিত্রে নারীর উক্ত পৌরাণিক মহাপ্রকৃতি-রূপটিই মুখ্য ; তবে জীবনের এই আদিস্বভাব দ্বারা তাড়িত হয়েও সুরেশ্বর ব্যাখ্যাপ্রদানে হয়ে ওঠে ইতিহাস সচেতন, বিশ্লেষক ও আত্মসমালোচক। তাঁর এই ব্যাখ্যায় রয়েছে উপন্যাসোচিত জীবনচিন্তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী আধুনিক বৈশিষ্ট্য :

নারীকে তো ভয় নয় রায়বংশে ভয় বরাবর নিজেকে। ধর্মসাধনা আর ভূমির আধিপত্য করতে গিয়ে, নরনারী দেহমিলনের মধ্য দিয়ে প্রেম চেতনাটুকু বিসর্জন দিয়েছেন, নয়তো প্রকৃতি-শক্তিকে আজ্ঞাবাহিনী ক্রীতদাসীর মত আয়ত্ত করবার জন্য শ্মশানে যে যজ্ঞ করেছিলেন, তাতেই আত্মাহুতি দিয়েছেন।...

একখানা এক একর জমির ধানে যে সব মানুষের সারা বছরের অন্ন জোটে একটি নারীর প্রতি প্রেমে যে মানুষের তৃষ্ণা মেটে সে মানুষের দল থেকে পৃথক আমি, স্বতন্ত্র আমি। তারাই সভ্যমানুষ, তারাই দেবত্বের অধিকারী। রায়বংশ ধর্মকে আশ্রয় করে বর্বরতায় ফিরে গেছে, আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে, সম্পদকে আশ্রয় করেও তাই সেই আদিম অরণ্যযুগে ফিরে গেছে।

ইতিহাসের নিয়মে সামন্ত রায়দের নারী-বাসনা ইন্দ্রিয়ভোগের বিবর্তন পথ অতিক্রম করে সুরেশ্বরে এসে উত্তীর্ণ হয় ভালোবাসাপূর্ণ দাম্পত্য জীবনে। বহুভোগময় জীবন যা নারীর প্রতি নরের চিরায়ত ক্ষুধায় সংসক্ত, তা পরিত্যাগ করে সে কুইনীকে আত্মমর্যাদা ও প্রেম-চৈতন্য দিয়ে গ্রহণ করে। এ-পরিক্রমা ও উত্তরণে প্রকট হয় প্রবৃত্তির উদ্বর্তন, মানবপ্রবৃত্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসগতিতে চেতনার স্বীকৃতি। বিপরীতভাবে এসব নারীর মধ্যেই উপস্থাপিত হয় ধর্মনিষ্ঠ, সতীসাধ্বী ভারতীয় নারীর মডেল—গার্হস্থ্যবন্ধনে স্বামীভক্তিতে অটলচিত্ত নারীর সততা। তবে এসব নারীই *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় জীবনের করুণ পরিণতির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকে বঞ্চিত, দুঃখময় জীবনের শিকার, তারা পুরুষের নির্মম ঔদাসীন্য ও ভোগ-ভালবাসার পটে সমভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাই দেবেশ্বরের প্রেমিকা ভায়োলেটের করুণ পরিণতি ও স্ত্রী সরস্বতীর মৃত্যু কালের পটে ঐকিক।

উপন্যাসের পরিণতিপর্বে রেজারেকশনের মত নতুন অর্থময় দাম্পত্য জীবন যাপন করে শুধু সুরেশ্বর ও কুইনী। সেখানেও জীবনের এক পর্যায়ে সম্পদআইনের জটিলতায় উভয়ের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, শেষে স্বামী ও তার ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সূত্রে কুইনী রূপান্তরিত হয় 'সাবিত্রী' নাম-প্রতীকতায়। প্রথমটি ইতিহাস, দ্বিতীয়টি পৌরাণিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা। প্রবৃত্তিগত সংঘাত থেকে মানসদ্বন্দ্বের দিকে এ-উপন্যাসের গতিমুখ রচিত হলেও প্রবৃত্তিই চালিকা শক্তি—যা আমাদের আধুনিক চিত্তেও সমভাবে জাগরূক।

তিন

ঔপন্যাসিক দুটো স্তরে পৌরাণিক-ঐতিহাসিক সূত্র উত্থাপন করেন, এক. অনার্যজাতির সংগ্রাম ও অধিকারের প্রশ্ন, দুই. তন্ত্রসাধনার বিকৃতি ও ভ্রষ্টরূপ তথা ধর্মসংস্কার জিজ্ঞাসা। ইতিহাস-পূর্ব সরণি বেয়ে অন্ত্যজ-অনার্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কীভাবে বিজড়িত হয়ে যায় আর্য ও বহিরাগত গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে, তার বিনির্মাণ তারাশঙ্করের প্রিয় ও স্বকীয় মোটিফ। আলোচ্য উপন্যাসে আদিস্বভাব-বৃত্তি ও ইতিহাসভুক্ত ঘটনাবলি শ্রেণীচেতনাধর্মী বৃত্ত গঠনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মহাকাব্যিক

স্বভাব অর্জনের প্রকল্পনা গড়ে তোলে। এই প্রকল্পে অন্তঃস্রোতরূপী অন্ত্যজ জীবন ছাড়াও তন্ত্রসাধনায় সংস্কার রূপটি হয়ে ওঠে তীব্র।

শক্তিসাধক শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে ছিল প্রতিভাবান সংগীতবিদ, পরে শক্তিদেবীর প্রত্যক্ষদর্শন লাভের কুহকে আচ্ছন্ন, আত্মপীড়নগ্রস্ত ও বামাচারী। এর বংশগতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে রায়বংশের ধারা হয়ে ওঠে একইসঙ্গে প্রতিভান্বিত কিন্তু জটিল ও অভিশপ্ত, বিশেষত হত্যাপাপের মত আদিপাপ সংঘটিত হয়,

> ধর্মের পাপ এই শ্যামাকান্তের। আর সম্পদের পাপ সোমেশ্বরের। মাতৃবংশ আর পিতৃবংশ। রত্নেশ্বর রায় থেকে দুই পাপ যুক্তধারায় চলে আসছে রক্তের স্রোত ধরে পুরুষানুক্রমে ধারা রেখে। ওইখানেই ব্যাধির মূল।

অর্থাৎ এপিসোড নির্মাণে তারাশঙ্করের ত্রয়ীক্ষেত্র—রায়বংশের বীর্যবত্তা-সমৃদ্ধি-মহত্ত্ব-পাপ ও নারী-ভূমিদখলের বিসর্পিল গতি ও ঘূর্ণাবর্ত, প্রতিভা ও শক্তিসাধনার বিকৃতিজাত ভয়াবহ পরিণতি এবং অন্ত্যজ ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যচেতনা, শ্রেণীসংঘাতময় জীবন, এষণার সমান্তরালে ক্রমজাগ্রত ভারতীয় জাতিতত্ত্বের আধুনিক সংজ্ঞার্থ সৃষ্টিতে সামন্ত-মধ্যবিত্ত–ভূমিজীবীর শ্রেণীভিত্তিক অন্তদ্বর্ন্দ্ব। তিনটি প্রান্ত সম্মিলিত হয়েছে ইতিহাসের কম্বুরেখ গতিধারায়, কিন্তু রূপায়িত হয়েছে বৃত্তধর্মী গঠনকায়ায়। কালনির্দিষ্ট সময়বিন্দু থেকে উপন্যাস আরম্ভ ও শেষ হলেও মূলত এর ঘটনাক্রিয়া আদিঅন্ত্যহীন, পরিক্রমণধর্মী। বৃত্তের যেমন কেন্দ্র ও পরিধি আছে অথচ নেই আরম্ভ ও সমাপ্তি, তেমনি *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট কেন্দ্র, পরিধিতে আছে জমিদারতন্ত্র ও সংলগ্ন মানুষজন, উপনিবেশপটের আইনব্যবস্থা ও ভূমিস্বত্ববিষয়ক জটিলতায় আকীর্ণ জনপদের বিপর্যয় চিত্র। কিন্তু সব ঘটনাই বৃত্তবদ্ধ ও চক্রাবর্তে নিপতিত। চরিত্রের স্বভাব এবং দৈহিক অবয়বের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে গ্রন্থকার আমাদের ধ্যানধারণার দেশীয় মডেলের প্রাচীন ধারা যেন উপন্যাসের ফর্মে যুক্ত করে দেন। একটি মানব বা মানবী পূর্ববর্তী চরিত্রের সাদৃশ্যবহ অথবা পূর্ববর্তীরাই যেন পরবর্তী ধারায় ফিরে আসছে। এরকম কল্পনা ভারতীয় কাহিনীবৃত্তের বৈশিষ্ট্য তথা রিচুয়াল–নির্দেশিত। ভবানীর অনুরূপ অর্চনা, দেবেশ্বরের সদৃশতা বহন করে সুরেশ্বর. যোগিনী মনোরমা ফিরে আসে অঞ্জনার প্রতিমূর্তিতে ; আবার প্রতিটি জীবনেই অভিনীত হচ্ছে সম্পদ ও নারীকেন্দ্রিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ইতিহাসে এভাবে একই ব্যক্তি বা ঘটনার পুনরাবির্ভাব ঘটে না।

তারাশঙ্করের ইতিহাসচেতনায় পৌরাণিক সংস্কার ও প্রতীতি সংগুপ্ত, ভারতীয় শক্তিসাধনার প্রত্নরূপের প্রভাব লক্ষণীয়,

> ইতিহাসের একটা চক্রযন্ত্র আছে, তাতে অতীতকাল দাঁতওলা চাকার মত বর্তমানের চাকার গর্তে গর্তে ঢুকে নিজের সঙ্গে যুক্ত রেখে মানুষের জীবনকে চালায়। অতীতের কর্ম কর্মফল হয়ে তার আস্বাদ বর্তমানকে আস্বাদন না করিয়ে ছাড়ে না।

মহাকাব্যের মতোই কেন্দ্রচ্ছিন্ন, বিপরীতমুখী, উপকাহিনীবহুল ঘটনাবৈচিত্র্য ও কর্মফলের বৃত্তায়নে এই উপন্যাস অন্তর্গঠিত। সময়ের দ্বিমুখী বৈপরীত্যের টানে *কীর্তিহাটের কড়চা*-র ঘটনাকাল হয়ে ওঠে বহুত্ববাদী স্বরসংযুক্ত—অতীতকালের স্বর, বর্তমানের কথক ও চরিত্র সুরেশ্বরের ভাষ্য-ব্যাখ্যা, পার্শ্বচরিত্রের সংলাপ এবং লেখকের আত্মস্বরের সমবায়ে উপন্যাসটির উচ্চারণ হয়েছে বিবিধমাত্রিক। তবে এসব বিন্দুবদ্ধ থাকে একটি তাৎপর্য-নির্মাণে তা হল পুরানো জগচ্চিত্র–ধ্বংস ও তার গর্ভজাত নতুনের উত্থান, যাকে বলা যাবে পুনরুত্থান মাত্র। তাই সুরেশ্বরের ব্যক্তি-অবস্থান ও জীবনাভিজ্ঞতা মিশে যায় পুনরুত্থানের চক্রাবর্তে, কিন্তু ইতিহাসচেতন সুরেশ্বর এর মধ্য দিয়ে অর্জন করে জীবনবীক্ষা :

> ইতিহাস পুরানো ধারাকে বদলে নতুন ধারা আনে কিনা জানি না, তবে নতুন একটা চেহারা নেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটা ধারা আছে। সেটা তার মনের ধারা চিন্তার ধারা থেকেও আরও গভীরে বইছে। সে এই চেহারা বদলেই তুষ্ট হয় না। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। পরিণাম আর পরিণতিতে তার বিশ্রাম নেই. পূর্ণতার জন্যে সে জন্মজন্মান্তর ঘুরছে এইটেই তার বিশ্বাস। এদেশে সেই বিশ্বাস আজও সমান দৃঢ়, তা আমি অনুভব করছি বলেই এমন না হয়ে আমার উপায় ছিল না। গোটা রায়বংশের সাতপুরুষের সংগ্রাম আমার এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে ঘটে গেল।

কীর্তিহাটের কড়চা-য় সুরেশ্বরের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মানুসন্ধানের প্রতিরূপক উদ্ভাসিত ; জীবনকে পরিগ্রহণের চেয়ে জীবনের অতীতসন্ধানেই সে অধিক সংলিপ্ত। মিথকথার নায়কের অভিযান আর আত্মসন্ধানের মতোই সে পিতৃপুরুষের জগৎ উন্মোচনের জন্য প্রত্যাবর্তন করে কীর্তিহাটে তথা উৎসকেন্দ্রে। মিথনায়কের চলাচল স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী, অপরিচিত স্থানে। আধুনিক মানুষমাত্রেই স্বস্থানকালে আবদ্ধ, শুধু নিজের অন্তর্বিশ্বে সে অচেনা ; বদ্ধস্থানকাল থেকে সে পলায়ন করতে পারে না, এই পরিমণ্ডলেই তাকে সন্ধান করতে হয় আত্মপরিচয়ের শিকড় ও ব্যক্তিতা পুষ্পায়নের যোগ্য প্রতিবেশ, এমনকি বিনাশেরও কার্যকারণ। সুরেশ্বর কীর্তিহাটের বর্ণহিন্দু সমাজের অন্তর্গত অথচ ব্যক্তিসচেতনতায় ইতিহাসসন্ধিৎসু : তার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যায় বাঙালির জাতীয় আত্মানুসন্ধান ও জাতীয় অভ্যুত্থানের ঘূর্ণিপাক। তার সমস্যা জীবনকে পরিগ্রহণের ও তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের—যে-জীবন ইতিহাসবদ্ধ, স্ব-চৈতন্যে অনুভূত ও প্রশ্নকন্টকিত এবং প্রতিমুহূর্তে দ্বান্দ্বিক। মহাকাব্যের প্রাচীন নায়কের ছিল মৃত্যুবরণের সংকট, ধ্বংস বা বিলয়ের মধ্য দিয়ে সমাধানে উত্তরণ ; কিন্তু আধুনিক নায়ক জীবনের দায়ভার বহনে ধ্বস্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ, বিদীর্ণ। সুরেশ্বর পিতৃপুরুষের পাপ ও অভিশাপের দণ্ডভোগ ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপনীত হতে চায় ন্যায়ের বৃন্তে—আধুনিক হিউম্যানিজমের প্রত্যয়ে সে অধিশ্রিত। অতীতের স্খলন-পতন-ত্রুটি ও একইসঙ্গে প্রবৃত্তির অন্ধতামস পেরিয়ে আলোকাভিসারী সুরেশ্বরের প্রতিপাদ্য :

> কত যুগ কত কাল কত জন্মান্তর পার হয়ে মানুষের দেহের মধ্যে জীবন এসে শুধু অমর হতেই চায়নি আরণ্য অন্ধকারের অন্যায় থেকে ন্যায়েও আসতে চেয়েছে।

তবে এ-সন্ধান আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনাপ্রবাহরীতির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আত্মিক সন্ধানকে প্রাতিস্বিক করে না। সুরেশ্বর নিজ সমাজবন্ধনের সঙ্গে সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে কৌমনায়কত্ব থেকে পরিণত হয় সর্ববর্গের নায়কে তথা ইতিহাসের চরিত্রে ; কুইনীকে বিবাহের মধ্য দিয়ে সে সামাজিক দাম্পত্য সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়, এমনকি পরিত্যাগ করতে চায় সামন্তিক অর্থসম্পদ। 'কীর্তিহাটের বাড়ি ধুলোয় মিশে' যাওয়ার যবনিকাপাতে সুরেশ্বর আত্মমুক্তিতে, ভারতীয় জাতিচেতনার মহাবর্গে অন্বিত হয়। জাতিত্ব নির্মাণের সংঘাত ও কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখা মহাকাব্যের অভীপ্সা, *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় হিন্দুমুসলমানক্রিশ্চান সমবায়ে একটি মহাজাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রত্যয়ীভূত করা হয় সেইসব চিরায়ত, মৌলিক সূত্র যা সর্বজনীন ও সর্বকালীন। মহাজাতির মূল ভিত সেবা, সহমর্মিতা ও সহাবস্থান। কিন্তু বিশ্বজনীনতা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর জাতি-সংস্কৃতির প্রাথমিক বন্ধনরূপ হিসেবে ধর্মাশ্রয়ী শাস্ত্রানুষ্ঠানকে দেন মুখ্য ভূমিকা। এ উপন্যাসে তাই occultism প্রবল, কিন্তু আধুনিক ব্যক্তি মানুষ transcendentalism-এর সন্ধানী। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্নসংস্কার-সঞ্চালিত বলেই দীর্ঘায়ত উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে পৌরাণিক প্রতীতি ও পদ্ধতির অন্তঃশীল সম্প্রকাশ। এখানে শ্যামাকান্তের ঈশ্বরীসন্ধান তীব্র শক্তি নিয়ে উপস্থাপিত, মহাকাব্যের পতিত ও বিপথগামী নায়কসদৃশ এই শ্যামাকান্ত বিকৃত, বীভৎস ও শরীরী যন্ত্রণায় জর্জরিত ; ভবানী চরিত্রেও ভারতীয় ধর্মসংস্কারের শক্তি তার ব্যক্তিগত সংগীতপ্রতিভার ঊর্ধ্বে প্রতিস্থাপিত যা অনেকাংশে অলৌকিকত্ব-মণ্ডিত। এ উপন্যাসে প্রতিটি মৃত্যুদৃশ্য সংস্কারাচ্ছন্ন আবহে বর্ণান্তরিত, এমনকি ইতিহাসপ্রান্তে অবসিত সুরেশ্বরের শেষকৃত্যানুষ্ঠান শাস্ত্রাচার সম্মতির তাৎপর্যমণ্ডিত প্রতীক। তবে সার্বিক অর্থে উপন্যাসের জীবনবীক্ষায় রূপায়িত হয়েছে ব্যক্তিপ্রবৃত্তির প্রমুক্তি, নৈতিক মূল্যচেতনার প্রতিষ্ঠা এবং নির্দিষ্ট দেশকাল-ঘটনার ক্রমিক বাস্তবতা। কোন বিমূর্ত ভাবলোক, রূপক-অন্বেষা বা দর্শন-প্রতর্ক প্রস্থানে চরিত্রের সমাপ্তি ঘটে নি, প্রাচীন ভারতীয় জীবনকাঠামো ও বহির্শক্তির সংস্পর্শ-সংঘাত বলয়ে ধর্মচিন্তাধৃত মানবকল্যাণ ও গোষ্ঠীবন্ধনই এখানে দৃঢ়মূল। অধ্যাত্ম-বিভূতির ভাবলোক মহাকাব্যেরও আধেয় ছিল না, গোষ্ঠী বা জাতির জীবনে ঘটনাক্রিয়া ও মানবনিয়তির পরিণাম–দর্শনই ছিল মুখ্যপ্রেরণা। আলোচ্য মহাকাব্যতুল্য উপন্যাসে প্রতিফলিত নৈতিকতার ধারণা ও আর্থসমাজকাঠামোধৃত শাস্ত্রসম্মত জীবনরূপই জিজ্ঞাস্য হয়েছে উত্তরঙ্গ-ইতিহাসঘটনায়। এই ইতিহাসও আবার মহাসময়বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, ফলে বৃত্তগঠনে সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের ক্রম ও পুনরুত্থানের কাঠামোটিই অনুসৃত; সম্প্রসারণশীল, অসমাপ্ত ও প্রতিমুহূর্তে নতুনের আবির্ভাব—এ-রকম ভাবনা থেকে উপন্যাসটি মুক্ত। জীবনমঞ্চ থেকে চরিত্রের বিদায় অথবা সুরেশ্বর–পুত্র মানবেশ্বরের নতুন কালপর্ব নিয়ে উত্থান প্রতিরূপকমাত্র—পুনরায় ইতিহাসের কালপৃষ্ঠে জীবনের সূচনা-স্থিতি-বিলয়ের সংকেত—অথবা একে বলা যেতে পারে বুদ্ধিমার্গ, চৈতন্য-উত্তরণ ও আধুনিক

অন্তর্বিশ্লেষী চিত্তকোষে স্তরীভূত সংস্কার-সম্মোহ প্রত্নস্মৃতিতরঙ্গ ও মৌলবাসনার প্রতীকায়ন।

চার

বস্তুবৈচিত্র্য, খণ্ড-বিখণ্ড জীবনরূপ গ্রন্থনার ঐক্যবদ্ধ কায়ানির্মাণ, অতীত গৌরববোধের উদ্দীপনা, সনাতন ও অপরিবর্তনীয় প্রতীতির মায়াজাল ইত্যাদি মহাকাব্যিক রূপধর্ম *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় তৈরি করেছে মিশ্ররীতির বুনট। আধুনিক মনস্তত্ত্বে ব্যাখ্যাত লিবিডো এখানে হয়ে ওঠে দৈবী প্রভাব ও নিয়তি, তেমনি নানাবিধ অলৌকিকত্বে, সমাপতনে ঘটনাক্রিয়া হয়ে যায় বাস্তব-দূরবর্তী। পাশ্চাত্য মডেলরূপী বাংলা উপন্যাসের রীতিক্রম ভেঙে সৃষ্ট হয় দেশজরূপের স্বাতন্ত্র্য ; এরকম প্রচেষ্টা রয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস*-এ, দেশজ আখ্যানের মধ্যে আধুনিক মাত্রার অন্তঃসার সংযোজনায় এ-রচনাটি একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আবহ ও প্রকৃতির অনুরূপ ঘটনাংশ ও মানবরূপ একইসঙ্গে দৈবী ও গৃহগত ; কিন্তু এর দেশজ ধরনটি ধ্রুপদী মহাকাব্য *রামায়ণ* বা *মহাভারত* সদৃশ নয়। দেশীয় আখ্যানধর্মের অনুসৃতিতে তারাশঙ্কর গঠন করেন শিথিল আত্মসন্দর্ভ, গায়ক-কথকের মিশ্রকণ্ঠ, আবার সেই কণ্ঠে প্রবিষ্ট হয় অন্যচরিত্রের স্বর ও গ্রন্থকারের উচ্চারণ। মহাকাব্যের মতো কেন্দ্রানুগ, সুনির্দিষ্ট বিধি এতে অনুপস্থিত, কেন্দ্র এখানে অতিনিরূপিত বা শাস্ত্রনির্ধারিত নয়। নারী বা সম্পদভোগের যে-কেন্দ্র এর আশ্রয়, তা শৈথিল্যে এলায়িত হয় শ্যামাকান্তের তন্ত্রসাধনায়, দেবেশ্বরের রোমান্টিক জীবনতৃষ্ণায়, সুরেশ্বরের শিল্পিসত্তায়, সর্বোপরি রচয়িতার আত্মপ্রক্ষেপে। ফলে সময়ধারণা, বর্ণনরীতি ও সন্দর্ভ-নির্মাণের বিমিশ্র প্রযুক্তিতে উপন্যাসটি রূপান্বিত হয়, এর বিচিত্র ক্যানভাসে ধৃত হয় বর্তমান-অতীতের চলাচল-পথ, ব্যক্তি ও জাতির মর্মস্বরধ্বনি, ইতিহাস ও পুরাণের দ্বিত্ব এবং জীবনের সঙ্গে দূরত্ব রচনার শৈল্পিক তন্ত্র। সুরেশ্বর ব্যক্তি-অস্তিত্বের দিক থেকে এই জীবননাট্যেই অন্তর্লীন অথচ চিত্রশিল্পী হিসেবে অতীতের কথক-রূপে নৈর্ব্যক্তিক, দূরত্ব-রচনাকারী আত্ম ও অপরকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সে জীবনকে প্রদান করে দৃশ্যময় বাস্তবতা। তার কণ্ঠই এ উপন্যাসের ক্রনোটপ—যেখানে বাঁধা পড়েছে ঘটনার গ্রন্থি ও কালের চঞ্চল গতি। গ্রন্থকারের অবলম্বিত মিশ্র পদ্ধতির প্রভাবে দৃশ্যময়তা ও বর্ণনাধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আধুনিক চিত্রকলার প্রকরণ। কালপরিধি, ঘটনাসূত্র এবং চরিত্র উপস্থাপনার দাবিতে মহাকাব্যিক বিস্তারধর্মী বর্ণনা, বস্তুপ্রাধান্য ও ডিটেইলস বিন্দুবদ্ধ হয়ে পড়ে ইম্প্রেশনিস্টিক অভিভাবে ; চিত্রী সুরেশ্বরের দৃষ্টিকোণেই প্রযুক্ত হয় রঙরেখার তাৎপর্য। ফলে এ উপন্যাসের জীবনবিশ্লেষণ সুরেশ্বরের ব্যক্তিক দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়ে মূর্ততা পায়, একে বলা যেতে পারে কথকতা ও অঙ্কনরীতির দ্বৈতরূপ। চিত্রের স্থানমাত্রায় সময়ধৃত চরিত্রের স্বরূপ অঙ্কনের একটি দৃষ্টান্ত :

দেবেশ্বরের মুখে সেই বিষণ্ন বিচিত্র হাসি। ...বাঁদিকটা কালো অন্ধকারে ঢাকা হতে হতে ফিকে হয়ে লাল হয়েছে, রাত্রির পর প্রভাত হবে, সূর্যোদয় হয় নি। লালচে আভার সবটাই এসে পড়েছে দেবেশ্বরের মুখে। কালো অন্ধকারের মধ্যে নির্বাপিত রত্নেশ্বর রায়ের চিতা। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী শেষ হয়ে গেল। দেবেশ্বর নাইনটিয়েথ সেঞ্চুরীর শেষকৃত্য করে দুফোটা চোখের জল ফেলছেন। সামনেটা টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী, একশো বছর। দেবেশ্বরের হাতে তুলি—তিনি রায়বংশে তাঁর জীবনশিল্পের পত্তন করতে চাচ্ছেন। হাতের তুলি কাঁপছে।

কালানুক্রমিক ঘটনাদৃশ্যের পর্বান্তর নির্দেশে চিত্রকলার ব্যবহার এ উপন্যাসে পৌনঃপুনিক ; একটি প্রতীক-দৃশ্য :

সুরেশ্বরের মনে ছবির কল্পনা জেগেছিল। তিনখানা ছবি। বা একখানাতেই তিনজনের ছবি—লর্ড ডালহৌসির সামনে নতজানু বীরেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবি।

কংগ্রেসের ঝাণ্ডা হাতে অতুলেশ্বর রায়। '...বিদায় বিপ্লব' পত্র হাতে সুরেশ্বর রায়।

ব্যক্তিচরিত্রের কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনাপ্রবাহ চিত্রকলার রঙে-রেখায় হয় ব্যঞ্জনাময় ও সংহত ; বীরেশ্বর রায়ের জটিল মনোজগৎ ও উন্মার্গগামিতা প্রকাশে তুলির প্রকরণ :

...এঁকেছি আবছায়ার মধ্যে। এটায় গাঢ় কালি দিয়ে, কালের যবনিকা টানিনি।

...আভাসে একটি নারীদেহ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ...তারই মধ্যে গাঢ়তর কালো রঙে আঁকা একটি পুরুষকে পাবে। দেখ। ওই বীরেশ্বর রায়। উন্মাদ। কালপুরুষের মত অট্টহাস্য হাসছেন।

তারাশঙ্কর এক পর্যায়ে ছবি আঁকায় মগ্ন হয়েছিলেন, দুটি চিত্রপ্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছিল একাডেমী অব ফাইন আর্টস, কলকাতায় ১৯৬৪ এবং ১৯৬৭–৬৮ খ্রিস্টাব্দে। *কীর্তিহাটের কড়চা* রচনাকালে ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা উপন্যাসটির আঙ্গিককে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে। এখানে ভারতীয় চিত্রকলার বিশিষ্ট ধরনটি মুখ্য ও অবলম্বিত, যা তাঁর দেশজ চিত্তভূমি থেকে প্রেরণায়িত। সুরেশ্বরের অঙ্কিত চিত্রগুলোর বর্ণাঢ্য-রূপ ও ফিগারে অন্তর্গ্রথিত থাকে 'আমাদের দেশের মন্দিরের খোদাইকৃত পোড়ামাটির কাজের মধ্যে কৃষ্ণলীলা রামলীলা ফোটানোর' আঙ্গিক-প্রকল্প। উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়ে এ-রীতি তৈরি করে 'পটভূমির কোলে দ্বিতীয় পটভূমি' এবং দৃশ্যচিত্রে ফুটিয়ে তোলে চলমান জীবন, উপমা-বয়নে আরোপ করে বর্ণরেখাধৃত কাব্যময়তা। কতিপয় উদাহরণ :

ক. জ্যোৎস্নার আবছা আলোর মধ্যে সে শিমুল গাছটার পত্রহীন শাখাগুলিকে আকাশের গায়ে ছবির মত দেখতে পেয়েছিল। নীল পটভূমিতে কালো রঙে এঁকে রেখেছে কোন শিল্পী। আর দেখতে পেয়েছিল ওই গ্রামখানায় এখানে-ওখানে জ্বলন্ত আলোকবিন্দু। বাড়ির নীচেই চৈত্রের কংসাবতীর স্বল্প জলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, জ্যোৎস্নার ছটা বহুদূর পর্যন্ত একটা গলিত রূপোর স্রোতের মত মনে হচ্ছিল, তারপর সেটা কালো কৃষ্ণাভায় ঢাকা পড়ে গেছে।

গ্রামপ্রকৃতি ও সুরেশ্বরের শিল্পিদৃষ্টির দ্বারা প্রসাধিত আবেগরূপ এখানে পরস্পরিত।

খ. নদীর জলে তখন বিকেলের হলদে রোদের ছটা পড়ে রঙিন ঝকমকানি উঠছে। কাঁসাইয়ে জোয়ার আসে নীচের দিকে।...ওপারের বন উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে। পাখির ডাক উঠেছে প্রচুর। ...কিন্তু

সব আমার কাছে নিঝুম মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর সমবেত কণ্ঠের গানের অভাবে আর হাসির খিলখিল শব্দের অভাবে। এবং মনে হচ্ছে সামনের এই ছবিটা শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড, কটা মেয়ের ছবির অভাবে অসম্পূর্ণ।

পশ্চাৎপট ও আত্মবিম্ব–দুয়ের বৈপরীত্য নির্দেশে চিত্ররীতির প্রয়োগ ঘটেছে।

গ. বিকেলের সে রাশি রাশি জমাট কালো মেঘের অবশেষ আর কয়েক টুকরো মাত্র জলে-ধোয়া আকাশে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পুবদিকে সোনালী রঙের পূর্ণচাঁদ একখানা বড় সোনার থালার মত নতুন বড়াশড়কের ওপাশে...ধীরে ধীরে আকাশে উপরে উঠছে।

মনোজাগতিক স্মৃতি-বিষাদ ও নিরপেক্ষ প্রকৃতি-দৃশ্যের চলমান রূপচ্ছবির সমান্তরাল উপস্থাপনা দৃষ্টান্তটির মূলব্যঞ্জনা।

ঘ. আকাশে মেঘ ফিকে হয়ে কাটতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে, রাঙা ছোপ ধরেছে, সে-ছোপ দ্রুত উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, নীচের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে লাল হয়ে পাটকিলে রঙে দাঁড়িয়েছে। মধ্য আকাশে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে নীল আকাশের টুকরো।

চলচ্চিত্রধর্মী দৃশ্যচিত্রণে প্রকৃতির বর্ণ-পরিবর্তন কাব্যময়তায় বিমণ্ডিত।

ঙ. দূর হইতে রায়বাড়ির চিলের ছাদ ও ছাদের আলসেগুলি নীল আকাশের গায়ে গ্রামের গাছপালার শ্যামশোভার ঊর্ধ্বে চিত্রবৎ শুভ্র শোভায় ঝলমল করিতেছে।'

চিরপ্রবহমান গ্রামজীবনপট ও সামন্তজীবনচর্যার মহিমা—দুইয়ের বর্ণপ্রতীক হচ্ছে যথাক্রমে শ্যামশোভা ও শুভ্রশোভা। মহাকাব্যিক বর্ণরূপের কালো ও আলো আলোচ্য উপন্যাসে বহু প্রসঙ্গের প্রতীকতা বহনে প্রযুক্ত, তবে ঔপন্যাসিক চিরায়ত জীবনপ্রবাহ–অভীপ্সু বলে ব্যবহার করেন সবুজ বর্ণ, যদিও তা বিশাল প্রকৃতি পটভূমিতেই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইতিহাসঘটনা ও ব্যক্তিচরিত্র বিনির্মাণের বিশেষ রঙ হচ্ছে কালো এবং আলো :

ঘন কালো মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূর্যের আভাসের একটি রজতশুভ্র রেখার মত অতুলশ্বের—

যে নতুন কালের বার্তাবহ। দুর্দমনীয় শক্তির জমাটবদ্ধ রূপ হিসেবে ব্রাত্যমানুষের প্রাণশক্তিকে ও প্রতিবাদকে প্রতিবিম্বিত করা হয় গোপাল সিং-এর অবয়বে,

গোপাল সিংহের ছবি নয়, সুলতা ; ওখানার—গোপাল বাংলার সেকালের দুধর্ষ প্রাণশক্তির প্রতীক। সে শক্তি স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু ওরই চাপে সাধারণ মানুষগুলো চাপ বেঁধে, জমাট বেঁধে একটা শক্তি ছিল।

উপমা নির্মাণে গ্রন্থকার মহাকাব্যিক বিস্তারধর্মী বস্তুবৈচিত্র্য ও ল্যান্ডস্কেপ ব্যবহার করেন—চরিত্রপ্রসঙ্গে অথবা ঘটনা-সূত্রে। কুড়ারাম ভট্টাচার্য—রায়বংশের স্থপতির উপমা, 'একটা প্রকাণ্ড গাছ ...। গাছটার কাণ্ডটায় একটা মানুষের দেহের আভাস।' সুরেশ্বরের জননীর চিত্রায়ণ, 'সংসার ও বিষয় এবং সুরেশ্বর এই দুটি তটের মধ্য দিয়ে সাগর সঙ্গমের অদূরবর্তী নদীর মত অনুচ্ছ্বসিতভাবে প্রবাহিত রেখেছিলেন নিজেকে।' অথবা বিমলাকান্ত সম্পর্কে বীরেশ্বরের সন্দেহ প্রবৃত্তির বর্ণনা,

সাপ। তাও গোখরো নয়। তেজের সঙ্গে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে গর্জন করে সাড়া দিয়ে আক্রমণ করে না। চিতি সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে নির্জীবের মত, মনে হয় ছেঁড়া দড়ির একটা তাল কি

ছেঁড়া লতার খানিকটা, অসতর্ক পদক্ষেপে মুখটা ছুঁড়ে দিয়ে আক্রমণ করে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়।

মানবজীবন ও ঘটনাবৈচিত্র্যের বিবর্তিত রূপকে বর্ণময়, প্রতীকী ও আত্মবিম্ব-প্রতিফলনে ঋদ্ধ করাই উক্ত চিত্ররীতির লক্ষ্য ; তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রকরণ-নিরীক্ষার নব-নব তাৎপর্য থাকে না, সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে আধুনিক একটি রূপবন্ধ প্রয়োগে তিনি এখানে বৈচিত্র্যসন্ধানী।

উত্তমপুরুষের জবানিতে বৃত্তান্ত পরিবেশিত হয়েছে, ফলে কথাবয়নের অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতা এখানে দ্রষ্টাচক্ষু সুরেশ্বরের, সে নিজেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে অপরের সত্তাকে। অপরসত্তার প্রকাশস্পৃষ্ট বর্ণন–রীতিটি গড়ে উঠেছে লেখক-পাঠক সংযোগের সূত্র ব্যবহারে, অপর ব্যক্তিবর্গের বাচন উত্থাপনে এবং সময়-স্বরের স্বকীয় উপস্থিতিতে। ব্যাপ্ত, উত্তুঙ্গ, ইতিহাস মানবের জীবনতৃষ্ণা *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় সমাশ্রিত হয়েছে বহির্তরঙ্গায়নে, কিন্তু অন্তর্পটে ব্যক্তির প্রাতিজনিক জীবনযন্ত্রণাই মুখ্যত অনুভাবিত। ফলে ক্লাসিকধর্মী ধারাবিবরণী অনুসরণে রচিত হয় সেই প্রবেশপথ ও বহির্গমন—যেখানে জীবনে ঢুকবার ও বেরোবার নাটকীয়তা ও অজ্ঞাত রোমান্সমূলক জীবন-যাপন বাসনা—দুটোই বিদ্যমান। নাট্যমুহূর্ত দ্বারা ঘটনা ও কালের সমান্তরাল ধারায় অতীত-বর্তমানকে স্থাপন করার একটি দৃষ্টান্ত :

অতীতের ঘটনা :

> তিনি সন্তর্পণে আসছিলেন একলাই। ...হঠাৎ এক সময় কে যেন ছায়ামূর্তির মত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে একেবারে তাঁর উপরেই আছড়ে পড়েছিল। ...কুড়ারাম পড়ে গেলেন। সেও পড়ে গেল। ...তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে বুঝেছিলেন সে স্ত্রীলোক। ...ফেলে চলে যাবেন ? যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দুঃসাহসী নব-যুবক কুড়ারাম এই রাত্রে নির্জনে এমন একটি বিচিত্র রোমান্স ত্যাগ করে যেতে পারেননি।

একই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর কাল-প্রবেশের ঘটনা :

> সুরেশ্বরের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। একটা মানুষের ব্যস্তত্রস্ত উচ্চপদক্ষেপের শব্দে। জুতো পায়ে দেওয়া বিংশ শতাব্দীর মানুষ। ছুটে চলেছে।
>
> কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে মোড় ফিরে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে তিনজন যেন তাকে ধরবার জন্যই ছুটছে। হয়তো একটু পরেই শোনা যাবে কোলাহল। কেউ কাউকে ছুরি মেরেছে অথবা দুজনেই দুজনকে মেরেছে। ফ্রী ইস্কুল স্ট্রীট এখান থেকে খানিকটা দক্ষিণে গিয়েই। এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—যখন ইংরেজের জীবন উদ্দাম হয়ে উঠে ফিরিঙ্গি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—সেই সভ্যতার রাজ্য বা সাম্রাজ্য। তার সঙ্গে আছে মুসলমান আমলের ওই কালের জের যে-কালে কুড়ারাম ভটচাজ ওই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

মানুষ ও কালপ্রবাহকে সমস্তরে উত্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে তারাশঙ্কর অতীত বর্তমানকে সংবদ্ধ করেন। প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দির পরিদর্শন–প্রাক্কালে সুরেশ্বরের ভাবনাসূত্র :

তার বাবাকে সে দেখেছে রায়বংশের প্রাসাদের একটি শ্বেতশুভ্র গম্বুজের মত মহিমায়। তাতে আকাশ থেকে অন্ধকারের কালি ঝরে কালো হয়ে যেতেও দেখেছে। তার চূড়ার কলসে কলঙ্ক ধরতেও দেখেছে। এখন চলেছে দেখতে আরও পুরনো এক গম্বুজ বা মিনারকে—যেটা ভূমিকম্পে ফেটে গেছে; ফাটলে ফাটলে সরীসৃপের বাস ; যেটার তলায় দাঁড়ালে যে-কোন মুহূর্তে খানিকটা ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা, যেটার রং বিবর্ণ হয়ে কদর্য—হয়তো বা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাস-বিবর্তনের পথটি প্রতীকায়িত হয় স্তম্ভ অনুষঙ্গে, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুষঙ্গটি ব্যবহৃত এবং অতীত ও বর্তমানের চলাচল-পথটি উন্মুক্ত :

১৮৫৭ সালে কুইনস ডিক্লারেশনের সময়, ডিক্লারেশন পড়ছেন কলকাতায় লর্ড ক্যানিং। মেদিনীপুরে পড়ছেন ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা প্যান্ডেলের তলায়। প্যান্ডেল নয় সেটা, ছাদই হবে। ছাদের তলায় মোটা মোটা সারিবন্দী থাম। থামের পায়াগুলো মোটা পাথরের সেগুলো এক-একটা জমিদারী এস্টেট। আর থামগুলো শক্ত পাথরে খোদাই মানুষের মূর্তি। তাঁরা জমিদার কারও টাইটেল রাজা, কারও মহারাজা, কারও রায় বাহাদুর, কারও রায়সাহেব, কারও বা খেতাব নেই। আর অগণিত ভীতিবিহ্বল মানুষ। তারা চাষী তারা গৃহস্থ, তারা সাধারণ মানুষ।...ছাদটার মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

...১৯৩০ সাল। সেটাতে সেই ছাদ, সেই পুলিশের বেষ্টনী মিলিটারীর পাহারা। এবং চাষী গৃহস্থেরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে বিদ্রোহী দৃষ্টি। আর ওই থামগুলোর পাথরের মানুষ জেগে উঠেছে। তার মধ্যে কীর্তিহাটে যে-স্তম্ভটা বীরেশ্বর রায়ের মূর্তি ছিল, সেটা ফেটে গেছে, তা থেকে বের হচ্ছে অতুলেশ্বর, তার হাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা।

বাস্তবে অন্তর্হিত ব্যক্তিবর্গের মনোজগৎ পরিক্রমায় গৃহীত হয় পাঁচালী, ডায়েরির রীতি। কুড়ারাম ভট্টাচার্যের রচিত পাঁচালীতে তৎকালীন প্রতিবেশ ও রায়বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, বীরেশ্বর রায়ের ব্যক্তিগত ডায়েরি বা রত্নেশ্বর রায়ের চিঠিপত্র-ডায়েরি, দেবেশ্বর রায়ের চিঠি ইত্যাদিকে আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করে লেখক দেশজ-প্রকরণের সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসশৈলীর বিমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উক্ত ব্যবহারবিধির মধ্যে ভাষা ও বাচনভঙ্গির ভিন্নতা দিয়ে নির্মিত হয়েছে ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, কালগত বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার স্ব-স্ব রূপ, যেমন বিচিত্র ভোগবাদী চরিত্র বীরেশ্বর রায় উনিশ শতকীয় উপনিবেশ-পটে উত্থিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসলগ্ন এক সামন্ত ও বুর্জোয়ার সাঙ্কর্য, তার ভাষা ইংরেজি-মিশ্র, অহংদৃপ্ত, উচ্চস্বরে বাঁধা। নীলচাষের ঔপনিবেশিক-পটে সে প্রতিবাদী ও প্রতীকী, আবার কলকাতার প্রতিবেশে নাস্তিক সংস্কৃতিমনস্ক, ভোগপ্রবণ। উনিশ শতকীয় ব্যক্তিমনের সম্ভোগস্পৃহা ও দীপ্ত চিত্তলোক নিয়েও অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতায় যে পীড়নগ্রস্ত, বীরেশ্বর তারই বিচিত্র প্রকাশ। রত্নেশ্বর রায়ের ডায়েরির ভাষায় ঐ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের দার্ঢ্যরূপটি পরিস্ফুটিত, যা তার চরিত্রানুগ ন্যায়নীতির বিশ্লেষণে সুদৃঢ়, কিন্তু অন্তর্লীন আবেগদ্বন্দ্বে কণ্টকিত। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কুড়ারাম ভট্টাচার্য রচিত পাঁচালী আমাদের প্রাচীন কথকতার প্রকরণকে উপন্যাসশৈলীর অর্থবহ ভূমিকায় যুক্ত করে। কালানুক্রমিক ভাষারীতির বহুবিধ রূপটি *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় বিধৃত হয়ে আমাদের স্বীয় প্রকাশভঙ্গির ধরনকে রূপান্বিত করতে চেয়েছে।

বস্তুত, দেশকাল উপন্যাসের ভাষাকে বাস্তবতায় মূর্ত করে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়, অস্ফুট-অব্যবহৃত রীতিনীতির উদ্ঘাটনে ও প্রয়োগ-সূত্রে, সর্বোপরি রচয়িতার নিজস্ব শব্দজগতের আত্তীকরণে। তারাশঙ্কর উক্ত দেশকালকে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-নিষ্পিষ্ট গ্রাম-শহরের ইতিহাস-মূর্তিকে ভাষার বহুস্তরে বিন্যস্ত করেন, যার অন্তর্চাপে প্রচলিত উপন্যাসফর্মটির সঙ্গে তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্নতা। উপন্যাসের শিল্পরূপ যদিও কলোনিয়াল সমাজবিকাশের স্রোতলগ্ন ও পরস্পরসাপেক্ষ, কিন্তু এখানে তার বিকল্প রূপটি জেগে উঠেছে আখ্যান ও সন্দর্ভ সংযোজনায়। একস্বরবদ্ধ অভিজাত ধ্রুপদ মহাকাব্যিক প্যাটার্নকেও *কীর্তিহাটের কড়চা* অস্বীকার করে একালের এপিক উপন্যাস নির্মাণে হয়েছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সময়স্তরের নানা অর্থসূচকতায়, মানবজীবনের উদীয়মান বাস্তবতার অবতলে নিরবচ্ছিন্ন প্রত্ন-বাস্তবতার আস্তিত্বিক-প্রকাশে এবং ধারা-উপধারার যৌগরসায়নে স্বরিত জীবনবীক্ষাটি এখানে মহাকাব্যিক মাত্রা অর্জনে সমর্থ, একইসঙ্গে উপন্যাস-চারিত্র্য রক্ষণে যত্নশীল।

সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জি

শিশির চট্টোপাধ্যায় ১৩৭৫ — *উপন্যাসের স্বরূপ,* কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার ১৯৮৮ — *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা।

দেবেশ রায় ১৯৯১ — *উপন্যাস নিয়ে,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৯৯৬ — *বাখতিন, তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৯৭ — *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সমরেশ মজুমদার ১৯৯৭ — *পশ্চিমবঙ্গ,* তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যা, ১৪০৪ [প্রবন্ধ 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে এপিক–লক্ষণ']

ভীষ্মদেব চৌধুরী ১৯৯৬ — *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পত্রিকা,* ১৪০৩ [প্রবন্ধ : 'কীর্তিহাটের কড়চা : সামাজিক ইতিহাসের মহাকাব্যিক উপন্যাস']

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯৯৬ — *এবং এই সময়,* গ্রীষ্মসংখ্যা, ১৪০৩ [প্রবন্ধ : 'বাখতিন : তৃতীয় বিশ্বে']

Ralph Fox 1937 — The Novel and the people, London [Novel as epic অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকৃত অর্থেই, নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র অনন্যপূর্ব কথাকোবিদ। কেবল তাঁর কালিক প্রেক্ষাপটেই নয়, বর্তমান কালের বিচারেও তারাশঙ্করের এই অপ্রতিমতা সমধিক লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং 'পোড়োজমি'-তে 'ফাঁপা-মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল আবির্ভাব। সামূহিক ভাঙন এবং কালিক বৈনাশিকতার প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েও যুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের খণ্ড বিশ্বাসের স্রোতে তারাশঙ্কর নিয়ে এলেন অখণ্ড জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনা। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্য যখন যুদ্ধোত্তর হতাশা বিভ্রান্তি ও সংশয়-জিজ্ঞাসায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তখন তারাশঙ্কর সেখানে নিয়ে এলেন জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস এবং অখণ্ড-অপরাজেয় মানবসত্তার নিগূঢ় উপলব্ধি।

সময় ও সমকালের দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথে বিক্ষত, প্রবৃত্তিতাড়িত ও নিয়তিশাসিত মাটিঘেঁষা মানুষের চারুশিল্পী তারাশঙ্কর। কল্লোলীয় নাস্তির কুণ্ডলী ছিঁড়ে রাঢ় বাংলার গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর নির্মাণ করেছেন মানবাত্মার শাশ্বত জয়গাথা, চিরায়ত মানবধর্মের মাঙ্গলিক মূর্ছনা। সমর-উত্তর ক্ষয়িষ্ণু মনোভূমি ও যৌবনরাগে তিনি আকৃষ্ট হননি, ফ্রয়েড-এলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হননি কক্ষচ্যুত—বরং তাঁর অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্রোতে ভাসমান মানুষের জৈবসমগ্রতা, তার পরমার্থলোক। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও সে-মূল্যবোধের সামূহিক অবক্ষয়ের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে তারাশঙ্কর বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে-উপন্যাসে (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮ : ৪০)। বাস্তবতা আর সময়ের মাত্রাই তাঁর গল্পভুবনের কালোত্তীর্ণ শিল্পসামর্থ্যের মূল উৎস। তবে উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও, রাজনীতি আর ইডিওলজির প্রশ্নে কখনো কখনো বাস্তবতাকে এড়িয়ে গেছেন তিনি ; ইডিওলজিকে জিতিয়ে দেবার বাসনায় অজ্ঞাতে মেনে নিয়েছেন শিল্পের পরাভব (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮ : ১৪৯)। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা যে সর্বদাই 'revolt of reality against false consciousness' (Fischer, 1969 : 44), সে-সত্য প্রায়ই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে তারাশঙ্করের সাহিত্যে।

ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে জমিদারতন্ত্রের উত্থান-পতনের ক্রমকথা তারাশঙ্করের গল্পসাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'জলসাঘর', 'পুত্রেষ্টি', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'ব্যাঘ্রচর্ম' প্রভৃতি গল্পের কথা মনে পড়ে। ব্রাত্যমানুষের আদিম জৈবচেতনার কুণ্ঠাহীন উপস্থিতি তাঁর অনেক গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জৈবচেতনার গল্প হিসেবে 'তারিণী মাঝি', 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'বেদেনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মানুষ এবং জীবজন্তুর মধ্যে স্বভাবগত নিগূঢ় ঐক্যবন্ধনের গল্পরূপ সৃজনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। 'নারী ও নাগিনী', 'কালাপাহাড়', 'কামধেনু' ইত্যাদি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। বৈষ্ণবীয় সাধনার গল্পরস সৃজনেও তিনি সার্থক শিল্পী। 'রসকলি', 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', 'হারানো সুর', 'প্রসাদমালা', 'সর্বনাশী এলোকেশী'—প্রভৃতি গল্প সহজিয়া বৈষ্ণব-সমাজের একদিন-প্রতিদিনের শব্দপ্রতিমা হিসেবে স্মরণীয় নির্মাণ। বিকৃত-কদাকার-পাশবপ্রবৃত্তির মানুষের মাঝে হৃদয়বৃত্তির উৎসারণে 'মতিলাল', 'তমসা', 'সন্তান', 'তিনশূন্য' প্রভৃতি গল্প অর্জন করেছে বিশিষ্টতা। রাঢ় বাংলার রুক্ষ মাটিতে জীবনসংগ্রামরত গ্রামীণ লোকালয় শতধারায় শিল্পিত হয়েছে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে। বস্তুত, পরিবর্তমান রাঢ়জীবন আর লালমাটির লোকজসংস্কৃতি নিয়েই তারাশঙ্করের শিল্পভুবন। শৈলজানন্দের মতো, সতীনাথের মতো, তারাশঙ্করও ছোটগল্পের উপাদান হিসেবে নির্বাচন করেছেন আঞ্চলিক জীবন (সুকুমার, ১৯৬৩ : ৩৪২)।

তারাশঙ্করের গল্পে আমরা লক্ষ করি নানা আপাত-বিপরীত চিন্তার সমাহার। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে প্রতিবাদী দায়িত্বপালনের অপারগতায় কখনো কখনো তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন; বাস্তবতার জগৎ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন নৈতিকতার জটিল তর্কলোকে, রোমান্সের বর্ণময়তায়, কখনো-বা বিচিত্র সাধনার আধ্যাত্মিক গূঢ়তায় (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮ : ১৪৭)। জমিদারতন্ত্র এবং সামন্ত-মূল্যচেতনার প্রতি দ্বিধামিশ্রিত আকর্ষণ তারাশঙ্করের শিল্পিচিত্তকে দীর্ণ করেছে, ফলে তাঁর অনেক গল্পই অর্জন করতে পারেনি প্রার্থিত শৈল্পিক-সিদ্ধি। তারাশঙ্করের ছোটগল্প সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যে অনেক ক্ষেত্রেই ঋদ্ধিম্লান। গঠনশৈথিল্য, সংহতিহীনতা এবং ইডিওলজির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাঁর অনেক গল্পের শৈল্পিক-সিদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তবে নাটকীয়তা এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তারাশঙ্করের গল্প সমৃদ্ধ। সহজাত নাটকীয়তা এবং ক্যানভাসের বিশালতা তাঁর গল্পে নিয়ে এসেছে এপিকচারিত্র্য। যেমন উপন্যাসে, তেমনি ছোটগল্পেও, তারাশঙ্কর মূলত এপিকধর্মী কথাশিল্পী (ভূদেব, ১৯৮৯ : ৪৪১)।

ছোটগাল্পিক হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌল প্রবণতা উপর্যুক্ত আলোচনায় নির্দেশিত হলেও, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁর গল্পসাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় উপস্থাপন করবো না। তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'তারিণী মাঝি'-র শিল্পরূপ বিশ্লেষণই বক্ষ্যমাণ আলোচনার অন্বিষ্ট বিষয়। একটি গল্পের টেক্স্ট ব্যবহার করেই আমরা দেখতে

চাই ছোটগাল্পিক হিসেবে তারাশঙ্করের সাফল্য ও সিদ্ধি, তাঁর মৌলঅর্জন, তাঁর ছোটগাল্পিক-কলাবোধের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য।

দুই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য়, ১৩৪২ সালে। পরে এটি সঙ্কলিত হয় তাঁর *জলসাঘর* (১৩৪৪) গল্প-গ্রন্থে। 'তারিণী মাঝি' বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অসামান্য নির্মাণ। জৈবচেতনা এবং বেঁচে থাকার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায় 'তারিণী মাঝি' একই সঙ্গে অন্তরানন্দ, রহস্যময় জীবনসত্য, আত্ম-অস্তিত্বের আদিম বাসনা এবং অতল-অতুল হার্দ্য-রক্তক্ষরণের শিল্পপ্রতিমা। জীবনের কঠোর এবং কোমল—দু'রূপই 'তারিণী মাঝি' গল্পে উন্মোচিত। 'তারিণী মাঝি'-র শিল্পরূপ বিবেচনার জন্য আমরা প্রথমেই চোখ ফেরাতে চাই এ-গল্পের ঘটনাংশের দিকে।

ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের খেয়া-পারাপারের মাঝি তারিণী। তার সংসারে মানুষ মাত্র দু'জন। তারিণী নিজে আর তার স্ত্রী সুখী। তারিণীর সংগ্রামশীল জীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও সুখ ও শান্তির কোন অভাব ছিল না। তন্বী, উচ্ছল, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা সুন্দরী সুখীর জন্য তারিণী মাঝির আনন্দের কোন সীমা নেই। সুখীও তারিণীর প্রতি ছিল গভীরভাবে আকৃষ্ট, স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিল অটল। সন্তানহীনা হয়েও তারিণীর ঘরে সুখীর দিন কেটেছে পরম আনন্দে। ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তারিণীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ময়ূরাক্ষীই বাঁচিয়ে রেখেছে তারিণীকে, ময়ূরাক্ষীর স্রোতোধারা থেকেই সে পেয়েছে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী মন্ত্র। তারিণী মাঝি ময়ূরাক্ষীকে জীবনদাত্রী জননী বলেই জানে। কিন্তু একদিন জীবন-পালিনী এই ময়ূরাক্ষীই তারিণী ও সুখীর জীবনে দেখা দিল ভয়ঙ্কর রাক্ষসী রূপে। ময়ূরাক্ষীতে এল হরপা বান। বানের সময় ঘরে ছিল না তারিণী। বন্যার ভয়ে প্রতিবেশীরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেও সুখী অপেক্ষা করছিলো তারিণীর জন্য। জল ঠেলে তারিণী এক সময় এল সুখীর কাছে। কিন্তু ততক্ষণে হরপা বানে চারদিক জলমগ্ন। ক্রমেই বেড়ে চলেছে হরপার জল। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চললো দু'জন মানব-মানবী। তারিণীর কোমর ধরে রইলো সুখী—চললো তারা নিরাপদ ভূমির সন্ধানে। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে তারা পড়ে গেল নদীগর্ভে। এরপর শুরু হলো তারিণীর সংগ্রাম—অনিবার্য মৃত্যুর ছোবল থেকে নিজেকে এবং সুখীকে রক্ষা করার আকুল সংগ্রাম। কিন্তু এক সময় তারা পড়ে গেল ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণিতে—সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও তারিণী পারলো না ঘূর্ণি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। ক্রমে তারা ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে, সুখীর দৃঢ় বন্ধনে তারিণীর দেহও অসাড় হয়ে আসছে, সুখীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো তারিণী, ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরলো সুখীর গলা, খসে গেল পাথরের মতো দুর্ভার সুখী—

জীবনসত্যের অপার রহস্য উন্মোচন করে মাতৃরূপী ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে উঠলো আলো ও মাটি প্রত্যাশী তারিণী মাঝি। এই ঘটনাংশ নিয়েই গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প 'তারিণী মাঝি'।

তারাশঙ্করের গল্পে প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে মানুষের নিয়তি রূপে। নিয়তিরূপী এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই, প্রবৃত্তির কাছে সে অসহায় ও শক্তিহীন। মানবজীবনে এই নিয়তিলীলা কখনো পরিদৃশ্যমান, কখনো অপরিজ্ঞেয়, কখনো কার্যকারণ-পরম্পরায় গ্রথিত, কখনো-বা জীবনরহস্যের কৃষ্ণ-জটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন জীবন-রহস্যের সন্ধান করেছেন তাঁর ছোটগল্পে ও উপন্যাসে (জগদীশ, ১৯৯৪ : ২২-২৩)। এই প্রবণতা সূত্রেই স্মরণীয় 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্প। এ-গল্পে শিল্পিত হয়েছে শাশ্বত ও চিরকালীন জীবধর্মের জয়। চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে আপন জীবন ছাড়া অন্য কিছুই প্রিয়তর নয়—কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা, দাম্পত্যসম্পর্ক—কিছুই নয়। এই অন্ধ জৈবধর্মের জয়ই এ-গল্পে শিল্প-রূপায়িত (অরুণ কুমার, ১৯৮২ : ৩৬)। জৈবধর্মের এই জয়-পরাজয়ের শিল্পরূপ অঙ্কনকেই ছোটগল্পের অন্বিষ্ট বলে জেনেছেন তারাশঙ্কর। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অভিমত—

> ...সেদিন রাত্রে দেখলাম ওই লেখাগুলির সঙ্গে আমার স্রোতের কুটোর ঢঙ-এর বেশ মিল আছে। তবু একটা কথা মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত-পরাভূত হয়েছে। অত্যুক্তি হয় না। এমন কি ঐ আবেগের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তার স্বাভাবিক ধর্ম, তারও অভাব রয়েছে বলে মনে হল। জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতছে কোথাও হারছে। (তারাশঙ্কর, ১৯৬৯ : ২০)

আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী মাঝি। ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপার করে তারিণী। তারাশঙ্কর গল্পের প্রথম দিকে তারিণী-চরিত্রের নানা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। কৌতুকময়তা, মানবকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি, পরোপকারবৃত্তি, পত্নীপ্রেম, সততা—এইসব ইতিবাচক গুণের অধিকারী তারিণী মাঝি। তারাশঙ্কর সতর্কতার সঙ্গে তারিণীচিত্তে পত্নীপ্রেমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। গল্পের পরিণতিকে ব্যঞ্জনাময় ও নিগূঢ় করার জন্য সুখীর প্রতি তারিণীর ভালোবাসাকে পরম মমতায় প্রকাশ করেছেন তিনি। ঘোষ-বধূকে নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করে বৌয়ের জন্য ফাঁদি নথ পাবার পরও ঘোষ-মহাশয় যখন তাকে আরো কিছু দিতে চাইলেন, তখন প্রকাশ পেল বৌ সুখীর জন্য তারিণীর গভীর প্রেম—

> **ঘোষ মহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর, কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী ? আর এই নে—পাঁচ টাকা।**
>
> **তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হুজুর, চাদরের বদলে যদি শাড়ি—**

> হাসিয়া ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।
> সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।
> তারিণী বলিল, নেহাৎ কালো কুচ্ছিত মা।
> (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৫)

—সাবির কাছে সুখীর রূপ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে তারিণী। লজ্জায় নিজের বৌয়ের আসল রূপ তারিণী বলতে পারেনি। তাই সামান্য পরেই তারাশঙ্কর পাঠককে জানিয়েছেন এই সংবাদ—

> সুখী বলিল, দাঁড়াও, আয়নাটো লিয়ে আসি, লতোটা পরি। তারিণী খুশী হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখ দেখি।
> সুখীর মুখে পুলকের আবেশ ফুটিয়া উঠিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুখী, মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৭)

—গল্পের সমাপ্তিতে তারিণীর জীবনাকাঙ্ক্ষাকে নিগূঢ় করার জন্য সুখীর প্রতি তার ভালোবাসার ছবি অঙ্কন করা ছিল অনিবার্য। যে স্ত্রীর প্রতি তারিণীর এত ভালোবাসা, তাকেই হত্যা করে সে আলো আর মাটির সন্ধান পেয়েছে—নির্মম এই প্রাপ্তি—তবু তাই এখন তারিণীর জীবনে নিগূঢ় সত্য।

ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তারিণীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ময়ূরাক্ষীর জল আর হাওয়া গায়ে মেখে তারিণী হয়ে উঠেছে অদম্য মাঝি। ময়ূরাক্ষী তারিণীর কাছে মাতৃস্বরূপা—মা যেমন সন্তানকে কোলে-পিঠে লালন করে, তেমনি লালন করে ময়ূরাক্ষী তারিণীকে। তাই পাথার বানে তারিণী ময়ূরাক্ষীতে যায় বলে ভীত সুখীর ভয়কে সে উড়িয়ে দেয় এই বলে—'...মায়ের বুকে ভয় থাকে ? বল্, তু বল্, ব'লে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার—অ্যাই' (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৬)। সুখীকে যেমন ভালোবাসে তারিণী, তেমনি ভালোবাসে সে ময়ূরাক্ষীকে, ময়ূরাক্ষীর জলধারাকে। ময়ূরাক্ষীর জন্য, ময়ূরাক্ষীর জলের জন্য তারিণীর আনন্দ-বেদনার সংবাদ তারাশঙ্কর বহুবার পাঠককে জানিয়েছেন। যেমন—

[ক] তারিণী বলিতেছিল, চল, তোকে [সুখী] পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দেব গনুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৬)

[খ] শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিনই বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল চঞ্চল করিয়া তুলিল। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৯)

[গ] যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া, নদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ . ১০২)

—উপর্যুক্ত প্রতিটি অংশেই ময়ূরাক্ষীর প্রতি তারিণীর তীব্র মোহের কথা, আকুল ভালোবাসার কথা অভিব্যক্ত।

ময়ূরাক্ষীর ভালোবাসায় বেড়ে উঠেছে তারিণী, আবার সেই ময়ূরাক্ষীর কারণেই তারিণী হত্যা করেছে তার ভালোবাসা সুখীকে। অপূর্ব বৈপরীত্যে তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন তারিণী-চরিত্রের এই দ্বৈত প্রান্ত। গল্পের সমাপ্তিতে ময়ূরাক্ষীর হরপা বানের স্রোতে হারিয়ে যায় তারিণীর সব প্রতিরোধ, ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণিতে পড়ে ডুবে যেতে থাকে তারিণী আর সুখী। গল্প শেষ হতে পারতো সেখানে ; কিন্তু না, এক নাটকীয় মোচড়ে সমাপ্তিতে এসে তারাশঙ্কর তারিণী মাঝিকে পৌঁছে দিলেন জীবনসত্যের রহস্যঘেরা অধরা এক অমরাবতীতে। তারাশঙ্করের ভাষায় গল্পের সেই অন্তিম মুহূর্ত—

> ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস ! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০৬)

—তারিণীর এই আচরণের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে পরম-নিষ্ঠুর জীবনসত্যের রহস্য উন্মোচন করেছেন তারাশঙ্কর। আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির কাছে তারিণীর প্রেমের পরম পরাভবই এ-গল্পের মৌল উপজীব্য। আপাতদৃষ্টে তারিণীর এই আচরণ আত্মরতির অন্ধ-মোহে বিশ্বাসের মৃত্যু বলে মনে হলেও (জগদীশ, ১৯৯৪: ২৫), গভীরতর অর্থে তা জীবনের প্রতি অতলান্ত বিশ্বাসেরই শিল্পভাষ্য। কোন বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যান, কার্য-কারণ সম্পর্ক সন্ধান, দোষারোপ—কোন কিছুই যেন এখানে প্রযোজ্য নয়—সবকিছুকে ছাপিয়ে কেবল বড় হয়ে উঠেছে জীবনসত্যের রহস্যময়তা।

সুখীকে গলা টিপে ধরার সূত্রে তারিণী সর্ম্পকে অনেক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে পাঠকচিত্তে। হরপা বান-তাড়িত ঘূর্ণি-চালিত তারিণী যে সুখীর গলা টিপে ধরলো তা কতটা ন্যায় কিংবা অন্যায় ? বিপন্ন-অস্তিত্বের চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে কোনটা বড়—প্রেম না আপন জীবন ? সুখীকে গলা টিপে না মেরে দু'জনে একসঙ্গে জলতলে হারিয়ে যাওয়াই কি ভালো ছিলো ? তারিণী কি জীবন-পিপাসু না হত্যাকারী ? এইসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হবার নয়। এইসব গভীর প্রশ্ন জাগ্রত হয় বলেই 'তারিণী মাঝি' হয়ে ওঠে অসামান্য এক নির্মাণ, সত্তা-কাঁপানো এক শিল্প-প্রতিমা।

সুখী স্বামী-প্রেমে মুগ্ধ নিম্নবর্গের সাধারণ এক নারী। তারিণীর মতো জীবনের প্রতি তারও টান অপরিসীম। নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে সে সংসার চালায়, তবু স্বামীকে

বুঝতে দেয়না অভাবের তীব্রতা। স্বামীর প্রতি তার অটল অতল বিশ্বাস। তাই হরপা বানে চারদিক জলমগ্ন হলেও স্বামীর প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করে আপন গৃহে। ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণি থেকে বাঁচার জন্য সে কঠিন বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছিল তারিণীকে। সেও বাঁচতে চেয়েছিল গভীর আকুলতায়, তারিণীর মতো সেও চেয়েছিল আলো আর মাটি। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণি তাকে বাঁচতে দেয়নি ; না কি নিজের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হওয়ার জন্যে তারিণীই তাকে বাঁচায় নি ?

তিন

'তারিণী মাঝি' গল্পে তারাশঙ্করের ছোটগাল্পিক শিল্পদৃষ্টির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টিকোণ-নির্বাচন, প্রকরণ–পরিচর্যা এবং ভাষা-ব্যবহারে আলোচ্য গল্পে তারাশঙ্করের আধুনিক শিল্পচেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। এখানে তিনি প্রধানত ব্যবহার করেছেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী মাঝির দৃষ্টিকোণ। তবে, কখনো কখনো পরিণতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণই রূপান্তরিত হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে। যেমন—'দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল। জনমজুরদের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০০)।' এখানে তারিণীর দৃষ্টিকোণ মুহূর্তেই লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রূপান্তরিত হয়েছে।

আলোচ্য ছোটগল্পে তারাশঙ্কর গল্পের পরিণতিকে আভাসিত করার জন্য অসামান্য নৈপুণ্যে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার করেছেন। একটি মাত্র বাক্যের সাহায্যে তিনি পরিণতিকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন ময়ূরাক্ষীর বর্ণনায়—'লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব—হরিবোল। যাত্রীর দল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল—হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রূর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯২)।' এই ক্রূর ভয়ঙ্করী রাক্ষসী ময়ূরাক্ষীর প্রেক্ষাপট তারিণী মাঝির ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।

'তারিণী মাঝি' গল্পে তারাশঙ্কর ময়ূরাক্ষী নদীকে নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতায় ব্যবহার করেছেন। একদিকে সে জীবনপালনকারিণী, মাতৃরূপিণী ; অন্যদিকে ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। নদীর এই দ্বৈতসত্তা যেন মানবজীবনের বিপ্রতীপ প্রবণতার নিগূঢ় সঙ্কেত (গৌরমোহন, ১৯৯৪: ২০২)।

চরিত্রের অন্তঃমনস্তত্ত্ব উন্মোচনে এবং পরিণতি অঙ্কনে তারাশঙ্কর আলোচ্য গল্পে একাধিকবার লোকচরিত্র-জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কুশলী ব্যবহার করেছেন।

তারাশঙ্করের এই শিল্পকৌশল অনুধাবনের জন্য আলোচ্য গল্প থেকে কয়েকটি উজ্জ্বল এলাকা উদ্ধৃত হলো—

[ক] ... বলিতে বলিতেই সে [তারিণী মাঝি] খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপরে কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা ? (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৩)

[খ] তারিণী পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখেছিস, সুখী, দেখেছিস ?

সুখী বলিল, আমার মাথামুণ্ডু কি দেখব, বল ?

তারিণী বলিল, পিঁপড়েতে ডিম মুখ নিয়ে ওপরের পানে চলল। জল এইবার হবে।

সুখী দেখিল, সত্যই লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে প'ড়ো ঘরখানার দেওয়ালের উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা সাদা ডিম।

সুখী বলিল, তোমার যেমন—

তারিণী বলিল, ওরা ঠিক জানতে পারে, নীচে থাকলে যে জলে বাসা ভেসে যাবে। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০১-০২)

[গ] তারিণী চাহিয়া ছিল অন্যদিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ ? ওই দেখ, কাকে কুটো তুলছে—বাসার ভাঙা ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না ; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় না। অপরাহ্ণের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০২)

চরিত্রের মনোলোক এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতা উন্মোচনের জন্য আলোচ্য গল্পে তারাশঙ্কর বেশ কিছু সুপ্রযুক্ত নিপুণ অলঙ্কার নির্মাণ করেছেন। এসব অলঙ্কার ভাষাকে যেমন সুশ্রী ও পেলব করেছে, তেমনি একই সঙ্গে ঘটনার মৌল প্রবণতাও প্রকাশ করেছে। অভিজ্ঞতালোক থেকে তারাশঙ্কর চয়ন করেছেন তাঁর অলঙ্কারের শিল্প-উপাদান। অলঙ্কার-সৃজনে তারাশঙ্করের নৈপুণ্য নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে সুপরিস্ফুট—

উপমা

[ক] বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৩)

[খ] বন্যার প্রথম দিনই বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উচুঁ পাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিযা নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল চঞ্চল করিয়া তুলিল। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ :৯৯)

সমাসোক্তি

[ক] তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৬)

উৎপ্রেক্ষা

[ক] দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০০)

আলোচ্য গল্পে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলায় প্রচলিত একাধিক প্রবাদ ব্যবহার করেছেন, যে-সব প্রবাদ তার কৌতুকময় মানসতা প্রকাশে পালন করেছে অব্যর্থ ভূমিকা। যেমন—

[ক] লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ৯৪)
[খ] হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০০)

তারাশঙ্কর পরিচর্যা-প্রসাধনে ততটা মনোযোগী শিল্পী নন, যতটা মনোযোগী বিষয়াংশ নির্বাচনে। তবু মাঝে মাঝে কিছু পরিচর্যা তাঁর শিল্পচেতনার প্রাগ্রসরতাকেই প্রমাণ করে। 'তারিণী মাঝি' গল্পের সমাপ্তিতে আমরা লক্ষ করি এমনি এক উজ্জ্বল পরিচর্যা, নিপুণ বর্ণনা—

> স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে হু হু শব্দে, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়হুড় দুড়দুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে কতক্ষণ তাহার অনুমান হয় না। মনে হয়, কত দিন কত মাস তাহার হিসাব নাই—নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। (তারাশঙ্কর, ১৯৩৭ : ১০৫)

'তারিণী মাঝি' গল্পের পরিণতি অঙ্কনে তারাশঙ্কর নাটকীয় পরিচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটকীয় পরিচর্যার মধ্য দিয়ে গল্পটি অনিবার্য গতিতে পরিণতির চরম বিন্দুতে উপনীত হয়েছে, এক অভাবনীয় অকল্পনীয় চমকপ্রদ অনিবার্যতায় গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। সুখীর গলা টিপে ধরার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত পাঠক তারিণী কর্তৃক এ-ঘটনা ঘটতে পারে, তা কল্পনা করতে পারে নি। এই নাট্য-সমাপ্তি গল্পটিকে করে তুলেছে শিল্প-নিপুণ এবং কালোত্তীর্ণ। তারিণী কর্তৃক সুখীর জীবন-সমাপ্তির মধ্য দিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে যুগপৎ বীভৎস, ভয়ানক, করুণ এবং রহস্যঋদ্ধ আনন্দের শিল্প-উৎস।

চার

'তারিণী মাঝি' গল্পে তারাশঙ্করের মৌল উদ্দেশ্য মানুষের প্রবৃত্তির বিজয় ঘোষণা। তবে এই মৌল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকের বাংলা দেশের বিপন্নতার কিছু ছবি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আসন্ন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেছে গল্পের একাধিক বর্ণনায়। অতএব, সমাজ-বাস্তবতার ছবি হিসেবেও 'তারিণী মাঝি' একটি উল্লেখযোগ্য টেক্সট হিসেবে উত্তরকালীন পাঠকের কাছে বিবেচনাযোগ্য।

পাঁচ

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' এক উজ্জ্বল নির্মাণ। মানব-প্রবৃত্তির অতলান্ত রহস্যময়তা এ-গল্পে নাটকীয় ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে।

তারিণীর অন্তিম আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের উপর নিয়তি-রূপী প্রবৃত্তির অমোঘ লীলাখেলা উপলব্ধি করি, লক্ষ করি মানবিক জৈবধর্মের শাশ্বত বিজয়গাথা।

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮২ — *কালের পুত্তলিকা* (কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী)।

অশ্রুকুমার সিকদার ১৯৮২ — *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী)

গৌরমোহন রায় ১৯৯৪ — *তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা* (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী)।

জগদীশ ভট্টাচার্য ১৯৯৪ — *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী* (কলকাতা : ভারবি)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৭ — *জলসাঘর* (কলকাতা : সুবর্ণরেখা প্রকাশিত তৃতীয় মুদ্রণ–১৯৯৪)

১৯৬৯ — *আমার সাহিত্য জীবন* প্রথম পর্ব (কলকাতা : কল্লোল পাবলিশিং)

ভীষ্মদেব চৌধুরী ১৯৯৮ — *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস:* সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।

ভূদেব চৌধুরী ১৯৮৯ — *বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং)।

সুকুমার সেন ১৯৬৩ — *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*–৪র্থ খণ্ড (কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি)।

Ernst Fischer 1969 — *Art Against Ideology* (London: Routledge & Kagan Paul

কবি : আঙ্গিক-বিবেচনা

ভীষ্মদেব চৌধুরী

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক কালজয়ী শিল্পী-প্রতিভা ; *কবি* [১] তারাশঙ্করীয়-সামর্থ্যেরই এক চিরায়ত শিল্পকীর্তি। উত্তরহীন জীবনজিজ্ঞাসার বেদনাবাহী এক অনিঃশেষ রাগিণী *কবি*-র সৌন্দর্যসুষমার অন্তস্তলে সঞ্চরমান। কবিয়াল থেকে 'কবি'তে উত্তীর্ণ *কবি*-র ব্রাত্য নায়ক নিতাইর জীবনগাথা উপন্যাসটির কথাবস্তু। জীবনের নির্মম বাস্তবতার তাপে দগ্ধ 'মুসাফের' নিতাইর কণ্টকময় পথ-যাত্রার পরিণতিতে কবিসুলভ লোকায়ত দার্শনিকতায় উত্তরণই নিতাইর জীবনযাত্রার সম্ভাবনাদীপ্ত পরিণতি। সেখানে সে হয়ে উঠেছে বিশ্বের এক মহান কবিসত্তার প্রতিভূ। পরিণতির এই আবেদনই *কবি*-র অদ্বিতীয়তা, তার চিরায়ত মূল্য অর্জনের কার্যকারণ।

দুই

জীবনের সূচনা থেকে আমৃত্যু বিষয় ও প্রবণতা অনুসারে তারাশঙ্করের উপন্যাসে দু'টি স্বতন্ত্র স্রোতোধারার অস্তিত্ব বর্তমান। প্রথমটি সমাজ-রাজনীতি-অন্বিত সাহিত্য; অপরটি রাজনীতি-নিরপেক্ষ ব্যক্তিজীবনের, গোষ্ঠীজীবনের কিংবা লোকায়ত–জীবনের সর্বসহায়হারা মানুষের শিল্পভাষ্য। সমাজের রূপ ও রূপান্তর , বিশেষত, কালান্তর-পর্বে সামন্ত ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রাণবন্ত দ্বান্দ্বিকতা এবং এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজে নবোদ্ভূত রাজনৈতিক বোধ ও তার সাংগঠনিক কর্মসূচির মিথস্ক্রিয়া প্রথম ধারার কালোত্তীর্ণ উপন্যাসের মুখ্য কথাবস্তু। *চৈতালী-ঘূর্ণি* (রচনাকাল ১৯২৯-৩০), *ধাত্রী দেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩, ১৯৪৪), *মন্বন্তর* (১৯৪৪), *সন্দীপন পাঠশালা* (১৯৪৬), *ঝড় ও ঝরাপাতা* (১৯৪৬), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৬-৪৭), *যোগভ্রষ্ট* (১৯৬০), *কীর্তিহাটের কড়চা* (রচনাকাল ১৩৭১-৭৩), *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) এ-ধারার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। রাজনীতি-নিরপেক্ষ ব্যক্তিজীবন, গোষ্ঠীজীবন এবং সর্বসহায়হারা মানুষকে অবলম্বন করে রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল *রাইকমল* (১৯৩৫), *কবি* (১৯৪২), *অভিযান* (১৯৪৬), *নাগিনীকন্যার কাহিনী* (১৯৫২), *আরোগ্য নিকেতন* (১৯৫৩), *চাঁপা ডাঙ্গার বৌ* (১৯৫৪), *সপ্তপদী* (১৯৫৮) এবং *ডাকহরকরা* (১৯৫৯)। রাজনীতি-নিরপেক্ষ অথচ সমাজমুখ্য এসব উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবন কিংবা সমাজজীবনের পটভূমিকায় স্থাপিত ব্যক্তিমানুষের

অস্তিত্বগত ও হৃদয়গত সংকট লাভ করেছে শিল্পপ্রতিমা। এ ধারার উপন্যাসে সমাজগতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষকরূপী ঔপন্যাসিকের সমাজসত্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নেই, আছে 'মানবসত্য' উন্মোচনের আকুতি। তবে এই উভয়ধারার সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে এমন কয়েকটি অসামান্য উপন্যাস, যেগুলি অবিসংবাদিতরূপে বাংলা চিরায়ত কথাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

কবি অবিমিশ্ররূপে রাজনীতি-নিরপেক্ষ উপন্যাস। রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক পটভূমিকায় স্থাপিত সমাজের প্রান্তবাসী এক ব্যক্তিমানুষের উত্তরহীন জিজ্ঞাসার ও অন্তহীন ট্রাজিকতার এক কালজয়ী শিল্পগাথা-র নাম *কবি*। প্রথম পর্বের তারাশঙ্করীয় সামর্থ্যের এক ভিন্নমাত্রিক প্রকাশ *কবি*-র বিষয়ে বক্তব্যে ও বিন্যাসকৌশলে পরিস্ফুট। প্রথম পর্বের তারাশঙ্কর যেমন সমাজ ও সময়ের প্রবহমানতার মধ্যে জাতীয় জীবনের সামূহিকতাকে, তার ব্যাপ্তি ও সম্ভাবনাকে মহাকাব্যিক বিশালতায় রূপময়-জীবন্ময় করে তুলেছেন, তেমনি একইভাবে বহুস্তরীভূত সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তির পরাভবের ও অচরিতার্থতার বেদনাকেও গীতিকাব্যিক সুরসূক্ষ্মতায় করেছেন মহিমান্বিত। *কবি*—এই অর্থে ব্যক্তির অন্তর্গত বেদনার এক বিশ্বজনীন কবিতা।

তিন

এ–কথা বহুল প্রচলিত যে, তারাশঙ্কর রূপদক্ষ শিল্পস্রষ্টা নন ; সর্বদর্শীর মহাকাব্যিক বিশালতায় জীবনের এক মহৎ শিল্পভাষ্যকার। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই বিশাল ক্যানভাসকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত ; অজস্র মানুষের পদচারণায় সামূহিক-জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তব, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা তাঁর উপন্যাসে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ। প্রধানত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণজাত উপন্যাস-সৃজনেই তারাশঙ্কর অধিকতর স্বচ্ছন্দ। 'ন্যারেটিভ' রচনার তুলনায় প্রকরণকলায় তাঁর আগ্রহের বিষয়টি বাংলা সাহিত্যসমালোচনায় কাঙ্ক্ষিত-মূল্যে বিবেচিত হয় নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘ, অনতিদীর্ঘ ও হ্রস্ব আকারের বেশকটি উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রকরণ–পরীক্ষার সাক্ষ্য বর্তমান। *কবি, সন্দীপন পাঠশালা, ঝড় ও ঝরাপাতা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, যোগভ্রষ্ট, কীর্তিহাটের কড়চা, অরণ্য-বহ্নি, একটি কালো মেয়ের কথা* প্রভৃতি উপন্যাসে অবলম্বিত প্রকরণকৌশল তারাশঙ্করের স্বভাবজ অনুক্রমিক ঘটনাবিন্যাসরীতির ব্যতিক্রম। এ–সব উপন্যাসের কোনটিতে অবলম্বিত হয়েছে উত্তমপুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু, কোনটি বিন্যস্ত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত কাঠামোয়, কোনটিতে গৃহীত হয়েছে লৌকিক কথকতা–ব্রতকথার আঙ্গিক, কোনটিতে লোকপুরাণের ভাবগত আবহে বিন্যস্ত হয়েছে কথাবস্তু, কোথাও যুগপৎভাবে আশ্রিত হয়েছে ডায়্যারি ও বিবৃতির কাঠামো এবং পটুয়ার পটচিত্রের ও চিত্রশিল্পীর রেখাচিত্রের প্রত্যবয়ব। তারাশঙ্করের রূপদক্ষতার প্রশ্নে সমালোচকমহলের দৃঢ়মূল সংশয়ের বিপরীতে এইসব উপন্যাসের নির্মাণশৈলীগত

স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। তারাশঙ্কর–সাহিত্যের এই অকর্ষিত জগৎ আধুনিক সাহিত্যবিবেচনার এক সম্ভাবনাদীপ্ত দিগন্ত উন্মোচনে সক্ষম।

কবি উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইচরণের বেদনাময় জীবনের শিল্পকথা বয়নে তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন তাঁর স্বভাব–ব্যতিক্রম এক প্রকরণ-কৌশল। একুশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটিতে সর্বদর্শী ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দুর পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রসমূহের দৃষ্টিকোণ ; নাটকীয়তায়, সাংগীতিক আবহে, চলচ্চিত্রিক পরিচর্যায় ও পুরাণকথার ভাবসম্পদের পরিপ্রেক্ষণীতে সুসংগঠিত হয়েছে *কবি*-র অস্থি ও ধমনী।

তিন. এক

কবি-র সমাজপট দুটি অংশে বিভক্ত ; একটি অট্টহাস গ্রামকে অবলম্বন করে নিতাইর আত্মীয়-পরিজন ও রাজন-ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট, অন্যটি যাযাবর-স্বভাবী ঝুমুরদলের লোকালয়ের চৌহদ্দি বহির্ভূত স্বৈর-জীবনকে কেন্দ্র করে বিধৃত। দ্বৈত সমাজ পটের মতোই *কবি*–কাহিনীর দ্বিস্রোত উপন্যাসটির প্রকরণ–বৈশিষ্ট্যের কী-নোট। নিতাই-ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে এবং বসন্ত-নিতাইকে অবলম্বন করে দুই আলেখ্যপটে *কবি*-র প্রকরণ কলা বিকশিত হয়েছে। স্বতন্ত্র দুই নারী ঠাকুরঝি ও বসন্তকে উপলক্ষ করে নিতাইর বেদনাময় জীবনকথায় রসাবেদন সঞ্চার করেছে দুটি লোকপুরাণকথার ভাবসম্পদগত প্রেরণা।

ঠাকুরঝি ও নিতাইকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনীর ভাবপরিমণ্ডলে তারাশঙ্কর একটি লোকপুরাণ-কথার আবহ সংযোজন করেছেন বলে সম্প্রতিকালে এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।[২] ইতঃপূর্বে ব্যক্ত উজ্জ্বলকুমার মজুমদার-এর চকিত মন্তব্যও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।[৩]

'কবি : অন্তহীন সৃজনে, সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে দ্ব্যর্থতামুক্ত ভাষায় ও শেষে সংশয়সূচক অব্যয় ব্যবহার করে লিখেছেন :

> নিতাই–ঠাকুরঝি সম্পর্ক এই পর্যায়ে পুরনো পরিচিত একটি "মিথ"কে স্মরণ করায়—রাধাকৃষ্ণ মিথ। নিতাই কালো, প্রেমিক, তার বাঁশি নেই কিন্তু ভাষা আছে, কবিতার ভাষা। ঠাকুরঝি গোপবধূ, স্বামী এবং মুখরা শাশুড়ি নিয়ে তার সংসার, তবু নিতাই চরণে সে নিবেদিতা, মনে মনে। তাদের এই আবছা পরকীয়া, লোকলোচনকে ফাঁকি দিয়ে একান্তে আলাপ, কৃষ্ণার কবরীতে কৃষ্ণচূড়া দেখে নিতাই-এর উদ্বেল খুশি, অথবা দারুণ দুঃসাহসে সেই মেয়ের গলায় কেমিকেলের হার পরিয়ে দেওয়া নিজস্ব নির্জনতায়—এই সব কিছুই নিতান্ত কৃষ্ণকথার আদলে গড়া যেন। পাঠকের মনে হয়, এই ভীরু ভালবাসা, তার পেলব মাধুর্য যেন কত কালের চেনা।

রাধিকার আদল ঠাকুরঝির অবয়ব ও অবস্থান পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কি না জানি না, তবে তার নির্জ্ঞান চেতনাস্তরে রাধা–কৃষ্ণের মিথিক ব্যঞ্জনা যে সক্রিয় ছিল, হিমবন্ত নির্দেশিত যুক্তিসমূহের অতিরিক্ত, উপন্যাসোক্ত আরো কিছু প্রসঙ্গ, তথ্য ও সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের মধ্যে লক্ষ করি। বিশেষত কাহিনীর দুটি

স্রোতেই পূর্বাপর কৃষ্ণমূর্তির আঙ্গিক নিতাই-চরিত্র বিন্যাসে সক্রিয় থেকেছে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে সমগ্র উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনায় ও বর্ণনায়। আলেপুরের মন্দিরে অষ্টসখীপরিবৃত রাধা–গোবিন্দের মূর্তি প্রসঙ্গে, নিতাইর আত্মভাবনায় লোকাপবাদে বিপর্যস্ত ঠাকুরঝির 'কালামুখী' অভিধায়, প্রথমে অগ্রাহ্য করেও মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তে গোবিন্দে শরণাগত বসন্তের হৃদয়ার্তিতে এবং কাশীতে 'কৃষ্ণকোথা হে' পাখির ব্যাখ্যাদানকারিণী পুত্রহারা মা–ঠাকুরুণের মধ্যে নিতাইর কৃষ্ণবৎসলা-যশোদার মাতৃরূপ দর্শনে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। কাজেই নিতাই–ঠাকুরঝির পরকীয়া প্রেমগাথায় হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত রাধাকৃষ্ণ মিথের আদল সন্ধান আরোপিত কোন বিষয় নয় ; উপন্যাসটির ঠাকুরঝিকেন্দ্রিক কাহিনীর রসাবেদনের সঙ্গে ওই পুরাণকথার ভাবসম্পদগত সাদৃশ্য নিকটতর।

প্রসঙ্গত পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক যে, *কবি*–কাহিনী দুটি স্বতন্ত্র স্রোতোধারায় বিন্যস্ত—একটি ঠাকুরঝি–নিতাইকে কেন্দ্র ক'রে, অন্যটি নিতাই-বসন্তকে উপলক্ষ ক'রে বিকশিত। স্বভাবতই এ-প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, ঠাকুরঝি-নিতাই কাহিনীর ভাবগত আবহ যোজনায় যদি একটি মিথিক–প্রেরণা ঔপন্যাসিকের চেতনায় সক্রিয় থেকে থাকে, তা হলে নিতাই-বসন্তকেন্দ্রিক কাহিনী–স্রোতে অপর কোনো পৌরাণিক ভাবপরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী হবেন কেন সৃজয়িতা ? উপন্যাসের প্রকরণ-পরিকল্পনায় মিথিক–আবহ যোজনার প্রেরণা ঔপন্যাসিক মানসে সক্রিয় থাকলে, কেবল একটি নয়, উভয় কাহিনীধারাতেই আবহ যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ জিজ্ঞাসায় তাড়িত হন নি, বরঞ্চ উপন্যাসটির সংগঠন বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার ফাঁক তাঁর চোখে প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি প্রসঙ্গটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> ... ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের "প্রবাসী" মাসিক পত্রিকায় আলোচ্য উপন্যাসটি প্রথম গল্প আকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪৮ সালে প্রথমে "প্রভাতী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ও ঐ বছরই গ্রন্থাকারে "কবি" উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ..."কবি" উপন্যাসের এই নিতাই-বসন্ত পর্ব উপন্যাসের আদিরূপ গল্পটির মধ্যে একেবারেই ছিল না। ...
>
> ঔপন্যাসিকের নির্মাণক্ষম প্রতিভা এইভাবে বীজকে বনস্পতিতে পরিণত করতে সফল হলেও উপন্যাসের দুটি অংশের মধ্যে একটু কোথাও ফাঁক যেন থেকেই গেছে, মনে হয় যেন প্লাসটিক সার্জারির দাগটা পুরোপুরি মেলায় নি !

উপন্যাসের উপান্তে রেলস্টেশনের পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে নিতাইর নবোপলব্ধিতে ঠাকুরঝি–বসন্তর পরস্পরিত রূপ যে রসাবেদন বিস্তার করে তা ওই দুই কাহিনী অংশের ব্যবধানকে একটি বিন্দুতে সংহত করে দেয়। ফলে হিমবন্ত-কথিত প্লাসটিক সার্জারির দাগ প্রসঙ্গটি যোগ্য প্রাসঙ্গিকতা লাভে ব্যর্থ হয়। বস্তুত, তিনি যদি বসন্ত-নিতাই কাহিনীর ব্যাখ্যায় পৌরাণিক আবহ সন্ধানে তৎপর হতেন তা হলে দুই

কাহিনীর মধ্যকার কথিত অপূরণীয় ফাঁক তাঁর দৃষ্টিসীমায় প্রতিভাত হত না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের বিবেচনায় ঠাকুরঝি-নিতাই কাহিনীর অনুষঙ্গে ব্যবহৃত রাধাকৃষ্ণ-মিথের পাশাপাশি বসন্ত-নিতাই কাহিনীতেও চিন্তামণি-বিল্বমঙ্গল মিথ একটি প্রাসঙ্গিক ভাব পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেছে। আলেপুর মেলার বীভৎস পরিবেশ, রাতের অন্ধকারে মাটির তলার সরীসৃপের মতো মানুষের আদিম প্রকৃতির নগ্ন আত্মপ্রকাশ, বেশ্যাপল্লির অসঙ্গত জীবনের ক্লেদ যখন নিতাইর কবিসুলভ নীতিবোধকে বিচলিত করে তুলেছে, তখন এই পরিবেশ থেকে মুক্তির অন্বেষায় সে উপনীত হয়েছিল পার্শ্ববর্তী রাধাগোবিন্দের মন্দিরে। ভাবনিমগ্ন নিতাই এখানে পরিবেশন করেছিল 'রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের স্তবগান'। মধুবর্ষী কণ্ঠের গানে মুগ্ধ মন্দিরের মোহান্ত জানতে চেয়েছিলেন নিতাইর পরিচয়। অবজ্ঞাত জীবন ও তার সাম্প্রতিক অসঙ্গত জীবন-পরিবেশের তিক্ত অভিজ্ঞতায় কুণ্ঠিত নিতাই বেশ্যা-সহবাসের প্রসঙ্গ তুলেছিল। প্রত্যুত্তরে মোহান্ত বলেছিলেন :

> কর্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি ! যারা কবি, তাঁরাই তো সংসারে মহাজন তাঁরাই তো সাধক। ... প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। ... তোমার চোখের চশমার রঙের মতো তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা ? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী ?

বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জানা ছিল নিতাইর ; বাবুদের থিয়েটারে পালা দেখেছে সে। ফলে সাধক-কবির জীবন সম্পর্কে মোহান্তের নতুনতর ব্যাখ্যা পাল্টে দিল নিতাইর বিপর্যস্ত অনুভব। প্রসন্ন এক জীববোধে পুনর্জাত হল নিতাই, বেশ্যাপল্লির অসঙ্গত জীবনপঙ্কে বসবাস করেই বসন্তকে নিয়ে রচনা করল কবিতার এক পুষ্পিত ভুবন।

'বসন্তের কোকিল' শিরোনামায় বিধৃত প্রবন্ধাংশে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য লিখেছেন—'বিপর্যস্ত নিতাই-এর বিনিদ্র দু'চোখের সামনে ভোর হল, আত্মিক [?] গতির অমোঘ নিয়মে। প্রায় পালিয়ে যাবার জন্য সাত সকালে পথে বার হয়ে এক পূজারী মোহান্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। তিনি তাকে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির কথা বলেন, প্রকারান্তরে বোঝান, সবার উপরে মানুষ সত্য। বোঝায়, আলো আঁধার নিয়েই নিটোল জীবন। নিতাই ফিরে আসে ঝুমুর দলের অস্থায়ী আবাসে। দ্যাখে, ভোরের আলো এদের ঘৃণ্য জীবন যাপনেও এনেছে রূপান্তরের রঙ।' তবে, চিন্তামণি–বিল্বমঙ্গলের লোকপৌরাণিক আবহই যে বসন্ত-নিতাই কাহিনীর সাংগঠনিক ভিত্তি রচনা করেছে সে–ব্যাখ্যায় তিনি অগ্রসর হন নি। শ্রীনাভ দাস বা শ্রীনাভাজী রচিত *শ্রী শ্রী ভক্তমাল*[৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে চিন্তামণি–বেশ্যা ও সাধক-বিল্বমঙ্গলের সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী। বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গল কীভাবে চিন্তামণি প্রদর্শিত পথ ধরে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করলেন এবং পরিশেষে কোন্ উপায়ে চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গল পরস্পরের সাধন–সহায়ক গুরু ও প্রণম্য পদে উত্তীর্ণ হলেন সেই লোকপৌরাণিক কাহিনীর ভাবগত ব্যঞ্জনা অত্যন্ত

সতর্কতার সঙ্গেই তারাশঙ্কর বসন্ত–নিতাইর জীবনকথায় সঞ্চার করে দিয়েছেন। উত্তরকালে আলেপুর মেলায় 'চপেটাঘাত' দেওয়ার কথা বসন্ত যখন নিতাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তখন প্রত্যুত্তরে নিতাইকে বলতে শুনি–'সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না, ও আমার গুরুর চড়।' এই সংলাপের মধ্য দিয়ে নিতাইর চিত্তে বসন্তের স্থান নির্দেশনায় ঔপন্যাসিক–অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলত, কাহিনী ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছার পূর্বেই অসঙ্গত ও ক্লেদাক্ত জীবন পরিসরে চিন্তামণি–বিল্বমঙ্গল কাহিনীর দৃষ্টান্ত একটি আধ্যাত্মিক ভাব পরিমণ্ডল তৈরিতেও সহায়ক হয়ে ওঠে।

এভাবেই রাধাকৃষ্ণ-পুরাণের আদলে ঠাকুরঝি–নিতাই কাহিনী এবং চিন্তামণি–বিল্বমঙ্গল মিথের অনুসরণে বসন্ত–নিতাই কথার দুই কাহিনী–স্রোত উপন্যাসের উপান্তে এক অখণ্ড ভাবাদর্শে সংহত হয়েছে। *কবি*-র গঠনশৈলী বিশ্লেষণে এই দুই পুরাণ অনুষঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

তিন. দুই

কবি-র আধার ও আধেয়র ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এর নায়ক-কেন্দ্রিকতা। নিতাই যুগপৎ উপন্যাসটির নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই স্বতন্ত্র দুই নারী বিচ্ছিন্ন দুই জীবনবৃত্তে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে ; তবে উপন্যাসের পরিণতিতে নিতাইর কবিচৈতন্যে ভালবাসার এই দুই নারী একটি বিন্দুতে পরস্পরিত হয়ে গেছে। নায়কমুখ্য উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ নয়, কিন্তু একজন নায়কের চিত্তে দুই নারীর তুল্যমূল্য প্রতিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই বুঝি দৃষ্টান্ত-বিরল।

অবজ্ঞাত ও হীন উত্তরাধিকারলব্ধ নিতাইর প্রথমে কবিয়াল হিসেবে উত্থান ও শেষে সৃজনশীল কবিসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমবিকাশ–কথাই *কবি*-র কাহিনী-চুম্বক। তবে নিতাইর কবিয়ালসত্তায় উত্থানের পেছনে সক্রিয় ছিল স্বোপার্জিত এক অনন্য ইতিহাস। মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষের জলজ্যান্ত হীন উত্তরাধিকারের কারণেই কবিয়াল হিসেবে নিতাইর নবজন্ম স্বসমাজের কাছে তো বটেই, বৃহত্তর সমাজের চোখেও এক 'বিস্ময়কর সংঘটন' হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ফলে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই 'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' থেকে 'নিতাইচরণ' নাম-সম্বোধনে উত্তরণ ঘটেছিল তার। বিদ্যালয় থেকে পাওয়া পুরস্কার ও পারিতোষিক নিতাইয়ের চেতনায় জ্ঞানস্পৃহার মশাল প্রজ্বলিত করেছিল পূর্বেই। বিভিন্ন সময়ে পুরস্কার হিসেবে পাওয়া 'শিশুবোধ রামায়ণ' 'মহাভারতের কথা' 'জানোয়ারের গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে সে খুঁজে পেয়েছিল জ্ঞানানন্দের উৎস ; কুড়িয়ে পাওয়া মুদ্রিত ছিন্নপত্র আর নিজের সংগ্রহ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিত্যসঙ্গী ভ্রাম্যমাণ–দপ্তর।

নিতাইর এই স্বরচিত নিভৃত ইতিহাস স্মরণে রাখলে মানুষের মধ্যে নিহিত মানবিক সম্ভাবনার চিরায়ত দিকটি তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি। নিতাই–চরিত্র রূপায়ণে

তারাশঙ্কর সম্ভবত পরিবেশের তুলনায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষের মানবিক এই মহিমাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঠাকুরঝি ও বসন্ত–প্রতিমার তুল্যমূল্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা *কবি*-র শিখরস্পর্শী সাফল্যের অন্যতম অসামান্যতা। ঠাকুরঝি গোপবধূ, বসন্ত রূপজীবা ; তারাশঙ্কর ঠাকুরঝিকে উপমিত করেছেন 'ভূইচাঁপার সতেজ সরল' পুষ্পদণ্ডের উপমান অনুষঙ্গে, বসন্ত উদাহৃত হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ কেয়াফুলের সাদৃশ্যে। আবার ঠাকুরঝিকে উপলক্ষ করে 'স্বর্ণবিন্দু–শীর্ষ চলন্ত কাশফুল'-এর চিত্রকল্পের প্রতিতুলনায় বসন্ত 'আবেগময়ী স্রোতোস্বিনী'র উৎপ্রেক্ষায় চিহ্নিত হয়েছে। নিতাইর সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে ঔপন্যাসিক কর্তৃক বসন্তর এই রূপাবয়ব নির্মাণে আয়রনি প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু শেষ অবধি তারাশঙ্কর এই দুই নারীর মধ্যকার ব্যবধান মোচন করেছেন। মৃত্যুত্তর কালে 'বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতো দীপ্তি' নিয়েই নিতাইর মানসবিশ্বে বসন্তের অধিষ্ঠান হয়েছে।

তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় *কবি*-র গঠনরীতির ব্যতিক্রমতার কথা উল্লেখ করেছেন সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, তিনিও ঠাকুরঝি ও বসন্তর স্বতন্ত্র অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়—'তাঁর অন্য উপন্যাসে দেখা যায় পট এবং ব্যক্তি সমান প্রাধান্য পায়। এই উপন্যাস একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে পটকে তিনি স্বল্প মূল্য দিয়ে ব্যক্তিকেই মুখ্য করেছেন। নিতাইয়ের জীবনবৃত্তের দুই অংশ ঠাকুরঝি ও বসন্ত নিজেরাই যেন নিতাইয়ের পটভূমি। ঠাকুরঝি ও বসন নিতাইয়ের কাছে জীবনের দুই রূপের সন্ধান দিয়েছে। ঠাকুরঝি ও বসন যেন দুটো পাখি—একজন খাঁচার শিকে মাথা কুটে নিঃশেষ, আর একজন উড়ে উড়ে নীড় খুঁজে পেল না।'[৫] বনের পাখি খাঁচার পাখির রাবীন্দ্রিক তত্ত্ব ঠাকুরঝি-বসন্তর জীবনে কার্যকর কি না জানি না, তবে চিত্ত ও চারিত্র্য ভিন্ন হলেও এই দুই নারীর পরিণতির অভিন্নতা বিস্মৃত হওয়ার নয়। আবার এদের অকালমৃত্যুর বেদনাকে নিতাই-ই ধারণ করেছে এককভাবে ; নিতাইর মানসবিশ্বেই তাদের চিরন্তন অধিষ্ঠান। উপন্যাসের অন্তিমে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরঝি ও বসন্ত-হারা নিতাইর স্মৃতিজাগর–মুহূর্তের অনুভব—'আঃ ঠাকুরঝি, বসন দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।'—দুই নারীর ব্যবধানকে একটি বিন্দুতে সংলিপ্ত করে দেয়। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার দুই নারীর আবেদন–বৈভিন্ন্য নির্দেশ করেও পরিণামী ঐকাত্মকে চূড়ান্ত রস-পরিণাম বিবেচনা করে লিখেছেন : ' ঠাকুরঝি নিতাইয়ের স্বপ্ন, বসন্ত নিতাইয়ের অভ্যস্ত নেশা। নেশা হলেও স্বপ্ন যায় নি। বসন্ত এলেও ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। দুটিতে মিলে–মিশে নিতাইয়ের কবি জীবন। প্রেরণা ও কবিতা। কবির কাছে দুটিই সত্য। তাই মৃত্যুর পরেও ঠাকুরঝি আছে বসন্তও আছে। কবির কাছে এই দুয়েরই মৃত্যু নেই। উপন্যাসটির মূল সৌন্দর্য এখানেই।'[৬]

তিন. তিন

সংগীতের মুহুর্মুহু ব্যবহার *কবি*-র সামগ্রিক সাফল্যের অপরিহার্য উপাদান। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাসের রসপরিণতিতে চিঠি কবিতা বা গানের তাৎপর্যবহ ভূমিকা লক্ষ করেছি। কিন্তু *কবি*-র নিজস্বতা হল উপন্যাসটির কাঠামো পরিকল্পনাতেই গান একটি সম্পূরক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ–অসম্পূর্ণ মিলিয়ে *কবি*-তে ব্যবহৃত বেয়াল্লিশটি গানের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাঁর গ্রন্থে।[৭]

যেহেতু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক প্রথমে কবিয়াল থেকে ক্রমশ এক সৃষ্টিশীল কবিসত্তায় উন্নীত হয়েছে সেহেতু ঔপন্যাসিক গানকেও তার জীবন বিকাশের অনুষঙ্গে পর্বে পর্বে সুকৌশলে গ্রথিত করে দিয়েছেন। কবির জীবনবিকাশের কাহিনী কথা ও সুরের পরিপ্রেক্ষণীতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। চামুণ্ডার মেলায় ঘটনাচক্রে কবিয়াল পরিচয়ে স্বসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল নিতাইর। কিন্তু তার কবি-প্রতিভার উদ্ভব ও যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল রাজনের সান্নিধ্য ও ঠাকুরঝির প্রেরণায়। অপরপক্ষে বসন্তের হার্দিক পৃষ্ঠপোষকতায় নিতাইর সৃষ্টিচৈতন্য অর্জন করেছিল চূড়ান্ত ঋদ্ধি। ফলে সমগ্র উপন্যাসেই কাব্য ও সংগীত রচনায় এক মধুর উদ্যম নিতাই চরিত্রে পরিলক্ষিত।

বিচিত্র রসবিস্তারী গান ছড়ানো-ছিটানো থাকলেও বেদনা ও জিজ্ঞাসা–সঞ্চারী একটি বিশেষ রাগিণী প্রস্তুত করেছে *কবি* উপন্যাসের আবহসংগীত। বলাবাহুল্য যে,

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে ?"

—উত্তরহীন অনন্ত এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই *কবি*-র পরিণামী রসাবেদন নিহিত। নিতাইর স্বরচিত এই কথামালা ও সুরই যেন অন্য একটি বিচিত্র মাধ্যমে বসন্ত–পর্বের কাহিনীর সাংগীতিক-আবহ সৃজন করেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় উপন্যাসোক্ত অনামা চরিত্র বেহালাদারের কথা। 'মনের মানুষ' নির্মলার ঘরে আগন্তুকের প্রবেশে যখন মহোৎসবের কলরব ওঠে, বেহালাদার তখন বেহালায় ছড়ি চালিয়ে করুণ এক রাগিণী সৃষ্টি করে। সমব্যথী নিতাইয়ের অনুভবে এই সুর যেন জীবনে পরিব্যাপ্ত বেদনা ও জিজ্ঞাসাকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তোলে :

> বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে বাজনা তাহার ভালো জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। লম্বা টানা একটা সুর। সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিম ঝিম করিয়া ওঠে। মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে,

চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনের চিন্তা-ভাবনাও যেন অসাড় হইয়া যায়।

রোগক্লিষ্ট বসন্তের উপলব্ধিতেও নিতাইর রচনা করা গান আর বেহালাদারের বাজানো রাগিণী সৃষ্টি করে অভিন্ন ব্যঞ্জনা—

বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভালো লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয় ? তার ওপর ওই গান [জীবন এত ছোট কেনে ?] তোমার মনে এসেছে ? কী করে এল?

এ কারণেই রাগিণীটি, অপরিমেয় ভালবাসার তুলনায় জীবন পরিসরের সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণা ও আর্তি সঞ্চার করে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বসন্তকে আশঙ্কায় উদ্বেলিত করে তোলে :

—বেহালা ! বেহালা বাজাতে বারণ কর গো !...

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না ? ওই যে, ওই যে, কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে।

সাংগীতিক ভাব-পরিমণ্ডল *কবি*-র সংগঠন-বৈশিষ্ট্যের এক ব্যতিক্রমী প্রান্ত। বিশেষত পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র হিসেবে অনামা বেহালাদারের সৃজন করা সুরলহরীতে সঞ্চারিত হয়েছে উপন্যাসটির আবহ-সংগীত।

তিন. চার

কবি-র জীবপট একটি বিশেষ আঞ্চলিক-ভৌগোলিক সীমায় বিন্যস্ত। রাঢ় বাংলার নিম্ন–আর্থশ্রেণীর মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পটভূমিকায় ব্যক্তির হৃদয়গত সংকটের শিল্পসৃজনই ছিল তারাশঙ্করের অন্বিষ্ট। তিনি এই জীবনের মধ্যেই সন্ধান করেছেন নাটকীয়তা ও নাট্যরস। নাট্যঘন মুহূর্ত সৃজন তারাশঙ্করের প্রিয় রচনাকৌশল। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে এই কৌশল কখনো-কখনো কার্যকরণ–তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রোম্যান্সের ভুবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। তবে *কবি*-তে সৃষ্ট নাট্যরস জীবন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেই সাফল্য পেয়েছে। কবিয়াল হিসেবে নিতাইর নবজন্মের ঘটনায়, কবিয়ালের ঘরের জানালায় ঠাকুরঝির চকিত ছায়া ও অপস্রিয়মাণ ছবির দৃশ্যে, আলেপুরের মেলায় ক্রুদ্ধ বসন্ত কর্তৃক নিতাইকে দেওয়া চপেটাঘাতে, বসন্ত–নিতাইর আকস্মিক গাঁটছড়া বাঁধনে যে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিধৃত জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন বলেই অতিনাটকীয়তামুক্ত।

সংলাপ–রচনার ক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করে ন তারাশঙ্কর। এই সাফল্যের উৎস দ্বিবিধ। প্রথমত, সংলাপ উচ্চারণে শেকড়নিষ্ঠ জীবনের আঁকাড়া রূপ ও রং উঠে এসেছে ; দ্বিতীয়ত, ক্ষেত্র বিশেষে, আবে অনুভবপুঞ্জ সং সক্ষম হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতজনের সংলাপে শিষ্টজনের প্রমিতভাষার সঙ্গে লোকজ জীবনের ভাষার মিশেল *কবি*–র ভাষাবৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য দিক। কবিয়াল-রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার পর প্রমিত ভাষায় উচ্চারণ-প্রয়াসী নিতাইর কৌতুককর বাচনরীতি, যা এক মিশ্র ভাষা–রীতির জন্ম দিয়েছে, তাও বাস্তবানুগ বলেই জীবনস্পর্শী।

কাশীর জীবনে ভাষা-প্রসঙ্গে নিতাইর উপলব্ধির মধ্যেও কথাশিল্পী তারাশঙ্করের ভাষা-ভাবনার পরিচয় পরিস্ফুট।

তিন. পাঁচ

তারাশঙ্করের সমাজরাজনীতি–অন্বিত উপন্যাসগুচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রের নামান্তরে 'এক ব্যক্তির পথ–চলার কাহিনী'[৮] বিধৃত হয়েছে। আদর্শবাদী ওইসব চরিত্রের গন্তব্যও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী। জীবনপটের ভিন্নতার কারণেই *কবি*–তে ওই পথচলার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। তবু সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নিতাইর মধ্যে 'যাযাবর' বা 'মুসাফের' সত্তার অন্তর্গূঢ় প্রেরণা সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। উপন্যাসের প্রারম্ভে, মধ্যে কিংবা শেষে নিতাইর যে ছবিটি সমগ্র উপন্যাসে রূপময় হয়ে আছে সে-নিতাই চলিষ্ণু ; কৃষ্ণচূড়ার ছায়াঘেরা প্রান্তরে দণ্ডায়মান কিংবা দেশে–বিদেশে ভ্রাম্যমাণ এক পথিক-আত্মা। নিতাইর পথিকসত্তার অভিব্যঞ্জনা উপন্যাসের চূড়ান্ত রসাবেদনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলেই মনোহারী।

তিন. ছয়

কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাইর প্রেক্ষণবিন্দু-জাত একটি চালচ্চিত্রিক পরিচর্যা সমকালীন সাহিত্যে *কবি*-র প্রাতিস্বিকতা উজ্জ্বল করে রেখেছে। ঠাকুরঝিকে উপলক্ষ করে 'স্বর্ণবিন্দু-শীর্ষ চলন্ত কাশফুলে'র চিত্রকল্পটি যুগপৎ পুনরাবৃত্ত অভিপ্রায় [repetitive motif] হিসেবেও কার্যকর হয়েছে। নিতাইর চিত্তলোকে ঠাকুরঝির অধিষ্ঠানকে চিরন্তন–মূল্যে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকেই চলমান এই চিত্র পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। zoom in এবং zoom out–এর মাধ্যমে দূরকে কাছে এবং নিকটকে দূরে স্থাপনার চালচ্চিত্রিক কৌশল চিত্রকল্পটির অপূর্বত্ব ও অনন্যতার উৎস। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> [ক] নিতাইও চাহিয়াছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইনের সমান্তরাল শাণিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, সেই বিন্দুটির দিকে। সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মতো একটি রেখা। রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু, যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ! [zoom in]
>
> [খ] হ্যাঁ—ওই যে দুধবরন কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেললাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মতো চলিয়াছে। মাথায় কেবল স্বর্ণবিন্দুটি নাই। [zoom out]

'স্বর্ণবিন্দু–শীর্ষ চলন্ত কাশফুল'-চিত্রকল্পের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নিতাইর চৈতন্যে ঠাকুরঝির অবস্থানকে সুচিহ্নিত করার ঔপন্যাসিক শিল্পকৌশল। নিকটকে দূরে কিংবা দূরকে নিকটবর্তী করার মধ্য দিয়ে ঠাকুরঝির সচল অস্তিত্ব রূপান্বিত হলেও, আত্মজিজ্ঞাসা–মুখর নিতাইর চৈতন্যে 'মনের মানুষ' রূপে অধিষ্ঠান মাত্রই অন্তত একবারের জন্য হলেও, ঠাকুরঝি-চিত্রকল্পের সচলতা একটি freeze up শট্–এ স্থিরতা পায়। দৃষ্টান্ত অনুধাবনীয় :

রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না, চলিয়া যায় না, স্থির।

নিতাইর মনোবিশ্বে ঠাকুরঝির অচঞ্চল ও স্থির আসন নির্দেশনায় চালচ্চিত্রিক এই পরিচর্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকায় যুগপৎ আধুনিক ও নান্দনিক।

চার

জীবনের ক্ষণিকতার তুলনায় অন্তহীন অপরাজিত ভালবাসার ব্যাপ্তি ও মাধুর্যই *কবি*–তে বিধৃত তারাশঙ্করের জীবনার্থ। ব্রাত্যসমাজ-পটে স্থাপিত লোকায়ত জনজীবনের এক রক্তার্দ্র-হৃদয় কবিআত্মার হার্দিক সংকট ও তার সদর্থক জীবনবিশ্বাসে উত্তরণের নান্দনিক অঙ্গসংস্থানই *কবি*–র সৌন্দর্য ও বৈভব।

তথ্যনির্দেশ

১ *কবি*; প্রথম প্রকাশ :১৩৪৮ (মার্চ ১৯৪২)। উৎসর্গ : 'সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু'। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে *কবি* পাটনা থেকে প্রকাশিত ও মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত *প্রভাতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বীজ–গল্প 'কবি' *প্রবাসী* মাসিকপত্রের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের একটি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। উপন্যাসটি অভিন্ন নামে ১৯৫৪ সনে হিন্দিতে এবং ১৯৭৩ সনে ওড়িয়াতে অনূদিত হয়। *কবি* উপন্যাসের বাংলা চলচ্চিত্র রূপ দেন দেবকী বসু।

২ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ; "কবি : অন্তহীন সৃজনে, সন্ধানে" : *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা ১৩৯৯ (সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু)।

৩ 'ঠাকুরঝি পরস্ত্রী। যেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই রূপান্তরিত একটি ঘটনার পুনরাভিনয় হতে চলেছে।' উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ; "তারাশঙ্করের কবি, পুনর্মূল্যায়ন" : *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : প্র. প্র. জানুয়ারি ১৯৮৭), পৃ. ১১

৪ *দ্র. বৃহৎ শ্রী শ্রী ভক্তমাল গ্রন্থ* ; সম্পাদক : শ্রী দিলীপ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা : প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৯৯), পৃ. ২২৭– ৩২, ৬৩৭–৩৮

৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা : ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৫), দ্র. পৃ. ২৫৬–৫৭

৬ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৭ চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় ; *উপন্যাসে আঙ্গিক : বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর* (কলকাতা : প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৯০), দ্র. পৃ. ১২৩-২৪

৮ ক্ষেত্র গুপ্ত ; "তারাশঙ্করের উপন্যাস : শিল্পরীতি" : *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য* (সম্পাদক : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার), (কলকাতা : প্র. প্র. চৈত্র ১৩৮৪), পৃ. ৪০

নাগিনী কন্যার কাহিনী : জীবনতৃষ্ণাই মূলকথা

সৈয়দ আজিজুল হক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প *কল্লোল* পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৩৪) হলেও তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নন। যুদ্ধোত্তর ক্লেদ ও অবক্ষয়ক্লিষ্ট জটিল জীবনবোধ-আশ্রয়ী সাহিত্য প্রবণতা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি ; বরং তাঁর অন্বিষ্ট ছিল এক সুস্থ সবল রসমণ্ডিত জীবনচেতনা। জন্মভূমি দক্ষিণপূর্ব বীরভূম তথা রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত্বমণ্ডিত প্রকৃতি, তার আবহাওয়া, বৈচিত্র্যদীপ্ত সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত তারাশঙ্করের সদর্থক চেতনা নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। তারাশঙ্করের সৃষ্টিজগতের প্রধান অংশ জুড়েই দীপ্ত হয়ে উঠেছে রাঢ় অঞ্চলের নানামাত্রিক জীবন।[১] তাঁর সাহিত্যপ্রেরণা কখনও অগ্রসর হয়েছে এই জীবনের রাজপথ ধরে, কখনও আবার রাজপথ ছাড়িয়ে গলিঘুজি বেয়ে কোনো অনার্য ব্রাত্য জীবন ও তার সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেছে। রাঢ় অঞ্চলেই লোকায়ত জীবনের বিচিত্র সব শাখা আদিকাল থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে। ডোম, বাউরি, বীরবংশী, সাঁওতাল, কাহার, সাপুড়ে বা বেদে ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে।[২] মূল সমাজধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এমনই এক সম্প্রদায় সাঁতালীর বিষ-বেদের জীবনবৈচিত্র্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে তাঁর *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২)।

কিন্তু এ উপন্যাসটি এখনকার পাঠকদের কাছে কেন প্রাসঙ্গিক?—সে প্রশ্নের মীমাংসাসূত্রেই আমাদের আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব তারাশঙ্করের শিল্পপ্রেরণার মৌল উৎস সেই সংস্কৃতির অর্ন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবনের একটি যুক্তি অবশ্যই আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : 'তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অধ্যায়।'[৩] সমালোচকদের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিমত নেই। এ উপন্যাসের আলোচনায় সকল বিশ্লেষকই [৪] তা অনুধাবন করে এর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তাঁদের বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক তারাশঙ্করের আঞ্চলিক সংস্কৃতি-নির্ভর উপন্যাসসমষ্টিকেই বলেছেন তাঁর সমৃদ্ধ ও সার্থক রচনা।[৫] বিজিতকুমার দত্ত *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-কেই তারাশঙ্করের 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা' বলেছেন।[৬] সন্দেহ নেই, এসব মন্তব্যের মূলে সক্রিয় বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারা, তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের এক বিচিত্র জগৎ। এ উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে উপকথা, লোককথা ও লোকপুরাণের বিস্তৃত উপাদান।

সমালোচকগণ তার মর্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তার নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন এবং একটি অনার্য জনগোষ্ঠীর জীবনে ওইসব লোককথা ও লোকপুরাণের সর্বগ্রাসী প্রভাবের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং এ উপন্যাসের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আলোচনায় নতুন মাত্রা সংযোজনের অবকাশ কম। বলার কথা এটুকুই যে, পাশ্চাত্যের অরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য পোষণ করেন তারাশঙ্করের উপন্যাস তার বিরুদ্ধে এক সার্থক প্রতিবাদ। পাশ্চাত্য অরিয়েন্টালিস্টরা মনে করেন, প্রাচ্যীয় সমাজ যেমন দুর্বল ও স্থবির তেমনি বিকাশহীন ও নিষ্ক্রিয়। সে কারণে প্রকৃত অর্থে প্রাচ্যের কোনো সংস্কৃতিই নেই, থাকলেও তা উন্নত বা ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয় মোটেই। তারাশঙ্করের এ উপন্যাস ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আচ্ছন্ন ওরিয়েন্টালিস্টদের এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, এ সংস্কৃতি দুবর্লও নয়, ঐশ্বর্যহীনও নয়।

বেদে-জীবন ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *আমার কালের কথায়* (১৯৫১) তার একাধিক প্রমাণ আছে।[৭] তাঁর 'বেদেনী' বা 'নারী ও নাগিনী' গল্পও এ অভিজ্ঞতারই ফল।[৮] *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে তারাশঙ্করের ব্যক্তি জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিক কল্পনার বিস্তার। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নাগিনী কন্যার পরিকল্পনাটি আশ্চর্য রকমের মৌলিক ; বাংলাদেশের অসংখ্য অনার্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটির গোপনতম জীবনরসনির্যাস যেন ইহারই মধ্যে নিহিত।'[৯] পল্লব সেনগুপ্ত আরও স্পষ্ট করে বলেছেন :

> নাগিনীকন্যা আইডিয়াটির কথা এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। বাংলার বিষবেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে বস্তুতপক্ষে এই ধরনের কোনও পদ নেই। অথচ, এমনই একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোনও একজন বিশেষ নারীর অস্তিত্ব বিশ্বের বহু আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে ; এবং সেই মেয়েরা, তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী ঠিক এই কাহিনীর শবলা-পিঙ্গলার মতোই অনন্যসাধারণ একটা মর্যাদা ও গুরুত্ব পান।[১০]

নাগিনী কন্যার কাহিনী-র বাইরের ছাঁচটি উপকথা-লোকপুরাণের সম্মিলিত রসায়নে গড়া। কিন্তু ভেতরের আখ্যানটি একান্তভাবে মানবিক। পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, 'মিথ' এবং 'বাস্তব' এ উপন্যাসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।[১১] কিন্তু যথার্থই কি তাই? বিশ্বাস ও সংস্কারের আবরণ ভেদ করে আমাদের কাছে কি শবলা-পিঙলার জীবনযন্ত্রণার আবেদনটিই মুখ্য হয়ে ওঠে না ? নিশ্চয়ই ওঠে। এবং এর কারণ, শবলা ও পিঙলার জীবনযন্ত্রণার মূলে সক্রিয় তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য ; বিশেষভাবে এই দুই তরুণীর প্রবলতর জীবনবাসনা। আর একথাও ঠিক, লোকপুরাণের বিশ্বাসের জগৎ ছেড়ে যেখানে এই দুই নারী জীবনতৃষ্ণায় একান্তভাবে কাতর হয়ে ওঠে সেখানেই এ উপন্যাসটি প্রকৃত সার্থকতা অর্জন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নাগিনী কন্যার প্রচলিত সংস্কারে আস্থাশীল

ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জীবনযন্ত্রণামুক্ত। কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে জীবনোপভোগের স্পৃহা জেগেছে তখনই তাদের যন্ত্রণার শুরু। এই ভোগবাসনাকে লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। এটিকে মানবীয় গুণ হিসেবে দেখেছেন বলে পাঠককেও এর প্রতি সহমর্মী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আর এ কারণেই *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র উপন্যাসোচিত সমস্যাটি লোকপুরাণের বাইরের ছাঁচের মধ্যে নয় বরং শবলা ও পিঙলার জীবন-অভীপ্সার মধ্যেই নিহিত।[১২] উপন্যাসটির শিল্পসার্থকতার মৌল উপাদানও নিহিত এই দুই চরিত্রের জীবনচিত্রণের দক্ষতার মধ্যে। নাগিনী কন্যার আইডিয়াটি লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত, একথা আমরা আগেই বলেছি। উপন্যাসে বিধৃত লোককাহিনী মতে, এই কন্যা পাঁচ বছর বয়সের পূর্বেই বিধবা হবে, ষোল বছর বয়স পর্যন্ত থাকবে পুনর্বিবাহ থেকে বঞ্চিত এবং ষোল বছর বয়সের পূর্বেই তার মধ্যে নাগিনী-লক্ষণ ফুটবে অর্থাৎ কপালে তার দেখা যাবে 'চক্রচিহ্ন'। বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই নাগিনী কন্যাই মনসা দেবীর পূজা দেয়। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে তাকে মান্য করা হয়। তাকে থাকতে হয় কামবাসনাহীন। হৃদয়ে কামবাসনা জাগ্রত হলে আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে নাগিনী কন্যার আসনচ্যুত হয় সে। এ উপন্যাসে যে দুই নাগিনী কন্যার জীবনচিত্র বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তাদের উভয়ের মনেই কামবাসনা জাগ্রত হয়েছিল। শুধু ওই দুজন নয়, এ উপন্যাসে আরও অনেক নাগিনী কন্যারই একই রূপ জীবন-পরিণতির কথা বলা হয়েছে।[১৩]

শবলা ও পিঙলার জীবনকাহিনী কিংবা অন্যান্য নাগিনী কন্যার জীবন-পরিণতির বিবরণসূত্রে এ উপন্যাসে এটি প্রমাণিত যে, দেবতার নির্দেশ, ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা আধ্যাত্মিকতার যে বর্ম এসব নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা তাদের মানবধর্মের জাগরণকে স্তব্ধ করতে পারে নি। তারুণ্যের স্পৃহা তাদের জীবনবাসনার স্বাভাবিক গতি হিসেবেই জাগ্রত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সের পূর্বেই বৈধব্য অর্জন এবং ষোল বছর বয়সের প্রাক্কালে নাগিনী কন্যার আসনে বসার পর সেই বৈধব্যকেই টেনে-চলা— এসবের মধ্যে জীবনভোগ থেকে বঞ্চিত থাকার যে অব্যাহত গতি তা তো কোনো উপন্যাসের বিষয় হিসেবে অন্বিষ্ট হতে পারে না। উপন্যাসের অন্বিষ্ট হলো জীবন, জীবনের শতধারার বিকাশ ও স্পন্দন, কোনোভাবে মর্বিডিটি নয়। শবলা ও পিঙলার জীবনবাসনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের চিত্ররচনার মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক তাঁর স্বধর্ম রক্ষা করেছেন।

শবলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বেদে সম্প্রদায়ের এক তরুণ। এই আকর্ষণসূত্রে শবলার হৃদয়ও আলোড়িত, বিচলিত এবং ভোগবাসনায় উদ্দীপিত হয়েছিল। ওই তরুণ তাকে বলেছিল, 'শবলা, ই সব মিছে কথা রে, সব মিছে কথা, মানুষ লাগিনী হয় না।' (*তা.র.৮*।। ১২২)। ওই তরুণ তাকে পালিয়ে দেশান্তরে গিয়ে তার সঙ্গে সংসার গড়ার

প্রস্তাব দিয়েছিল। পারস্পরিক এই আকর্ষণ কোনো জৈবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার মতো পরিণাম অর্জনের সুযোগ পায় নি। তার পূর্বেই বেদে সম্প্রদায়ের প্রধান 'শিরবেদে'র কুটিল ও নির্মম ষড়যন্ত্রের ফলে অপমৃত্যুর শিকার হয় ওই তরুণ। শবলার মনে নাগিনী কন্যা সংক্রান্ত সংস্কার আর্কেটাইপ রূপে মূলীভূত হয়েছিল। যে কারণে তার পক্ষে ওই তরুণের প্রবল আহ্বানে যথোচিত সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু শিরবেদে মহাদেবের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ও তার পরিণতিতে তার প্রেমিক পুরুষের অপমৃত্যুর ঘটনায় ওই মূলীভূত সংস্কারের ভিত্তিই উপড়ে পড়ে। পরে তার মধ্যেও এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়—যা পিঙলাকে সে বলেছিল—'নাগিনী কন্যা মিছে কথা, কন্যে আবার নাগিনী হয়! কই, বোঝলাম না তো কিছু!' (*তা.র.৮।।১৮২*)। অতঃপর খুনী, মিথ্যেবাদী ও শোষক মহাদেবের ধর্মনাশ ও তাকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে জীবনোপভোগের আনন্দময় পথে বেরিয়ে পড়ে শবলা। তবে এর আগে সে তার পরবর্তী নাগিনী কন্যা পিঙলাকে বলে যায় এই জীবনের যন্ত্রণা এবং শিরবেদের সঙ্গে নাগিনী কন্যার সম্পর্কের অন্তর্গত নানা দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের কথা।

শিরবেদের সঙ্গে নাগিনী কন্যার একটি চিরকালীন শত্রুতার সম্পর্ক আছে। শবলার সঙ্গে মহাদেবের এবং পিঙলার সঙ্গে গঙ্গারামের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা আভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের দিক থেকে এই সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই যে, মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে শুভ ও অশুভ-র যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেটাই এখানে প্রতিফলিত। কপালে চক্রচিহ্ন দেখে যদিও শিরবেদেই নাগিনী কন্যা নির্বাচন করেন কিন্তু এই দেখার বিষয়টি যে পূর্ণতর সততা ও আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন তাও বলা যাবে না। সর্দার হিসেবে শিরবেদে বেদে সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিলেও আধ্যাত্মিক শক্তির আধার হিসেবে নাগিনী কন্যাই মান্য। শিরবেদে নেতৃত্বের সুযোগে নিজ সম্প্রদায়কে নানাভাবে ঠকায়, শোষণ করে, নানা মিথ্যার আশ্রয় সে নেয়। অসততা, ভণ্ডামি, প্রতারণা প্রভৃতি শিরবেদে-চরিত্রেরই অংশ—একথা অন্তত মহাদেব ও গঙ্গারাম প্রসঙ্গে বলা যায়। এর বিপরীতে নাগিনী কন্যার চরিত্র সততা ও শুদ্ধতার প্রতীক। ফলে এদের দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। নেতৃত্বের শক্তির সঙ্গে দৈবীশক্তির এই দ্বন্দ্ব তীব্রতা অর্জন করে শিরবেদের শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে নাগিনী কন্যার সাহসী প্রতিবাদের ফলে। অন্যদিকে শিরবেদের মনে নাগিনী কন্যাকে ভোগ করার গোপন কামনাও জাগে। সেক্ষেত্রেও নাগিনী কন্যার দিক থেকে থাকে প্রবলতর বাধা। এসব দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন যখন তীব্র হয়ে ওঠে, নাগিনী কন্যা যখন শিরবেদের সংকীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নেয়, শিরবেদে তখন কৌশলে তাকে বিনাশ করতে চায়। সুকৌশলে হত্যার এই প্রয়াস আমরা মহাদেব ও গঙ্গারাম উভয়ের দিক থেকেই লক্ষ করি। মহাদেব শবলাকে সর্পদংশনের মাধ্যমে এবং গঙ্গারাম পিঙলাকে তীরবিদ্ধ করে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু এই হত্যা-প্রয়াস সফল না হলে আরেকটি কৌশলের আশ্রয় তারা নেয়। আর তা

হলো—নাগিনী কন্যার মনে কামবাসনা জাগরণের অপবাদ দেওয়া। কেননা এরূপ অপবাদ নাগিনী কন্যার দৈবীশক্তি নাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান। তাছাড়া এ ধরনের অপবাদের পেছনে কিছু বাস্তব ঘটনাসূত্রও জড়িত থাকে। ফলে এটিই শেষ পর্যন্ত মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শবলা ও পিঙলার জীবনকাহিনীতে একই রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ করি। নাগিনী কন্যা চরিত্রের একটি বড়ো উপাদান হলো, শুভ ও কল্যাণের প্রতীক সে। শিরবেদের শোষণ, মিথ্যাচার ও প্রতারণার ফলে যেসব অধর্মের ঘটনা ঘটে তার বিরুদ্ধে নাগিনী কন্যা সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে নিজেকে নিবেদন করে। সে প্রতিবাদী হয়। অধর্ম থেকে রক্ষা করে সে নিজ সম্প্রদায়কে। একে সে তার কর্তব্য বলেই বিবেচনা করে। শিবরাম কবিরাজকে সাপ সম্পর্কিত শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও মহাদেব যখন প্রতারণার মাধ্যমে তা ভঙ্গ করে তখন শবলা এর মধ্যে এক বড়ো ধরনের অধর্মাচার দেখতে পায়। এই অধর্মাচারের অকল্যাণ থেকে বেদে সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্যই সে নিজে গিয়ে শিবরাম কবিরাজকে ওই শিক্ষা দিয়ে আসে।

পিঙলার মধ্যেও একই রূপ শুভবোধের জাগরণ আমরা লক্ষ করি। বড় জমিদার বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে যখন গঙ্গারাম ও ভাদুর প্রতারণাপূর্ণ কৌশল ফাঁস হয়ে সাঁতালীর বেদে সম্প্রদায়ের সুনাম চিরতরে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম ঘটে তখন সমগ্র সম্প্রদায়কে সেই আসন্ন কলঙ্ক থেকে রক্ষা করে পিঙলা। সাপ ধরার আগে দেহতল্লাশি করার প্রস্তাব যাতে কার্যকরী হতে না পারে সেজন্য সে নিজেই উপস্থিত জনসমষ্টির সামনে পূর্ণ নগ্ন হয় এবং নিজে একাই যায় সাপ ধরতে। সফল হয় সে, পুরো সম্প্রদায়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতেও সক্ষম হয়। কিন্তু এই ঘটনা তার হৃদয়ে যে প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে তা তার স্বাভাবিক অভ্যস্ত জীবনধারায় নিয়ে আসে এক সুগভীর পরিবর্তন। মনোরোগের শিকার হয় সে। যে রোগের প্রকাশ ঘটে ঘন ঘন মূর্ছা যাওয়ার ঘটনায়।

পিঙলার নগ্ন হওয়ার ঘটনা থেকে তার রোগগ্রস্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু—এই সবকিছুর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। উপন্যাসের এ অংশ হয়ে উঠেছে এক মানবীর প্রকৃত মানবীয় সমস্যার আখ্যান। বাইরের দিক থেকে দেখলে, পিঙলার নগ্ন হওয়ার মধ্যে তার নিজ সম্প্রদায়ের সুনাম রক্ষার প্রেরণাই সক্রিয়। এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা ভাবার অবকাশ তার ছিল না। কিন্তু জনসমক্ষে এভাবে নগ্ন হওয়ার ঘটনা একটি সুস্থ শিক্ষিত নারীর জীবনে যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এই অশিক্ষিত অন্ত্যজ নারীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। দ্বিতীয়ত, পিঙলার মামা ভাদু ওই ঘটনার পর থেকে শতমুখে প্রচার করে যে, ওইদিন পিঙলার অনাবৃত দেহে নারীরূপ সে দেখেনি, দেখেছে প্রকৃত নাগিনী রূপ। ভাদুর এই বক্তব্য সমগ্র বেদে সম্প্রদায়ের মতো পিঙলাকেও আচ্ছন্ন করে। তৃতীয়ত, যার সামনে

সে নগ্ন হয়েছিল সে ছিল এক সুদর্শন, সুপুরুষ ; আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, রাঢ় দেশের নাগের ওঝা, 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী' বলে পরিচিত বিখ্যাত নাগেশ্বর ঠাকুর। পিঙলার সাপ ধরার পর নাগেশ্বর বা নাগু ঠাকুর দারুণ প্রশংসা করে পিঙলাকে বলেছিল, 'হাঁ তু সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যে!' (*তা.র.৮*।।১৭২)। নাগু ঠাকুর পিঙলাকে নিজ হাতে পানি খেতে দিয়েছিল, দিয়েছিল তার 'প্রসাদী কারণ'। তাছাড়া নিজের আঙুল থেকে অষ্টধাতুর একটি আংটি খুলে পিঙলার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'আমার থাকলে, তোকে আমি হীরের আংটি দিতাম।' (*তা.র.৮*।।১৮৪)। এখানেই শেষ নয়। এর একমাসের মধ্যে নাগু ঠাকুর গিয়েছিল হিজল বিল অঞ্চলে সাঁতালীর বিষ-বেদেদের বসবাসের স্থানে। গিয়ে সে পিঙলার প্রতি তার অনুরাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলে, পিঙলাকে না হলে তার জীবনই মিছে। একই সঙ্গে সে জানায়, মনসাদেবীর কাছ থেকে এই মর্মে সে নাগবার্তা পেয়েছে যে, নাগিনী কন্যা পিঙলার ঋণশোধ হয়েছে, কন্যার এবারে ছুটি। সুতরাং পিঙলাকে তার কাছে সমর্পণ করতে কোনো বাধা নেই।

নাগেশ্বর ঠাকুরের মুখ থেকে এই কাহিনী শুনতে শুনতেই পিঙলা সকলের সামনে মূর্ছা যায়। তার রোগের প্রকাশ ঘটে এই প্রথম। জনসমক্ষে নগ্ন হওয়া, ভাদুর চোখে সেই নগ্ন দেহে নাগিনী রূপ দর্শন, নাগু ঠাকুরের প্রণয়ানুরাগ এবং দেবীর কাছ থেকে তার ঋণশোধের বার্তা নিয়ে আসা প্রভৃতি ঘটনার সম্মিলিত আক্রমণে তার মনের সুস্থিরতা যায় বিনষ্ট হয়ে। মনোরোগে আক্রান্ত হয় সে। শিবরাম কবিরাজের মুখ দিয়ে লেখক পিঙলার মানসিক অবস্থার যে মূল্যায়ন করেন তা যথার্থ :

> উন্মাদ রোগের ওই লক্ষণ। একটা মনোবেদনা বা অন্ধ বিশ্বাস নিরন্তর মানুষের মন এবং দেহের মধ্যে সৃষ্টি করে গুমোটের, যে ভাবনা প্রকাশ করতে পারে না মানুষ, সেই নিরুদ্ধ অপ্রকাশিত ভাবনা বায়ুকে কুপিত ক'রে তোলে। তারপর প্রকৃতির নিয়মে কুপিত বায়ু ঝড়ের মত প্রবাহিত হয়। তখন এই বেদনা বা বিশ্বাস মেঘের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ক'রে দুর্যোগের সৃষ্টি করে। (*তা.র.৮*।।১৯১)

এই বিশ্লেষণটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানেরও নিকটবর্তী। কিন্তু অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বেদে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এটি রোগের লক্ষণ নয়। তারা মনে করে, পিঙলার মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা ঘটে তখনই যখন দেবী এসে তাকে আশ্রয় করে। বেদে সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস তার রোগ বৃদ্ধির আরও সহায়ক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নাগু ঠাকুর কর্তৃক পিঙলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকে গঙ্গারামের আচরণ হয়ে ওঠে আরও কুটিল, নিষ্ঠুর ও ষড়যন্ত্রমূলক। প্রতি রাতে সে কৃত্রিমভাবে পিঙলার কুটিরে কাঠালিচাঁপার সুগন্ধী ছড়িয়ে পিঙলার মনেই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে, তার নিজের শরীর থেকেই বের হচ্ছে এ গন্ধ। বেদে সমাজে এটি কোনো নারীর মনে কামবাসনা জাগ্রত হওয়ার প্রতীকরূপে বিবেচিত। ফলে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, নাগিনী কন্যার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে। এই বোধ এবং এই সবকিছুর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তাকে আরও বেশি অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। এ পর্যায়ে তার একমাত্র সান্ত্বনা, বাঁচার

একমাত্র উপায়—নাগু ঠাকুর যদি তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। নাগু ঠাকুরের জন্য তাই সে প্রতীক্ষা করে, একান্তভাবে তারই পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হওয়ার পূর্বেই গঙ্গারাম সর্বসমক্ষে তার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয় যে তার শরীর থেকে সত্যি সত্যি কাঠালিচাঁপার গন্ধ বের হচ্ছে। এই স্বীকারোক্তির ফলে স্বসম্প্রদায়ের কাছে নাগিনী কন্যা হিসেবে পিঙলার মৃত্যু ঘটে। আর এ কারণে প্রকৃত মৃত্যুকেও সে বরণ করে নেয় আত্ম-হত্যার মাধ্যমে।

পিঙলার মানসিক সংকট সৃষ্টির মূলে সক্রিয় অনেকগুলি উপাদান। প্রথমত, তাঁর ঐশী বিশ্বাস ও নাগিনী কন্যা হিসেবে স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ সম্পর্কে বা তাদের সুনাম রক্ষার দায়িত্ববোধ বা শুভ কামনা ; আর এর বিপরীতে শিরবেদের মিথ্যাচার, অনৈতিকতা ও অধর্মাচার, এবং এ দুয়ের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত, নাগু ঠাকুরের প্রণয় নিবেদন ও ঋণশোধ সংক্রান্ত দেবীর ছাড়পত্র প্রাপ্তির ঘোষণা যা পিঙলার মধ্যে প্রণয়াবেগ সৃষ্টির পাশাপাশি নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বকেও করে তীব্রতর। তৃতীয়ত, নাগু ঠাকুরকে গঙ্গারামের বাধাদান ও তৎপরবর্তী কুটিল ষড়যন্ত্র—যা পিঙলার মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে তীব্র করে এবং একই সঙ্গে তার আত্মহত্যাকেও অনিবার্য করে তোলে। শবলার মতো পিঙলা জৈববাসনায় প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হয় নি। কোনো মানবী নাগিনী কন্যা হতে পারে না—এমন বিশ্বাসেও সে স্থিত হয় নি শবলার মতো। তবে নাগু ঠাকুরকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে প্রণয়াবেগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নাগু ঠাকুরের সঙ্গে সম্মানজনকভাবে তার যাওয়া সম্ভব হলে সে যেতও। আসলে শবলা ও পিঙলা দুটি নাগিনী কন্যা হলেও এদের মাধ্যমে যেন একটি নাগিনী কন্যার কাহিনীই সামগ্রিকতা অর্জন করেছে। পিঙলার মাধ্যমে শবলার জীবনকাহিনীই যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী বলেছেন, 'তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের লোকায়ত স্তরের যে বিভিন্ন নরনারীর ছবি এঁকেছেন...তাদের আদিম জীবনে কান্ত কোমল কোন ধর্মের সংস্কার বা পরিশীলন নেই। তারা একান্তভাবে আদিম, 'এলিমেন্টাল'। তাদের জীবন একটিমাত্র সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তা হ'ল প্রবল জৈবসংস্কার। বেঁচে থাকার উদ্দাম তাগিদ, আর সেই সঙ্গে বিচিত্র অন্ধপ্রবৃত্তির তাড়না।'[১৪] অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, 'রাঢ়ের আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশে লোকায়ত নরনারীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির অমোঘ রূপ তারাশঙ্কর গভীর বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন, প্রবৃত্তিই মানুষের অনিবার্য নিয়তি। প্রবৃত্তির নিগূঢ় অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মানুষ আপন অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে ছুটে চলে।'[১৫]

যে দুই নারীর কাহিনী এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য তাদের জীবনেতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কি এই বক্তব্যকে যথার্থ বলতে পারি ? অন্ধ প্রবৃত্তি তাড়নাই কি এদের জীবনের মূলকথা ? স্বসম্প্রদায়ের শুভ কামনা কি এখানে নেই ? এখানে কি নেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম ? এই দুই নারী যদি পরাজিত

হয়ে থাকে, তা কি প্রবৃত্তিতাড়নার কাছে ? না কি অশুভ শক্তির কুটিল ষড়যন্ত্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের কাছে ? আসলে সমালোচক অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না যাকে বলেছেন, সেটি শবলা ও পিঙলা উভয়ের কাছে প্রকৃত জীবনপিপাসা। চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়সের দুই নারী, কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জীবনোপভোগ থেকে যাদের বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, জীবনভোগের বাসনায় তারা উদ্দীপ্ত হবে— এটাই স্বাভাবিক। এরূপ জীবনতৃষ্ণার কাহিনীই একজন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য : 'এমনি ভাবে রাঢ়ের সংস্কৃতি এক জটিল মিশ্ররূপ লাভ করেছে। আর এই সংস্কৃতি, এই জীবন পরিবেশের মধ্যে তারাশঙ্করের শিল্পী-সত্তা ক্রমশ গড়ে উঠেছে। উত্তরকালে এই রাঢ় অঞ্চলের জীবনভাষ্য তিনি রচনা করেছেন। এই দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সমাজ, সংস্কৃতি, এখানকার বিচিত্র নরনারী, এই অঞ্চলের বিচিত্র জনশ্রুতি, গাথাকাহিনী ও অন্ধ সংস্কার বহু বিচিত্র উপকরণের সমবায়ে এক রসোত্তীর্ণ আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা তারাশঙ্কর।' (*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪২)

২ এদের জীবনকে কেন্দ্র করেই তারাশঙ্কর রচনা করেছেন : *কালিন্দী* (১৯৪০), *কবি* (১৯৪২), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২), *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) প্রভৃতি উপন্যাস।

৩ 'তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতি', *তারাশঙ্কর স্মৃতি,* বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা, পৃ. ১২২

৪ বিশ্লেষকদের মধ্যে আছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, অরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায়, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভব রায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, গুণময় মান্না প্রমুখ।

৫ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন : 'তারাশঙ্করের আঞ্চলিক সাহিত্যের রূপটি অধিকতর সুষ্ঠু, পরিপূর্ণ ও সার্থক।' (*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৪২) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্করের উপন্যাসকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। তাঁর এই বিভক্তি অনুযায়ী তৃতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), *তামস তপস্যা* (১৯৪৮), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২), *বিচারক* (১৯৫৬), *পঞ্চপুত্তলী* (১৯৫৭), *সপ্তপদী* (১৯৫৮), *রাধা* (১৯৫৮) প্রভৃতি। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'বোধ করি এই পর্বটি তারাশঙ্করের উপন্যাসের সমৃদ্ধতম পর্ব।' (*কালের প্রতিমা,* কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩০)

৬ 'নাগিনী কন্যার কাহিনী : পুনর্বিবেচনা', *তারাশঙ্কর অন্বেষা,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪১-৪৭

৭ *আমার কালের কথা* (১৯৫১) শীর্ষক আত্মজীবনীতে সাপের প্রসঙ্গ, বেদেনীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সাপ সম্পর্কে তাঁর মায়ের অভিজ্ঞতা প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। কয়েকটি অংশ আমি নিচে উদ্ধৃত করছি :

[ক] 'আমাদের বাড়ীতে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পিতামহের বাড়ীতে ও আমাদের বাড়ীতে গোখুরা সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রেই দেখে আসছি। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ততঃ চার-পাঁচটা বড় বড় গোখুরা মারা পড়েই প্রতি বার। এর সঙ্গে কয়েকটা চিতি, মধ্যে মধ্যে

ভয়ঙ্কর দু-একটা চন্দ্রবোড়া। এক এক বৎসর বাড়ির কাছেপিঠে বাচ্চা হ'লে বিশ-ত্রিশটা গোখুরার আধ হাত থেকে হাতখানেক লম্বা বাচ্চাও মারা পড়ে। একবার তিন-চার দিনে তেতাল্লিশটা বাচ্চা বেরিয়েছিল।' (*তা. র.* ১০ ॥ ৪১৪-১৫)

[খ] সাপ সম্পর্কে তারাশঙ্করের মায়ের ছিল আশ্চর্য সতর্কতাবোধ। এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'ঘরে সাপ বের হ'লে তিনি ঘরে ঢুকবা মাত্র বুঝতে পারেন। মাটির উপর সাপের বুকে হাঁটার একটা শব্দ আছে। সে শব্দ যত মৃদুই হোক তাঁর কানে ধরা পড়তই।' (*তা. র.* ১০ ॥ ৪১৫)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অন্ধকারেও ঘরে সাপের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিভাবে তিনি বুঝতে পারেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'ঘরে ঢুকেই দেখলাম সব স্থির। আরসুলারা উড়ছে না, ইঁদুর দলের নাচের আসর বসে নি ; বুঝলাম, ঘরে নিশ্চয় এমন কেউ এসেছেন যার সামনে এ সব বেয়াদপি চলে না। ভীষণ শাসন তাঁর।

আরও তত্ত্ব আছে, যে তত্ত্বটি সকল সময় ধরা পড়ে না। সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ে কাঁঠালীচাঁপার গন্ধের মত গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের তথ্যও তিনিই আমাকে বলেছিলেন। বেদেদের কাছে তথ্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম পরে। এই সমর্থনও পেয়েছি সাপের সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁদের বইয়ে।' (*তা. র.* ১০ ॥ ৪১৬)

[গ] দেশী বেদেরা যেত তারাশঙ্করের গ্রামে। কালো কেউটে ছিল তাদের গ্রামে, যে-সাপ মানুষকে তাড়া করে। অথচ বেদেনীরা তাড়া করে ধরত এই সাপ। এমন একটি দৃশ্যের বর্ণনা এখানে আছে যার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে নাগিনী কন্যা শবলার কাহিনীর একটি দৃশ্যের। তাছাড়া তারাশঙ্করের ভালো লেগেছিল এক কালো বেদেনীকে। সেই বেদেনী গান গেয়ে শান্তিপুরে শাড়ি চেয়ে নিয়েছিল। একই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ শবলার কাহিনীতে আছে। আমি ঘটনাগুলো উদ্ধৃত করছি :

'বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেত—মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ,...

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া ক'রে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হ'ত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলে নি।...এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া ক'রে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি—কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধ'রে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধ'রে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি ? ' (*তা. র.* ১০॥৪৩৮)

'...রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল।... রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক-একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত-—

হীরেমন নাচ দেখি লো!
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, বাহার ক'রে,
ও হীরেমন নাচ দেখি লো!
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো!

আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলত—মায়ের কাছে একখানা শান্তিপুরে শাড়ী এনে দাও খোকাবাবু হ্যাঁ। তা আমি দিয়েছিলাম। মা একবার পুরানো একখানা শান্তিপুরে শাড়ী তাকে দিয়েছিলেন। সে কাপড়খানা আমাদের বাড়ীতেই প'রে হেলে দুলে চ'লে গিয়েছিল।' (*তা.র.*১০॥৪৩৮-৩৯)

'আরও আসত সত্যকারের বেদের দল।

তাঁবু, গরুর গাড়ী, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল ; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচ শো পর্যন্ত লোক আসত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সেকালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহ, তারা আসত—পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর ; এলে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত...' (*তা.র.* ১০ ॥ ৪৪০)

৮ 'বেদেনী' গল্পের পটভূমি হিসেবে *আমার কালের কথা*-র নিম্নোক্ত অংশকে বিবেচনা করা যায় :

'আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। ...

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্যব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় শৌখীন শাড়ী—(*তা.র.* ১০॥৪৩৯)

৯ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৭৯

১০ 'হিজল বিল আর কোপাই নদীর পার', *পশ্চিমবঙ্গ* (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ; সম্পাদক-দিব্যজ্যোতি মজুমদার), বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৫-৯, ১৯৯৭, পৃ. ৮০

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

১২ এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : 'শবলার কাছ থেকে পিঙলা নাগিনী কন্যার উত্তরাধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে এ কাহিনীর উপন্যাস-ধর্ম পিঙলার যন্ত্রণা ও সঙ্কটের সূত্রে স্পষ্ট হতে থাকল। বহুকালাগত সংস্কার ও জৈব-ধর্মের তথা নারীর স্বাভাবিকী বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতরে যত স্পষ্ট হ'তে লাগল যে, মানুষী নাগিনী কন্যা হয় না, তত ব্যালাড-প্যাটার্ন খসে যেতে লাগল, পট ও ব্যক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। তারাশঙ্কর প্রকৃত ঔপন্যাসিক মনীষায় জীবন-বিন্যাসের ভাঙ-চুর দেখাতে দেখাতে tale-pattern-এর রূপান্তর ঘটালেন।' (*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা,* ১৯৮০, পৃ. ২৮৮)

১৩ কামবাসনা জাগ্রত হলে নাগিনী কন্যার চোখে-মনে গভীর রাতের অন্ধকার 'নিশির নেশা' জাগিয়ে তোলে। তার পক্ষে বিছানায় পড়ে থাকা অসম্ভব হয়। দেবতার নির্দেশ ভুলে সে গৃহ ত্যাগ করে। রাতের পর রাত তারা এভাবে গৃহত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়। পরিণতিতে অকালমৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বিবরণ এইরূপ :

'এক নাগিনী কন্যেকে ধরেছিল এই নেশা—তার প্রাণ গিয়েছিল বাঘের মুখে। এক নাগিনী কন্যের দেহ পাওয়া গিয়েছিল বিলের জলে। এক কন্যের উদ্দেশ মেলে নাই। হাঙরমুখী খালে পাওয়া গিয়েছিল তার লাল কাপড়ের ছেঁড়া খানিকটা অংশ। কুমীরের পেটে গিয়েছিল সে।

জন-দুই-তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। হিজল বিলের ধারে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ব'সে ছিল, চোখ দুটি হয়েছিল কুঁচের মত লাল। কেউ কেবলই কেঁদেছে, কেউ কেবলই হেসেছে।

জন চারেকের হয়েছে চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরেছে—ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও তো রক্ষা পায় নি তারা। (*তা. র.* ৮॥১৪১)

১৪ *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতি

সৌমিত্র শেখর

উপন্যাস যদি জীবনের প্রতিচিত্র হয়, 'রাজনীতি' তাহলে নিশ্চয়ই ওই বিচিত্র-চিত্রের অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এসে আমাদের প্রতীতি দৃঢ়তর যে, জীবনের সঙ্গে মিশে আছে সমাজ, আর সমাজকে অবলম্বন করেই জীবনের বিস্তার। এ–কারণে যেখানেই জীবনের প্রসঙ্গ-কথা, সেখানে অনিবার্যভাবেই সমাজের উল্লেখ। আদর্শ ঐতিহ্য নীতিবোধ সংস্কার ধর্মচেতনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত যে সমাজ উঠে আসে উপন্যাসে, তার ভালো-মন্দ, সুশ্রী আর কুশ্রীকে সাঙ্গীকৃত করে রাজনীতির বিকাশ। ফলে রাজনীতির উল্লেখ যেমন একটি সমাজের পরিচয় নিশ্চিত করে, তেমনি এই রাজনৈতিক ইতি-নেতির পথ ধরেই অনেকটা মিশে যাওয়া সম্ভব ওই কালের জীবন-ইতিহাসে। এতে একই সঙ্গে মানুষ আর তার পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে ; উপন্যাস পৌঁছে যায় ডি এইচ লরেন্স কথিত 'One bright book of life'-এ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে রাজনীতি বলা হয় সেই তাত্ত্বিক-প্রণোদনা হয়তো সে-ভাবে ছিলো না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতেই যে বাংলা উপন্যাসে রাজনীতির প্রতিভাস প্রথম লক্ষযোগ্য তা-তো অস্বীকার করার উপায় নেই। *আনন্দমঠে* (১৮৮২) এই রাজনীতির প্রকাশটা স্পষ্ট বটে, কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস *'দুর্গেশনন্দিনী'* তে (১৮৬৫) যে-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণিত, সে ইতিহাস কি রাজনীতি-মুক্ত ? তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রাজনীতি *আনন্দমঠে* যতোটা পরিপূর্ণভাবে উঠে এসেছে, অন্যগুলোতে সেভাবে আসে নি। অধ্যয়নসূত্রে মিলের উপযোগবাদ, কোঁতের দৃষ্টবাদের প্রভাব তাঁর ওপর ছিলো। দর্শনের প্রভাব আর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা সূত্রেই হয়তো *বঙ্গদেশের কৃষক* (১৮৭২), *সাম্য* (১৮৭৯) নামে দুটো বইয়ে তিনি জমিদারতান্ত্রিক সমাজে বাঙালি নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও ভূমিসংশ্লিষ্টদের দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্তিম জীবনে তাঁর আস্থা স্থাপন গীতায়—ধর্ম সংস্থাপনার্থে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেশাঁসের প্রভাব-পুষ্ট হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো সাবধানী প্রত্যক্ষতায় দেশের মুক্তি অন্বেষণ করেছেন। নিজের সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক ও মুসলিমদের একভাবে (বাহিরাগত অর্থাৎ যবন অর্থে) বিচার করতে দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) আর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* (১৯২৬) উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের *গোরা* (১৯১০), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) কিংবা শরৎ চন্দ্রের *পল্লী-সমাজ*

(১৯১৬) বা *শেষ প্রশ্নে* (১৯৩২) কি রাজনীতি নেই ? গোরার যে সত্যনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি—হোক সে ধর্মানুসন্ধান, সংস্কারবদ্ধতা আর ইংরেজ-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে,—তা-তো কম নয়। *পল্লী-সমাজে-র* জমিদার ও কৃষকের বাঁধ নিয়ে দ্বন্দ্ব, রমেশের কারাগারে গমন—হোক না অল্প পরিসরে এবং অবিস্তৃত পাঠই—এখানেও রাজনীতির বীজ উপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো দৃষ্টিভঙ্গির—ঔপন্যাসিক মানসের ছায়া-সন্নিপাতের। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন তাঁর সময়কার রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে, শরৎ চন্দ্র সমস্যা অনুধাবনে ছিলেন হৃদয়সংবাদী ; তাঁদের উপন্যাসেও এরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর জন্ম (১৮৮৫) হলেও সে অর্থে বড় কোন রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁর জীবদ্দশায় ভারতে সংঘটিত হয় নি, যা কি-না তাঁকে প্রভাবিত বা আলোড়িত করতে পারে। 'বঙ্গভঙ্গ-আইন' জারির প্রতিক্রিয়াতেই স্বদেশ ভাবনা পেয়ে বসে ভারতবাসীকে, সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলো তৎপর হয়। জীবৎকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা ও পালাবদলের সাক্ষী হয়েও শেষাবধি কোন রাজনৈতিক মতবাদের কাছে সমর্পিত হন নি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে সময়ের কারণেই আসে না। কিন্তু বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা উপন্যাসের যে যুগান্তর সূচিত হলো ভাব ও বৈচিত্র্যে, বিভাবনা ও পারিপাট্যে এবং যে তিনজন ঔপন্যাসিক এর প্রধান উদ্‌গাতা—তাঁদের দুইজন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিলো সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্তি। অন্যজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে 'গো-রক্ষিণী সভা' নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চাকুরিসূত্রে জড়িত থাকলেও কোন নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায় না। এঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন (১৯৪৪)। আর তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটলো উল্টো। কংগ্রেস রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী তারাশঙ্কর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবাস শেষে প্রায় ঘোষণা দিয়ে রাজনীতি পরিত্যাগ করে শুরু করলেন সার্বক্ষণিক সাহিত্যজীবন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি : '১৯৩১ সালে জেল থেকে বের হবার সময় বন্ধুদের বলে এসেছিলাম সক্রিয় রাজনীতির পথে দেশসেবার কর্ম আমি ছেড়ে যাচ্ছি আজ, সাহিত্যের পথে দেশসেবার কর্মের সংকল্প নিয়ে জেলগেটের বাইরে পা দেব।' ['শিল্পীর স্বাধীনতা'] জেল থেকে বেরিয়ে তারাশঙ্কর আর প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস দলের ঝাণ্ডা বহন করেন নি। কিন্তু ওই যে বলেছেন 'সাহিত্যের পথে দেশসেবা'—উদ্দেশ্য 'দেশসেবা'টা কিন্তু ঠিক আছে। অর্থাৎ কংগ্রেস দলের যে উদ্দেশ্য তারাশঙ্করের লক্ষ্যও তাই, তবে পথটা ভিন্ন—প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয়, সাহিত্য। 'দেশ' বলতে তারাশঙ্কর বুঝতেন ভারতবর্ষকে। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রোথিত হয়েছিলো বিদেশ নয়, স্বদেশের মাটিতে ; ভিন্‌দেশীর মতবাদে নয়, ভারতীয়র পথ-নির্দেশনায় ;

বহির্দেশীয় কৃষ্টিতে নয়, নিজদেশের সংস্কৃতিতে। এ-জন্যে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন হলেও মোহনদাস করমচাঁদ মহাত্মা গান্ধী হলেন তারাশঙ্করের পূজিত-পুরুষ। 'গান্ধীজি দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রহণ করেন নি। বরং তিনি ছিলেন ভগবৎ–বিশ্বাসী, যদিও তাঁর বক্তব্য ছিল 'সত্যই ঈশ্বর'। মানুষের ইতিহাস শুধুই শ্রেণী-সংগ্রামের ফর্মুলা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এহেন বিশ্বাসও গান্ধীজির ছিল না। শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সর্ব্বোদয়ী সমাজ গান্ধীজি চেয়েছেন ; কিন্তু তাঁর মতে এই সমাজের আবির্ভাব ও স্থায়িত্ব সম্ভব হবে অহিংসার পথে। কেননা দার্শনিক দিক থেকে গান্ধীজি মনে করতেন যে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে রয়েছে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক এবং অসৎ ও অমানবিক উপায়ের সাহায্যে স্থায়ীভাবে এমন সমসমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যেখানে মুক্ত, প্রবুজ মানুষের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।' ('গান্ধী ও লেনিন', সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *মাসিক পশ্চিমবঙ্গ*, গান্ধী সংখ্যা '৯৫) যদিও অন্যান্য মতবাদের মতো সুনির্দিষ্টভাবে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক কোথাও লিপিবদ্ধ নয়, তথাপি এক কথায় এই হলো গান্ধীবাদ—তারাশঙ্করের জীবন ও কর্মে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। গান্ধী পেরেছিলেন কোটি কোটি ভারতবাসীকে প্রথমবারের মতো একত্রে জাগিয়ে তুলতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের পেছনে 'ভারতমাতা'র পুনর্জাগরণ বা 'বন্দেমাতরম্' অভিজ্ঞান যতোটুকুই কার্যকর থাকুক না কেন এটা যে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র পেয়েছিলো ইতিহাস তার সাক্ষী। এ-সূত্রেই মহাত্মা গান্ধী হয়ে উঠলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক জাতীয়তাবাদী নেতা। গান্ধীবাদ সম্পর্কিত উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে তাই একান্তভাবে স্বদেশ-অন্বেষা লক্ষণীয় যাকে 'ভারতবীক্ষা' বলেও অভিহিত করা চলে। তারাশঙ্করের আমৃত্যু অন্বিষ্টও কিন্তু ছিলো তা-ই। তিনি গান্ধীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন নিজেকে এবং সে-সূত্রেই সর্বাগ্রে হতে চেয়েছেন মনেপ্রাণে 'ভারতীয়'। ভারতই ছিলো তাঁর সমস্ত চিন্তা চেতনা ও কর্মের ভিত্তিমূল—এ-কথা বিস্মৃত হবার অবকাশ নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কয়েকটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

[ক] আমি ভারতবর্ষের মানুষ—ভারতবর্ষের লেখক—আমার কণ্ঠ দিয়ে আমার লেখনীমুখে কি করে উচ্চারিত হবে জীবনের শেষ মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে—সত্য ভ্রান্তি। ['শিল্পীর স্বাধীনতা']

[খ] এতে ফ্রাস্টেটেড বা হতাশা-পীড়িত বললে তাই, কেউ বুর্জোয়া বললে তাই, কেউ ফু-ল বললে তাই! তবে এ দিয়ে আমি ভারতবর্ষীয় এ নাকচ করা যাবে না।' ['মনের আয়নায় নিজের ছবি']

[গ] এরপর লিখতে বসি। ভারতীয় মতে, মেঝেতে পাতা আসনে বসে, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখি আমি। [প্রাগুক্ত]

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই তারাশঙ্করের কর্ম ও জীবনাচারে পরিপূর্ণ ভারতীয় হবার চেষ্টা। মনে রাখা দরকার, ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যখন প্রস্তুতি ও প্রতিষ্ঠাকাল তখন পৃথিবীতে সংঘটিত হয় দুটো বিশ্বযুদ্ধ (যথাক্রমে ১৯১৪ ও

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু) আর রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭)। বিশ্বযুদ্ধের মানবতাবিরোধী ভয়াবহ রূপ যেমন তারাশঙ্করকে সচকিত করেছে, তেমনি রুশ বিপ্লবের প্রভাবকেও তিনি লক্ষ করেছেন সচেতন ভাবে। তিনি লিখেছেন : 'কম্যুনিজম—যে তত্ত্ব বলে—সকল মানুষের সমান অধিকার—সব মানুষ সম-মর্যাদার অধিকারী, যে তত্ত্বের মধ্যে কল্পনা ও স্বর্গরাজ্যের—যে রাজ্যে অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্য-সুখে এক স্বর্গরাজ্যের, যে রাজ্যের মধ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, শাসকের রক্তচক্ষু নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য অভয়ের রাজ্য সেই কম্যুনিজমের প্রতি ১৯১৮ [১৯১৭] সালের পর থেকে অন্তত বিশ বৎসর ধরে প্রায় প্রতিটি লেখকই আকৃষ্ট হয়েছেন।' ['শিল্পীর স্বাধীনতা'] সন্দেহ নেই, তারাশঙ্কর নিজেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রমাণ—প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯৩১) থেকে শেষ উপন্যাস *১৯৭১* (১৯৭১)-এর 'একটি কালো মেয়ের কথা'। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সভাপতি (১৯৪২) হিসেবে কর্ম পরিচালনাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের মূলসূত্র মার্কসবাদে তিনি স্থায়ীভাবে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। তারাশঙ্কর লিখেছেন : '... তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ এবং লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি।' [*আমার সাহিত্য জীবন,* ১ম পর্ব] তারাশঙ্করের 'বস্তুবাদ সর্বস্ব' মার্কসবাদ গ্রহণ না-করার পেছনেও রয়েছে ভারতীয় সংস্কার–ঐতিহ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায়—যা-কিনা তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্পূরক হিসেবেই বিবেচনা করা চলে। এই সংস্কার ও ঐতিহ্যচেতনার মধ্যে ধর্ম-চিন্তা ও ধর্ম-চর্চাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন। পারিবারিকভাবে শৈশব-কৈশোরের ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মাচারের প্রতি ব্রাহ্মণ-কুলজাত আনুগত্য এর পেছনে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। তিনি জানতেন ধর্ম-প্রসঙ্গে মার্কসবাদ কী বলে—'ধর্মীয় ক্লেশ হল একই বাস্তব ক্লেশের অভিব্যক্তি এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হল আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম হল জনগণের জন্যে আফিম।'—(*ধর্ম প্রসঙ্গে,* মার্কস–এঙ্গেলস)। অথচ ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ঘোরতর আস্তিক্যবাদী। ঈশ্বর, আত্মা, অজ্ঞেয়, অমৃত ইত্যাদি কতিপয় আধ্যাত্মিক অধরা প্রতীতিতে ছিলো তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস। ইহজাগতিক চাহিদাকে তিনি তুচ্ছ করেন সত্য, কিন্তু বলেছেন : অন্ন আমি চাই—কিন্তু তা-ই সব নয় আমার কাছে। আমি চাই অমৃত।' ('শিল্পীর স্বাধীনতা') তাঁর সন্তুষ্টি ঈশ্বরে : '... চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাই নি। মিথ্যা হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের মতই একটি সত্তার হাতছানিতে আবার বিশ্বাসেই ফিরে এসেছি। তাঁকে খুঁজেছি, ডেকেছি, আজও খুঁজি, আজও ডাকি ; মনে মনে সরবে না হোক, নীরবে একটা ইশারা পাই।'

('মনের আয়নায় নিজের ছবি') এই ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর প্রাত্যহিক জীবন ও কর্মের সঙ্গে এতোটাই জড়িয়ে গিয়েছিলো যে-কারণে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন : 'লেখা শুরু করি ভগবানের নাম লিখে। একখানি খাতা, একখানা ডায়েরীর বইয়ে দিন দিন ইষ্টনাম লিখি।' [প্রাগুক্ত] একই প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিশ্বাসের মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। অনুধাবন করা যায়, তারাশঙ্কর ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রশ্নে কোথায় খুঁজে পান নির্ভরশীলতা। এ-প্রসঙ্গে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের সঙ্গে তারাশঙ্কর মিলিয়ে নেন তাঁর ধর্মবোধ, যেখানে পরমার্থ চিন্তা ইহজাগতিকতার চেয়ে শ্রেয়তর।

তারাশঙ্করের আগে তাঁর মতো এতোটা কাল সচেতন লেখকের বাংলা সাহিত্যে আর আবির্ভাব ঘটে নি। এই কাল সচেতনতার সঙ্গে রাজনীতির মূলসূত্রগুলো জড়িত ওতপ্রোতভাবে। জন্মেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী পরিবারে, বিয়ে করেছেন উঠতি ধনী পরিবারের কন্যা। সংসার জীবনে এর ফলে যেমন একটি দ্বন্দ্বে তিনি জড়িয়ে যান অদৃশ্যভাবে, তেমনি চলছিলো পড়ন্ত সামন্ততন্ত্র আর অগ্রগামী নব্য-ধনবাদের সামাজিক দ্বৈরথ ; যার সঙ্গে ঐতিহ্যসূত্রে তারাশঙ্করও সম্পৃক্ত। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা লক্ষ করার মতো :

[ক] সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বে ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে-দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল। [আমার কালের কথা]

[খ] সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নত-মস্তক। [প্রাগুক্ত]

[গ] আমি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ। বিত্ত ছিল না, অহঙ্কার আর আভিজাত্যটাই পেয়েছি, অন্যদিকে আমার স্ত্রী ধনী পরিবারের সন্তান, পুরানো আভিজাত্যের সম্পর্কে সম্পর্কহীন। এই দ্বন্দ্ব আমার সারাটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রায় সারাটা জীবন উপলব্ধি করে এসেছি। [প্রাগুক্ত]

পরিবার ও সমাজজীবনের এই দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিলো সামন্তবাদের দিকে—উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে এর খানিকটা পরিচয় মেলে। কিন্তু বড় কথা হলো, জীবনের এই সত্য ঘটনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সম্যক ও বিশ্বস্তভাবেই তুলে ধরেছেন রচিত উপন্যাস বা অন্য সৃষ্টিতে। সমসাময়িক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি-প্রধান উপন্যাসের চেয়ে *পদ্মানদীর মাঝি* বা *পুতুলনাচের ইতিকথা*-ই যেখানে অধিক সাহিত্যিকমূল্য দাবি করে, বিভূতিভূষণের *অশনি সংকেত*-এর চেয়ে *পথের পাঁচালী* যেখানে অধিকতর জীবন্ত মনে হয়—সেখানে সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তমান অনুষঙ্গকে আত্মীকৃত করে রচিত উপন্যাসগুলোই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ ; কী সাহিত্যিক বিবেচনায়, কী জনপ্রিয়তায়। এ দিক থেকে তিনি পূর্বজ ঔপন্যাসিকদের থেকে যেমন পৃথক, তেমনি সমকালীন অন্যদের চেয়েও আলাদা। বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হওয়ার দিন ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ জননী প্রভাবতী দেবী কর্তৃক রাখি বন্ধনে যাঁর অভিষেক, মা'র মুখে *আনন্দমঠে*-র গল্প শুনে যাঁর মানস গঠন, সামন্তবাদী পৈতৃক আভিজাত্য আর বংশ মর্যাদায় যাঁর বেড়ে ওঠা ; গান্ধীবাদে যাঁর

আকর্ষণ ও সম্পৃক্ততা প্রথম-যৌবন থেকে—উত্তর–জীবনে আর সৃষ্টি কর্মে এর একটা অনিবার্য প্রভাব, কখনো পক্ষপাত তো থাকবেই ;—যদি না থাকে, বরং সেটাই মনে হয় অসম্ভব।

তিন

বাণীর বরপুত্রের মতো বিরামহীন লেখনী চালনা তারাশঙ্করের। মধ্যজীবনে বছরে পাঁচ-ছয়টি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। লেখকের এই বিশাল সৃষ্টিসম্ভার থেকে বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মূলত তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি উপন্যাস—যেখানে প্রধানত প্রতিবিম্বিত হয়েছে রাজনীতি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *চৈতালী-ঘূর্ণি*-র সঙ্গে শেষ উপন্যাস *একটি কালো মেয়ের কথা* আলোচনা করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এদের রাজনৈতিক আন্তঃসম্পর্ক।

তারাশঙ্করের *ধাত্রী দেবতা* (১৯৩৯), *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩-১৯৪৪) মূলত একই স্বরে বাঁধা। কারণ একটি চরিত্র-বিশেষকে অবলম্বন করেই উপন্যাসদ্বয়ের পরিমণ্ডল রচিত। এই যে পরিমণ্ডল, তাহলো সমাজ-অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত,—জাতীয়তাবাদ আর গান্ধীর অনুসৃত পন্থার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ অথবা নব্য–পুঁজিবাদের। এর মূল কার্যকারণ শক্তি রাজনীতিতে নিহিত। যে রাজনীতি তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন শুধু তাই নয়, যে রাজনীতি ওই সময় ভারতীয় সমাজে সর্ববিস্তারী রূপ পরিগ্রহ করেছিলো তার প্রতিফলন এখানে মিলবে। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্তস্তল (Base Structure) অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে তার প্রভাব পড়ে সুদূর গ্রামেও। তদুপরি বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গরদ (১৯১১) ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনে'র মতো গুপ্ত সন্ত্রাস–নির্ভর রাজনৈতিক গ্রুপের জন্ম হয়। তারাশঙ্করের এই ইতিহাস উপলব্ধ ছিলো। *ধাত্রী দেবতা*-র নায়ক শিবনাথও যুক্ত হয়ে পড়ে গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে। কিন্তু সে ধীরে ধীরে অহিংস পথে চলে আসে। শিবনাথ চরিত্রে তার প্রথম-যৌবনে আত্মস্থ করা *আনন্দমঠে*-র প্রভাব ব্যাপক। সুশীলের সান্নিধ্যে এসে দেশমুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পেলেও সংগঠনের অতিবিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে শিবু নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। পূর্ণ যখন তাকে অরুণের কাছে রাখা অস্ত্রগুলো নিজের তত্ত্বাবধানে নেয়ার পরামর্শ দিলো, সেই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের কথা শুনে 'শিবনাথের বুক মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। ওই মুহূর্তটির মধ্যে তাহার মাকে পিসীমাকে মনে পড়িয়া গেল। ম্লানমুখী গৌরীও একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।' বিপ্লবী কাজে এই মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটান শিবনাথকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে দেয়নি' বরং পূর্ণর পলিটিক্যাল দাদার আদর্শিক তত্ত্বের প্রভাবেই শিবু অহিংস আন্দোলনে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তার বক্তব্য হলো : 'স্বাধীনতা' লাভ, 'জাতীয় ভাবধারা' অক্ষুণ্ণ রাখা এবং 'পরম'কে পাওয়াই মুখ্য। তবে এ জন্যে বিদেশী মতবাদ বা যে-কোন

হিংসাত্মক পন্থাই পরিত্যাজ্য ; তার ভাষায়, এ-সব 'বিদেশীর নির্দ্দিষ্ট অ্যানার্কিজম কি টেরোরিজম'। তারাশঙ্করের ব্যক্তি-বিশ্বাসও ছিলো এ রকম। ইতঃপূর্বে উপস্থাপিত উদ্ধৃতি উল্লেখের দিকে দৃষ্টি দিলে তার প্রমাণ মিলবে। ভারতের 'যুগান্তর' বা 'অনুশীলনে'র সংগ্রামও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে নি ;—যেমনটি দেখা যায় উপন্যাসে। কারণ তাদের সংগ্রাম ছিলো অনেকটা তত্ত্বনির্ভর জীবনদানের রোম্যান্টিক এ্যাডভেঞ্চার—এর সঙ্গে দেশের আপামর কৃষক ও সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিলোনা। ওই দাদা কিন্তু এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। তার বক্তব্য : 'আমার ধারণা ইংরেজ তাড়ানোর নামই স্বাধীনতা নয়। বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদ করে সাম্প্রদায়িক শাসন প্রবর্তনের নামে রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি। দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা ও থেকে পৃথক বস্তু .... স্বাধীনতা বলতে আমি কি বুঝি জানিস ? এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অব এ গভর্মেন্ট অব্ দি পিপ্‌ল বাই দি পিপ্‌ল, নট ফর সেক অব দি পিপ্‌ল। অনুগ্রহ নয়, দান নয়, তেত্রিশ কোটির দাবির বস্তু গ্রহণ করতে কোটি কোটি হাত আপনা হতে এগিয়ে আসা চাই।' জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস-নির্ভর রাজনীতির ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর সফল। কিন্তু শিবুর তো কোন তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিলো না এ-বিষয়ে। বরং সে মধ্যবিত্তসুলভ পশ্চাৎপদতার কারণেই এ পথ পরিত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, শিবুর মধ্যে ভাববাদী আবেগ, সামন্তবাদী আভিজাত্য আর পিছুটানও তার পুরো পথ পরিক্রমায় ছিলো কার্যকর। মনে রাখা প্রয়োজন, পিসিমা ও স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে সংঘটিত সাংসারিক ঘটনা-সূত্রে শিবুর ময়ূরাক্ষী নদীর চরে জীবনযাপন—কোন রাজনৈতিক আদর্শ তাড়িত হয়ে নয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে সে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে মডেল গ্রাম বিনির্মাণে ব্যস্ত। আর ঔপন্যাসিক বলেন : 'ধনগত আভিজাত্যের সমস্ত কিছু সে বর্জন করিয়াছে।' চরে ঘোড়ায় করে আগমন, আড়াই বছর পর গরুর গাড়িতে প্রস্থান ; কৃষি কাজ নিয়ে পাঁচ-সাত গ্রামে কর্মধারা প্রবাহিতকরণ, নাইট স্কুল, ডাক্তারখানা, ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা—সব ঠিকই আছে। নির্মলেন্দু ভৌমিকও এ প্রসঙ্গে লিখছেন : 'লেখক জমিদারপুত্র শিবনাথকে জমিদারী পরিত্যাগ করিয়ে ময়ূরাক্ষীর তীরে কেবল কৃষাণই করেন নি, রাঢ়ের আদিম মানুষের দেহচেতনা ও প্রাণবন্যাকেও ভরে দিয়েছেন তার মধ্যে। ['ধাত্রী দেবতা : তারাশঙ্করের এক পর্ব']— কিন্তু উচ্চবর্ণ ও বংশের আভিজাত্য কি পরিত্যাগ করতে পেরেছে শিবনাথ ? ডোমের বউ ঠাট্টা-আলাপ করেছে বলে যে আত্মমর্যাদায় আঘাত পায়, তাদের যে 'একটা ইতরশ্রেণী' বলে মনে করে, সে-তো তাহলে নিজের শ্রেণীকে অতিক্রম করতে পারলো না। এর আগে প্রুঁধো পড়ে সে নিজেকে জমিদার ভাবতে অপরাধী মনে করেছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনে নিজের জমিদারি নিলাম হওয়া ঠেকিয়েছে। সশস্ত্রবাদী সুশীলের 'তোমার পণ কি ?' প্রশ্নের জবাবে : 'সে মুহূর্তে উত্তর করিল—ভক্তি।' শিবুর নিজস্ব শ্রেণীগণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি শেষাবধি, পড়ে নি অচলাভক্তিতে পূর্ণচ্ছেদ। উপন্যাসের শেষে অহিংস

আন্দোলনে ধৃত শিবুর জেলের ভেতর থেকে পিসিমা তথা দেশমাতৃকাকে প্রণাম ও স্বীয় সন্তানকে অহিংস জীবনাদর্শে মানুষ করার অনুরোধ গান্ধীবাদের প্রতি শিবনাথের সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশক। এই আনুগত্য সম্ভবত ব্যক্তি তারাশঙ্করেরও। শিবু চরিত্রটির অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তি-ছায়া পড়েছে। কিন্তু তারাশঙ্কর যখন শিল্পী তখন ব্যক্তি–সীমা অতিক্রান্তিই কাম্য তাঁর কাছে। ওই সময় ভারত–কলোনির স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম প্রধানত ক্রিয়াশীল ছিলো সত্য, কিন্তু একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে চলছিলো নিষ্পেষিত মানুষের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন ছিলো বলে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছিলো পর্যায়ক্রমে। তারাশঙ্কর এ ব্যাপারটি যে অনুধাবন করতে পারেন নি তা নয়। শিবুর মায়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন : 'দেশ কি মাটি শিবনাথ ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে শহরের মধ্যে।' তিনি পারতেন ঔপন্যাসিক করণকুশলতায় এর মধ্য থেকেই সমাজের আন্তর্শোষণের কারণটি স্পষ্ট করতে—যা কিনা পোস্টকলোনিয়াল যুগে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। শিবু 'বসতি'র মধ্যে দেশকে খোঁজেনি, খুঁজেছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে, পরিপার্শ্বের চেয়ে 'পরম'ই তার লক্ষ্য ; গোঁসাই বাবাকে সে বলে : ' এতে শুধু মরতে হয় ; মারতে হয় না। অহিংস যুদ্ধ।' —মহাত্মা গান্ধীর এই পথ তার অবলম্বন।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' একটি উপন্যাসের দুটো খণ্ড। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন উপন্যাস এই *গণদেবতা–পঞ্চগ্রাম,* তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় ও সমাজই এখানে মুখ্য—যে সমাজ সামন্তবাদের পুরোনো মূল্যবোধ আর ধরে রাখতে পারছিলো না। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন বুর্জোয়ার অভাবে ভারতে মুৎসুদ্দি পুঁজির বিকাশ ঘটতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। শহরে বিকাশমান এই পুঁজির আকর্ষণে ফাটল ধরে গ্রামের চিরায়ত জীবনধারায়। 'গণদেবতা'তে এর প্রতিফলন পাওয়া যাবে অনিরুদ্ধ কামার আর গিরীশ ছুতোরের ধানের বদলে নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ ও শহরের দিকে ধাবমানতার মধ্যে। পঞ্চায়েত মজলিশে প্রদত্ত অনিরুদ্ধ কামারের বক্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য : এক. 'আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকেদের ঘরে।' দুই. 'এখন গাঁয়ের লোক সে সব [পেরেক গজাল হাতা খুন্তি] কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন।' অনিরুদ্ধর দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের এই সমাজ নিরীক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রথমত সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি শোষণে কৃষক ভূমিহীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত, দ্বিতীয়ত নব্যপুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়কে। এটাই বিশ্বরাজনীতির তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সামাজিক প্রতিফলন। শরৎ চন্দ্রের গফুর ও আমিনা যেখানে পালিয়ে যায় শহরে, অনিরুদ্ধ বা গিরীশ সেখানে মজলিশে তাদের শহরমুখী হবার যথার্থ কারণ তুলে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে।

আসলে শরৎ চন্দ্রের সময়কার গ্রামীণ পিছুটান এখানে নেই—সময় ও রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী অভিঘাতেই সতীশ, পাতুসহ ডোম বাউড়িরা শহরমুখী, সব সংস্কার ও পিছুটান উপেক্ষা করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের ধারাগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে *গণদেবতা–পঞ্চগ্রামে* তারই বৈজ্ঞানিক চিত্রণ দেখা যায়। কাবুলি মহাজন আর ছিরুপালের শোষণের ফলে নিম্নবিত্ত কৃষকরা ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ছিরুপালের শ্রীহরি ঘোষ নামান্তর আসলে পরোক্ষভাবে সমাজের পর্বান্তরেরই ইঙ্গিতবহ। কঙ্কণার ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যের মুসলিম দৌলত শেখের সঙ্গে গরুর চামড়ার ব্যবসায় যোগ দেয়ার মধ্যে ধর্মবোধকে তুচ্ছ করে বেনিয়া বৃত্তির অগ্রসরতাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ওই পরিবর্তমান সমাজের বাস্তবতা। *ধাত্রী দেবতা*-য় তারাশঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির লড়াইকে প্রধান করেছেন। কিন্তু *গণদেবতা–পঞ্চগ্রামে* দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন ভারত–কলোনির গ্রামীণ সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সঙ্গে নব্য-ধনবাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেই রূপ দিয়েছেন। তবে এর পরিপ্রেক্ষিত রচনায় তারাশঙ্কর গ্রামগুলোতে নানা বৃত্তি, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের ঘটিয়েছেন সমাবেশ। হরিশ মণ্ডল, দ্বারকা চৌধুরী, বৃন্দাবন দত্ত, দেবু ঘোষ কিংবা ন্যায়রত্ন, ইরসাদ মিঞা, রামভল্লা এদের প্রতিনিধি। তাঁর এ গ্রাম্যসমাজ-নিরীক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ; কল্পনাবিলাসীর সুখস্বপ্ন নয় বলেই গ্রামীণ উৎসব, রাজনীতি, সংকীর্ণতা, প্রেম, যৌনতা সবই এখানে উঠে এসেছে। তবে উপন্যাসের শুরুতে অনিরুদ্ধ কর্মকার যে দৃঢ়তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো তা মিইয়ে যায় ধীরে ধীরে। দেবু আসে এগিয়ে—চণ্ডীমণ্ডপকে নির্ভর করে। মণ্ডপের ষড়ূদলে লেখা আছে : 'যাবচ্চন্দ্রর্ক মেদিনী'। সত্যি কি চন্দ্র–সূর্য যতোদিন থাকবে ততদিন চণ্ডীমণ্ডপ টিকবে—টিকবে তার ধারক সামন্তসমাজ ? তাহলে দেবুর এ রকম বিশ্বাস কেন ? আসলে দেবুর মন সমাজ সংস্কারের, সমাজ বিপ্লবের নয়। বিবেকানন্দ অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দর ভাবশিষ্য সে। আর্থিক হীনঅবস্থার জন্যে সমাজে প্রাপ্য আসন তার হাতছাড়া একথা ভাবলেও এর প্রকৃত কারণ সে অসুনন্ধান করে না। বরং চণ্ডীমণ্ডপকে পুরোনো শক্তিতে উজ্জীবিত করার পক্ষে তার আগ্রহ ব্যক্ত। শ্রীহরি কিংবা হরিশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সোচ্চার দেবু ; সে জগন ডাক্তারের দেশপ্রেমে স্বার্থ আবিষ্কার করে। আবার বিশ্বনাথের উপরও আস্থা রাখতে পারে না। মার্কসবাদী বিশুর চণ্ডীমণ্ডপকে কো–অপারেটিভ ব্যাংক করার প্রস্তাব এবং অর্থনীতিই যে সামাজিক অব্যবস্থার মূলে এই ব্যাখ্যায় উদ্বিগ্ন দেবু বলেছে : 'ছি-ছি-ছি বিশুভাই। তুমি ঠাকুরমশায়ের নাতি, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।' তার এই উদ্বেগ ধর্মকেন্দ্রিক প্রচলিত এ্যাস্টাব্লিশমেন্টের অনুকূলে সন্দেহ নেই। দেবুর তত্ত্বগত কোন রাজনৈতিক শিক্ষা ছিলো না কিন্তু ছিলো সংবেদনশীল মন। জনগণের পক্ষে ভূমি অফিসের কর্মচারীদের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে কারাবরণ করতে হয় তাকে। জেল থেকে ফিরে এসে যতীনের সাহচর্যে তার মধ্যে

রাজনৈতিক জ্ঞান ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। যতীনের সাহচর্য, বিশ্বনাথের মার্কসীয় তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে উজ্জীবিতকরণের চেষ্টা আর সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্ন সহানুভূতি সত্ত্বেও গান্ধীবাদী দেবনাথ ব্যর্থ। কারণ তার পক্ষে জনগণের সংগ্রামে ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন ছিলো না, তেমনি সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ছিলো অভাব। ওই সময়ের বাস্তবতায় সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত স্তর থেকেই নেতৃত্ব এসেছে, এ প্রসঙ্গে তানভীর মোকাম্মেলের বক্তব্য উল্লেখ করা দরকার : 'বাস্তবে সত্তর দশকে যখন নক্সাল আন্দোলনের ফলে বীরভূমের লালমাটি আরো লাল হল, তখনও আমরা নেতৃত্বে দেখি—না কোনো কৃষক সন্তান নয়, সিউড়ী বোলপুরের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়ির ছেলে অসীম চ্যাটার্জীকে। জনবিচ্ছিন্নতার কারণে দেবু ঘোষের মতো অসীম চ্যাটার্জীও ব্যর্থ হলেন।' ['তারাশঙ্কর, গান্ধীবাদ এবং বীরভূমের লালমাটি'] ডি-ক্লাস্ড্ অসীম চ্যাটার্জি যেখানে ব্যর্থ জনবিচ্ছিন্নতার কারণে, মধ্যবিত্ত দেবুর কাছে তাই সংগতকারণে বিপ্লবী সাফল্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। আসলে শ্রেণীচ্যুতি, জনসংশ্লিষ্টতা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠার সমন্বয় প্রায় সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেখা যায় না। তাই গান্ধীর আদর্শে উজ্জীবিত গ্রাম্য সমাজসংস্কারক দেবু ঘোষ আন্তরিকতায় ও ব্যর্থতায় যেন জীবন্ত–বাস্তব। এই বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় অনিরুদ্ধ কামার কর্তৃক ছিরু পালের বাগান ধ্বংসের মধ্যে। প্রতিবাদী অনিরুদ্ধরা প্রায়শই যে একা তারাশঙ্কর সে-কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 'পঞ্চগ্রামে'র শেষে শ্রীহরি তিলক-চন্দন এঁকে যে চণ্ডীমণ্ডপের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হয় এই সামাজিক বাস্তবতা বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপন্যাসে চিত্রিত। ন্যায়রত্নের ধর্মনিষ্ঠায় তারাশঙ্করের দুর্বলতা অপ্রকাশিত থাকে নি। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ব্যত্যয়হীনতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিলো বলেই ধর্মচেতনার প্রতিভূ ন্যায়রত্ন নয়, বিত্তের বৈভবে ছিরু পাল থেকে শ্রীহরি ঘোষ নামৈশ্বর্যধারণকারীকে তিনি সমাজপতির আসন দিয়েছেন। এই রাজনৈতিক সত্য রূপায়ণের মাধ্যমে শিল্পী তারাশঙ্কর ব্যক্তি তারাশঙ্করকে অতিক্রম করেন।

কালিন্দী (১৯৪০) সম্পর্কে যদিও বলা হয় : 'উপন্যাস হিসাবে কালিন্দী পূর্ণ সার্থকতার মর্যাদা দাবী করতে পারে না—সতর্ক শিল্প বিচারের দৃষ্টিতে তার বহু ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে।' [শ্রীজিতেন্দ্র চক্রবর্তী, *তারাশঙ্কর রচনাবলী* ২য় খণ্ডের ভূমিকা] তথাপি একথা মিথ্যে নয় যে, এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের সমাজ ও রাজনীতি অন্বেষা বিশেষভাবে প্রতিভাত। সাঁওতাল, চাষি, জমিদার ও মিল মালিক—'চঞ্চলা কিশোরীর মতো কালিন্দীর' একটি চরকে কেন্দ্র করে সমাজের এই চার স্তরের শ্রেণী প্রতিনিধির অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তিনি রূপ দিয়েছেন উপন্যাসে। এ যেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সমাজবিকাশের এক অনিবার্য পারম্পর্য। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে যদি আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রতিনিধি বলে মনে করা যায় তাহলে রংলাল, নবীন, ননী প্রমুখ চাষি পরবর্তীকালের কৃষিপত্তন–কেন্দ্রিক সমাজের মানুষ। আর রায়-চক্রবর্তীরা সামন্তবাদী

সমাজের প্রতিনিধি যদি হয়, তো বিমল মুখার্জি যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক। অহীন্দ্র সেই যে বলেছিলো : 'ভয় নেই, এ যুগে গৌতমেরা সংসার ত্যাগ করে নির্বাণের জন্যে বনে যায় না। এ যুগের নির্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে।'—সমাজের এই 'অর্থনৈতিক অবস্থা' তারাশঙ্কর গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তারই বাণীরূপ এই উপন্যাসটি। পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের লড়াইয়ে তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের পক্ষাবলম্বনকারী বলে যে আপ্ত-অভিযোগটি রয়েছে—*কালিন্দী* এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। এখানে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ইন্দ্ররায়ের কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ ও পরাজয় এবং চিনিকলের মালিক ধনবাদী বিমল মুখার্জির বিজয় সুনিশ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত। বরং বলা চলে রায়ত-জমিদার-মহাজন চাক্রিক পূর্ণায়ত যে নিখুঁত বৃত্তটি তিনি এঁকেছেন বাংলা উপন্যাসে ইতঃপূর্বে সামন্ততন্ত্রের এতোটা যথাযথ প্রতিচিত্র আর দেখা যায় নি। নায়েবের ছদ্মাবরণে যোগেশ মজুমদারের মহাজনি চরিত্র পরবর্তীকালে মহীন্দ্রর ননীপাল হত্যার সুযোগে জমিদারি গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বিমল মুখার্জি যন্ত্রনির্ভর পুঁজি নিয়ে আবির্ভূত হলে যোগেশের কৃষিভিত্তিক পুঁজি তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই উপন্যাসে ঔপনিবেশিক ভারতে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বিমল মুখার্জির সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী রায়-চক্রবর্তীদের যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে তা সমাজ রাজনীতির সুপার স্ট্রাকচারাল মুখচিত্র। তবে এখানে চাষি মানেই প্রলেতারিয়েত শক্তির অনুকূলবর্তী স্রোতোধারা নয়— এদেরও লোভ, হিংসা আছে। নবীন কিংবা রংলালের জমির অংশীদারিত্বের জন্য কপট ও কৌশলী হওয়ার মধ্যেই সমাজের বাস্তবতা প্রতিবিম্বিত। এদের সর্বহারায় রূপান্তরের প্রচেষ্টাই বরং ইউটোপিয়ান বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। সাঁওতালদের আদিম সরলতা, পূর্ববর্তী বিদ্রোহের তেজোদীপ্ত ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ওই সময়ের বাস্তবতা তাদের আবাসসন্ধানী মন নিয়ে ভূমি খুঁজে ফেরা। ঔপন্যাসিক হয়তো পারতেন আর একটি সাঁওতাল বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিতে, চাষিদের দিয়ে কৃষক বিদ্রোহ ঘটাতে। এতে কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ হয়তো উপন্যাসে হতো, কিন্তু তা বাস্তবতার মাটি পেতো না। এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য যথাযথ : 'তারাশঙ্কর সাঁওতাল চাষী ইত্যাদির সংগ্রাম, বিদ্রোহ দেখান না, কিন্তু তাদের অসহায়তা—আত্মসমর্পণের পটভূমিতেই জমিদারপুত্র অহীন্দ্রর উত্তরণ দেখান। ঐ দারিদ্র্যে শোষণ-অসহায়তা-আত্মসমর্পণ এই উত্তরণের তাৎপর্যকেই আরও গভীর করেছে।' ['কালিন্দীর সমাজতত্ত্ব'] অহীন্দ্র পিতামহ সোমেশ্বরের সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশ নেয়ার আবেগে এবং অধীত জ্ঞান সূত্রে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। মার্কস সে পড়েছে, লেনিন-ক্রুপস্কায়া সম্পর্কে সে জানে, সমাজের অসাম্যের মূলে যে অর্থনৈতিক অসমতা এ বোধও তার আছে। কিন্তু তার পরও আভিজাত্য এবং শ্রেণীস্বার্থ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অহীন্দ্রর এই সীমাবদ্ধতা ঔপন্যাসিকের স্বেচ্ছারোপিত নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ। অহীন্দ্র একই সঙ্গে মুৎসুদ্দি পুঁজি ও

সামন্ততান্ত্রিক অর্থের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে লড়তে যায়, কারণ সে মার্কসের তত্ত্বে উদ্দীপ্ত। কিন্তু শ্রেণীচেতনায় সর্বাংশে দৃঢ় নয় বলে মানবতাই তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে : 'নো নো অমল, নট অ্যাজ এ প্রিন্স অর এ লর্ড, জমিদার বা ধনী হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখ দূর করতে হবে।' সম্পদের সাম্য ও মানবতায় বিশ্বাসী এ রকম বহু অহীন্দ্র পরবর্তীকালে নিজেদের বিত্ত-বৈভবের মোহ অতিক্রম করে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে— এই উপমহাদেশের সমাজবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই অহীন্দ্র বন্দি হলেও একটি আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে : 'একদিন তো তিনি ফিরে আসবেন।' আসলে এই অহীন্দ্র চরিত্রটির মধ্যেই তারাশঙ্কর যেন খুঁজে পান আশ্রয় আর নিশ্চয়তার অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তার।

রাজনীতির প্রত্যক্ষতা, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট আর সাম্যবাদী মতবাদনিষ্ঠতায় রচিত তারাশঙ্করের *মন্বন্তর* (১৯৪৪) উপন্যাস। মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট চরিত্র সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উপন্যাসটি বিতর্কিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার নগরজীবন এর অবলম্বন। উনবিংশ শতাব্দীর বেনিয়া পুঁজির ছায়াতলে সম্প্রসারিত শহুরে ধনশালী গোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থতার কারণে কীভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় তার পরিচয় উঠে এসেছে সুখময় চক্রবর্তীর পরিবার ও প্রাসাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে কানাই, বিজয়দা, নীলা, নেপী এই প্রধান চরিত্রগুলোর প্রত্যক্ষ রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা— বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ ওই সময়ের রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তারকে চিহ্নিত করে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক যেন এখানে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারে অনেকটা অমনোযোগী। তাঁর কমিউনিস্ট চরিত্রগুলোও তাত্ত্বিক অর্থে যথার্থ শ্রেণীচ্যুত প্রলেতারিয়েত কমরেড নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কবলিত তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট—কিন্তু এই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশ্বরাজনীতি ও আগ্রাসী দেশগুলো সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বড় বেশি প্রতিক্রিয়াহীন। তবে দুর্ভিক্ষ উল্লেখের পাশাপাশি এর কারণ শনাক্তকরণে তিনি যেন বেশ সচেতন ও আন্তরিক। কানাইয়ের ছাত্রের কালোবাজারি পিতার বক্তব্য : 'আমাদের গুদামের চাবি যদি এক সপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আটদিনের দিন বাংলাদেশে উনোন জ্বলবে না।' অথবা 'জানেন মাস্টারমশাই আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম তবে এই যুদ্ধের বাজারে যে-কি লাভ হতো সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করছে ইউরোপীয় কোম্পানী।' এর মধ্যে তারাশঙ্কর এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ তুলে ধরেছেন। এই কালোবাজারিরা অর্থ লাভের আশায় খাদ্য গুদামজাত করে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিয়েছে। লাভের অংক বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক মনে করেছে ইংরেজ বেনিয়াদের। এই কালোবাজারিদের 'স্বাধীনতা' কামনার পেছনেও রয়েছে সাধারণ মানুষকে শোষণ করার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের বাসনা। শোষকশ্রেণীর স্বরূপ

উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর নিশ্চয় রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একটি চরিত্রকেও রাজনৈতিকভাবে যথাযথ কমিউনিস্ট করে গড়ে ওঠার সুযোগ দেন নি। বামপন্থীদের কাজও বেশির ভাগ সীমাবদ্ধ থেকেছে ইউনিভার্সিটিতে সভা ও কফি হাউসের উত্তপ্ত আলোচনায়। নীলা ও তার সাহোদর নৃপেন ওরফে নেপী পারিবারিক ঐতিহ্য ও পশ্চাৎপদ ভিত্তিভূমি ত্যাগ করে সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। নেপী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পার্টির বক্তব্য প্রচার করে বেড়ায়, দেয়ালে পোস্টার লাগায় , অনাহারীদের নিয়ে মিছিল করে অন্নবস্ত্রের দাবিতে। নীলাও আদর্শের তাগিদে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হতে চায়। কিন্তু এরা নির্ভর করে যার উপর সেই কমিউনিস্ট নেতা বিজয় দা নিজেই আক্রান্ত হয় পেটি-বুর্জোয়া সুলভ মানসিকতায়। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামী তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনকালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গান্ধীকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে ভেবেছে। অথচ বিজয়দা মহাত্মা গান্ধীর অনশনভঙ্গের সংবাদ শুনে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে 'বশিষ্ঠের পুণ্যফল' ও 'সত্য ধর্মে'র প্রতিষ্ঠা *দ্যাস ক্যাপিটেল*-এর বদলে গীতার সার্থকতা তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মূর্ত চিরন্তন ভাবধারা আর রবীন্দ্রনাথের সুরমাধুর্যে অবশেষে আশ্বস্ত হয় কথিত কমিউনিস্ট বিজয়দা ('ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী—হে মাহাত্মা, যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে সেই চিরন্তন রূপে নবকালের পটভূমিকায়, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সুরমাধুর্যে ; ...')। এর আগে লক্ষ করা গেছে যে, তারাশঙ্কর নিজেও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন ঈশ্বর বিশ্বাসের মাহাত্ম্য। নীলা ও নেপীর অবস্থাও যেন প্রায় অভিন্ন। মহাত্মা গান্ধীর এই অনশনে তারাও বিচলিত ; —হয়তো নিজেদের সাম্যবাদী আদর্শে তারা অবিচল নয় বলেই এমন ভাবনা তাদের। কানাই পারিবারিক 'পচনশীল পতনশীল বিলাসী গৃহ' থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে সত্যি কিন্তু সে-ও দলে সার্বক্ষণিক নয়, এমন কি আদর্শিকভাবেও সুদৃঢ় নয়। বিজয়দা তাকে 'ধূসর মধ্যবিত্ত' বলে অভিহিত করেছেন। এই বক্তব্য অযথার্থ নয়। এক বেলা টিউশনি করে যে চলতে চায়, সেই কানাই মধ্যবিত্তের ধূসরতার জন্যে অমলবাবুর চালের ব্যবসার প্রলোভন উপেক্ষা করতে পারে না। গুণদা-দা যেন অবসর-প্রাপ্ত বিপ্লবী—অথচ তাকে কানাই মনে করে 'বাংলার মাটির শ্রেষ্ঠফুল'। এই কমিউনিস্ট চরিত্রগুলোর তুলনায় বরং অকমিউনিস্ট চরিত্রগুলো অনেকাংশেই যথার্থ। এ প্রসঙ্গে গুণদা-দার স্ত্রী কিংবা দেবপ্রসাদ চরিত্রের কথা বলা যায়। দেবপ্রসাদ ভাববাদী উদার মনে পুত্র-কন্যাকে যুগোপযোগী হবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের কুলধর্ম লঙ্ঘনে পরে তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। তার মনস্তাপ : 'জীবনে যে পাপ তার সংসারে পুঞ্জীভূত হয়েছে নীলার কর্মে—নেপীর কর্মের ফলে—যে পাপ তিনি করেছেন কন্যাকে পুত্রকে কুলধর্ম

লঙ্ঘন করার স্বাধীনতা দিয়ে,—এ তারই দণ্ড।' এ-কারণে নীলাকে পাত্রস্থ করার জন্যে তার উদ্‌যোগ গ্রহণ, পুত্রকে গ্রামে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লেখা। শুধু তাই নয়, তার স্পষ্ট আদেশ : 'ছেলেদেরও চাষাবাদ করতে শিখিয়ো ; লেখাপড়া যতটুকু না হলে নয় ততটুকু। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো আমার নিষেধ রইল।' এটা 'ব্যাক টু দ্য ভিলেজ' নয়—স্ববিরোধী দেবপ্রসাদের সভ্যতার পশ্চাৎমুখীগমন।

দেবপ্রসাদের এই দ্বন্দ্ব বা পশ্চাদপসারণ অসম্ভব নয়। কানাই, নীলা, নেপীর মধ্যেও মধ্যবিত্তের অন্তর্টানজনিত কারণে সাম্যবাদী আদর্শে হয়তো দ্বিধার অনুপ্রবেশ ঘটেছে কখনো। কিন্তু পোড়খাওয়া বিজয়দা কেন প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্রের সর্বগুণের অধিকারী হতে পারলো না ? তারাশঙ্কর যে সময় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সভাপতি তখন উপন্যাসটি *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত (১৯৪৩) হয়। আসলে বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা তিনি কিছু দিনের জন্য হলেও ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজয়দা চরিত্রে তাঁর ব্যক্তিপ্রভাব অনিবার্য। নিজের ব্যক্তি–অনুভূতিটাই হয়তো একটু মোচড় দিয়ে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিজয়দা চরিত্রে ; এ-কারণে বিজয়দা গান্ধী সম্পর্কে বিরূপ নয়। উদার গান্ধীবাদী ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব সত্ত্বেও নিজে স্ববিশ্বাসে আস্থা হারান নি কখনো। কিন্তু কমিউনিস্ট বিজয়দা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে গান্ধীর প্রতি এবং এর ফলে সে আর কমিউনিস্ট থাকে না, হয়ে পড়ে সোসালিস্ট-ডেমোক্র্যাট। এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের দীর্ঘকাল পর প্রদত্ত ভাষ্য উল্লেখ করা দরকার। *আমার সাহিত্য জীবন* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : '...বিজয়বাবু কম্যুনিস্ট হলেও এই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য নন। আমার অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও গান্ধীজীর প্রতি অনুরক্তিই তার উপর আরোপিত হয়েছে।' ফলে একথা স্পষ্ট যে, বিজয়দাকে তিনি প্রকৃত কমিউনিস্ট করে গড়ে তুলেন নি। এ উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলো সম্পর্কেও তাঁর স্বীকৃতি : 'তারা কি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কম্যুনিস্টদের সগোত্র, এক দলের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ? ' এ-কারণে, মানতেই হবে, গান্ধীবাদী তারাশঙ্করের হাতে *মন্বন্তরে* কোন যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র সৃষ্টি হয় নি—এদের রাজনীতিও প্রকৃত সমাজতন্ত্রের রাজনীতি নয়। তবে তারাশঙ্কর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব যে ওই সমাজে ছিলো না তা ভাববার অবকাশ নেই।

সন্দীপন পাঠশালা-য় (১৯৪৬) বড় বেশি আলোকপ্রক্ষেপণ সীতারাম নামক একটি বিশেষ চরিত্রের উপর—উপন্যাসের বক্তব্যও তাকে অবলম্বন করে ব্যক্ত। 'সীতারাম আমার কাছে বাস্তব, তার মনের পরিচয় বহুবার পেয়েছি।'—এই ঔপন্যাসিক স্বীকৃতির পরও বলতে হয়, বাস্তব চরিত্রের সাহিত্যিক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর এখানে তুলে এনেছেন একটি বিকাশমান সমাজের অন্তর্স্থিত রাজনৈতিক প্রবহমানতা। সদ্‌গোপ শ্রেণীভুক্ত সীতারামের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠা ও পরাজয়ের মধ্য

দিয়ে এই প্রবহমানতা অভিব্যক্ত। *দৈনিক কৃষক* পত্রিকায় প্রকাশের সময় (১৯৪৫) উপন্যাসটির *উদয়াস্ত* নামকরণের মধ্যেও এর ইঙ্গিত আছে। সীতারাম প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষাধারায় সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে উদিত হয়েছিলো বটে, কিন্তু আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তনকালে সে হয়ে পড়ে অস্তমিত—দৈহিক শক্তিতে, আদর্শের প্রথাবদ্ধতায়। তার এ উদয়-অস্তের কাহিনী আসলে একটি সামাজিক পালাবদল, একটি রাজনৈতিক ক্রিয়া-সংঘটনেরই মোড় ফেরার দ্যোতক। নানা জাত ও বর্ণে বিভক্ত ভারতীয় সমাজে শুধু সদ্‌গোপ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে পাঠশালা স্থাপনে সীতারামের প্রয়াস নিশ্চয়ই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের শিক্ষাগ্রসরতার পক্ষে সহায়ক। ভারত রাষ্ট্রে গড়ে ওঠা 'দলিত' রাজনীতির কন্‌সেপ্টে সীতারাম তাহলে তাদেরই একজন। তপসিলীদের বক্তব্য ও দাবির প্রেক্ষাপটে হয়তো বলা চলে, সীতারাম বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি, তাদের সমাজে অগ্রবর্তী হবার পথিকৃতের ভূমিকায় আবির্ভূত। কিন্তু এই অগ্রসরতা সচেতন শ্রেণী মানসিকতা নয়, বরং দলিত বা অন্ত্যজ থেকে বাবুদের সমগোত্রীয় হবার সুপ্ত বাসনা থেকে উত্থিত। জ্যোতিষ সাহার উদ্দেশে সীতারামের উক্তি ('বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাৎ থাকবে না।') কিংবা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতালদের লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হবার কাহিনীর মধ্যে শোষণের কারণ নির্দেশ ও প্রতিকারের ইঙ্গিতও নেই, বরং মধ্যবিত্তের জীবনাকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে উঠেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ আবেগ লক্ষ করে বলেছেন : 'ইংরেজি লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাস গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা তাদের মধ্যে প্রবল।' [*বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ*] সীতারাম যদিও 'পণ্ডিত' তবুও এটাতো সত্যি যে, তার কোন শিক্ষাই সুসম্পন্ন নয়—না প্রাতিষ্ঠানিক, না সামাজিক। ফলে তাত্ত্বিক মাপকাঠিতে তাকে সম্পূর্ণত মেলানো যাবে না। তবে জাতপাতের বর্ণীয় স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সে-যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলো এই দিকটি ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সদ্‌গোপ শিক্ষক হয়েও সে যে জমিদার ও বাবুদের সমীহ আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলো উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। পলাশবুনির পণ্ডিতমশাই যেমন বলেন : 'বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখারী ব্রাহ্মণ তো এক নয়'—ঠিক তেমনি সদ্‌গোপ মহাজন ও সদ্‌গোপ পণ্ডিতও এক হতে পারে না। এই শ্রেণীসত্য, এই বিভাজিত অর্থনীতির বর্গীকরণ সীতারামের জানা ছিলোনা ;—না অর্জিত শিক্ষায়, না অভিজ্ঞতায়। যৌবনের আবেগ উত্তেজনা ও অনমনীয়তা জীবনসায়াহ্নে এসে সে হারিয়ে ফেলে, আত্মগোপন করে অধ্যাত্মবাদে। গান্ধীর প্রতি তার ভক্তি, জাতীয় পতাকাকে লুকিয়ে প্রণাম বা ধীরানন্দ কর্তৃক তাকে নমস্কার জানানো এক কথায় ভারতীয় ঐতিহ্য, স্বাধীনতা কামনা আর আত্মবিকাশের প্রথাগত ধারাকেই চিহ্নিত করে একথা সত্য। কিন্তু ফ্রি-স্কুলের মাধ্যমে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন ঘটলে সামন্ততন্ত্রনির্ভর সন্দীপন পাঠশালা উঠে যায়। বর্ণভেদ শিক্ষা

পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রথাগত প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যার উদয়, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে তার পরাজয় অস্তাচলেরই ইঙ্গিত দেয়। আসলে সীতারামের জীবনের উদয়াস্তই একটি সময়ের প্রতীকী উদ্ভাস। তারাশঙ্কর এখানেও যথাযথ—রাজনীতির সামাজিক অভিঘাতকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে প্রাচীন শিক্ষামোহের আত্মসমর্পণ চিত্রণে। প্রাচীনপন্থী সীতারাম নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে—উপন্যাসে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭) উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যতোটা রাজনীতি-নির্ভর, তার চেয়ে বরং অনেক বেশি সমাজ-নির্ভর। যদিও এর সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কোন এক কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত, তবু কাহিনীটি যেন গড়ে উঠেছে মিথিক আবহে। উপন্যাসের নামকরণে তাই ঔপন্যাসিক বোধকরি ভেবে চিন্তেই উপকথা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আসলে এটাইতো সত্য যে, ওই সময় কলিকাতা শহরের আধুনিক জীবনযাপনের পাশে অল্প দূরে অবস্থিত বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার আদিবাসীদের প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাপনও বর্তমান ছিলো। এদের এই বিচিত্র জীবনযাপন যেন সত্যি মিথ-তুল্য—যেন উপকথা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ করি এ কারণেই বলেছেন : 'গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নহে উপকথা।' [*বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*] কিন্তু বলতেই হয়, তাঁর সরল দর্শনজনিত প্রথাগত মন্তব্য এটি। কারণ এখানে মিথের আবহ থাকলেও 'ইহা ইতিহাস নহে' কথাটির সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। তারাশঙ্কর তাঁর *ধাত্রী দেবতা, গণদেবতা- পঞ্চগ্রাম*, বা *কালিন্দী*-র মতো উপন্যাসে ডোম, বাগ্দী ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের খণ্ডিত জীবন তুলে এনেছেন। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসের পুরো চিত্রপটই তাদের। এখানে বনওয়ারী আর করালীর দ্বন্দ্ব শুধু ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নেই। ক্ষেত্র গুপ্তর ভাষায় : 'বনওয়ারী ও করালী যতটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী এক-একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি।' ['তারাশঙ্করের উপন্যাস : শিল্পরীতি'] কিন্তু এই শ্রেণী সত্যটা একটু জটিল এই উপন্যাসে। কারণ বনওয়ারী কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে উত্থিত হলেও জমিদার বা ভূ-স্বামী সে নয়,—বর্গাচাষি, অন্যদিকে করালীও শ্রমিক। তবে এদের দুয়ের দ্বন্দ্বের মূল হলো কৃষি এবং কারখানায়। বনওয়ারী কাহার পাড়ার মোড়ল—অথচ সে ভয় পায় কাহারদেরই সন্তান করালীকে। এর কারণ আদিবাসী সমাজও শিল্প বা পুঁজির আগ্রাসন থেকে মুক্ত নয়। কলের বাতাস ও ঘ্রাণ চাষের লক্ষ্মী যে সহ্য করতে পারে না তা বনওয়ারী ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই কৃষিজীবী বনওয়ারী কারখানার শ্রমিক করালীর কাছে পরাজিত হয়। বনওয়ারী যেখানে লুম্পেন কৃষিজীবী, সেখানে প্রলেতারিয়েতের গুণ-সম্বলিত করালী। এই দুই ধরনের শ্রমজীবীর আন্তঃপার্থক্য তারাশঙ্কর যেভাবে স্পষ্ট করেছেন মনোযোগের অভাবে তা অনেক সময়ই আমাদের বোধের বাইরে চলে যায় এবং এ কারণেই ঘটে বিভ্রান্তি। করালী সেই

'ডাকাবুকো'পুরুষ যে বনওয়ারীকে একাধিকবার শুধু পরাস্তই করে না, তার জীবনসঙ্গিনীকেও অধিকার করে। আসলে সে মিথিক পরিমণ্ডলের ভিত চূর্ণকারী, প্রাচীনপন্থী কাহারি–ক্ষত্রিয়পণা বিনাশী আরেক পরশুরাম। তার কারণেই কাহাররা চন্দনপুরে কারখানার শ্রমিক হয়ে যায়। কাহারদের জীবন শহুরে সভ্যতার বাইরে বটে, কিন্তু যখন তাদের মুখে শোনা যায় 'পৃথিমীতে যুদ্ধ বেধেছে' বা 'জাপুনি না কারা আসছে' অথবা 'স্বদেশীবাবুরা অ্যাল-লাইন তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে' কিংবা 'গেরামে শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কাণ্ডকারখানা' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে'র (১৯৪২) প্রভাব এদের উপরও পড়েছে। এই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনায় কাহাররা প্রত্যক্ষত সংগ্রামী হয়তো নয়, কিন্তু এর অভিঘাতে এদের শাশ্বত জীবনপট অনিবার্য পরিবর্তনমুখী—এটাই ইতিহাস কিংবা কালধর্ম। এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস। এ–প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক গবেষণায় ভীষ্মদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন : 'এটি ইতিহাসেরই অনিবার্য উত্তরণ।' [*তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*] সম্প্রতি *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা-ও আমাদের ভাবনার অনুকূলে : 'এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে মিথ-এর পুরাকাহিনী তথা উপকথা ইতিহাসের চলৎস্রোতে মিশে যায়।' ['ইস্তাহারের লাল দর্পণে দেখা 'সর্বহারা' : তারাশঙ্করের পুনর্বিচার']

চার

প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* থেকেই মূলত তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতির সক্রিয় প্রভাব কার্যকর ছিলো। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু শক্তির বিরুদ্ধে যেমন শোষিত ছোট কৃষক ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি ধনতান্ত্রিক মালিক পক্ষের সঙ্গে সৃষ্ট শ্রমিক সংঘর্ষও উঠে এসেছে। *চৈতালী ঘূর্ণি*-র স্পষ্ট দুটো ভাগ। প্রথম অর্ধাংশে সামন্ততান্ত্রিক জীবন প্রবাহের অনুপুঙ্খ ছবি অঙ্কিত, পরবর্তী অংশে ধনবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের দিনলিপি বিধৃত। গোষ্ঠ-দামিনী পরিবার সুদখোর কাবুলিওয়ালা, রসিক মহাজন, গ্রামের টাউট সতীশ সরকার এমন কী জমিদারের চাপরাশি কর্তৃক নানাভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গোষ্ঠ-দামিনীর বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে আশ্রয় লাভের পেছনে সামন্ততান্ত্রিক চতুর্মুখী শোষণের যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাতে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় মেলে। শরৎ চন্দ্রের গফুর ও আমেনা অনেকটা পালিয়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছিলো। গোষ্ঠ জমিদারের চাপরাশিকে হত্যা করে দামিনীকে নিয়ে শহরে আসে। এখানে গ্রামের শোষিত মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, পাশাপাশি তারা যে সংগঠিত নয় এ সত্যটিও এসেছে উঠে। শহরে আসা গোষ্ঠকে প্রকৃত প্রলেতারিয়েত বলা যাবে না। স্ত্রী-সহ বস্তিতে সামান্য আশ্রয় লাভ করে তার যেন স্বস্তি : 'গোষ্ঠ কহে

বেশ ঠাঁই, হেথায় থাকা যাক কি বল।' তার পরও ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সে হয়ে ওঠে সর্বহারা মানুষের প্রতীক। তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম উপন্যাসেই শ্রমিক আন্দোলন আনলেন কিন্তু এর নেতৃত্ব তুলে দিলেন শিবকালী আর সুরেনের হাতে— যারা মূলত মধ্যবত্তি কেরানি আর টাইপিস্ট। শিবকালী বা সুরেন কেউ-ই প্রকৃত কম্যুনিস্ট নয় বরং তারা অহিংস গান্ধীর প্রতিই অপেক্ষাকৃত বেশি অনুরক্ত। এ কারণে তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন মধ্যবিত্তের স্বপ্নচারিতা আর ভাবাবেগে আপ্লুত। তবে 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর'—এই প্রত্যাশা ঔপন্যাসিকের আন্তরিক উচ্চারণ বলেই ধারণা করি। কেননা তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে হেডপণ্ডিত, কাবুলিওয়ালা, চৌধুরী, বুড়ি রাঙাদি সবাইকে মহাজনের কাতারভুক্ত করে তাদের শোষণের নির্দয়তা যেমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন, তেমনি শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শিবকালী ও সুরেনের মেহনতি মানুষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রশ্নে ভেতরের দূরত্বটুকু আবিষ্কার ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'তারা শ্রমিকদের আড্ডায় যাইত ; ওদের মত হইয়া মিলিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু মিলিত না।' গান্ধীর আদর্শে তারাশঙ্কর অনুপ্রাণিত হলেও স্বরাজপন্থী সুভাষ বসুর ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। 'আমার জীবনে সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর সুভাষ বসুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও নিজের অভিভূত হবার কথা ব্যক্ত করেছেন। *চৈতালী ঘূর্ণি* সুভাষ বসুকে উৎসর্গিত—তাঁকে বলা হয়েছে বাঙলার যৌবশক্তির প্রতীক ও নবযুগের অগ্রদূত। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে *চৈতালী ঘূর্ণি* যখন প্রকাশিত হয় তখন মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ বসুর রাজনৈতিক মত ও পথের পার্থক্য স্পষ্ট। তার পরও তারাশঙ্কর অহিংস মতবাদের প্রাণপুরুষ গান্ধীকে নয়, সুভাষচন্দ্রকেই উৎসর্গ করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস [মহাত্মা গান্ধীকে অনেক পরে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *১৩৫০* নামক ছোট গল্প সংকলন উৎসর্গ করেছিলেন]। আসলে প্রথম-জীবন থেকে কংগ্রেসের রাজনীতি ও গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও সমাজতন্ত্র বা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা তখন থেকেই তারাশঙ্করকে অল্প বিস্তর আকৃষ্ট করেছিলো। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব ও তার দুনিয়া ব্যাপী প্রভাবও তার উপর পড়েছিলো অনিবার্যভাবে। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সঙ্গে সংযুক্তি বা *মন্বন্তর* রচনা এই প্রভাবের ধারাবাহিকতা মাত্র। তারাশঙ্করের জীবনের শেষ উপন্যাস ১৯৭১-এর *একটি কালো মেয়ের কথা*-তেও *চৈতালী ঘূর্ণি*-র মতো সাম্য-সমাজের বক্তব্য এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস–কাহিনী এটি। ভীষ্মদেব চৌধুরী লিখেছেন : 'ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে শুদ্ধ তথ্য-উপস্থাপনার ব্যাপারে *একটি কালো মেয়ের কথা*-য় বার্ধক্যপীড়িত তারাশঙ্করের প্রযত্ন বিস্ময়কর।' [প্রাগুক্ত] এই কাহিনীতে নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং ও কালো মেয়ে নাজমার জীবনকথার চেয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মার্চ-এপ্রিলের রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটনই মুখ্য হয়ে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। কিন্তু তারাশঙ্করের নায়ক ডেভিড

সমাজতন্ত্রী ন্যাপ (ভাসানী)-এর সমর্থক বলেই মনে হয়। এ-প্রসঙ্গে পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে তার বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

--ওদের দলের সঙ্গে আপনি কতটা জড়িত ?

—সম্পর্ক সামান্যই—তবু মৌলানা সাহেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আশ্চর্য মানুষ!

—তাহলেও কোন দলের রাজনীতি আপনার ভালো লাগে ?

—একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বললে—তাই বা কি করে বলি ? মৌলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর দুজনের মতকেই আমার ভাল লাগে।

ডেভিডের স্ত্রী ছায়াও ছিলো মৌলানা ভাসানী ও তাঁর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। আসলে এই ঘনিষ্ঠতা বা প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলো ব্যক্তি তারাশঙ্করেরও। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৌলানা ভাসানী আহূত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যোগদান করেন। ওই বছরই ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদার সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ—সে সংবাদ নিশ্চয়ই তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন। ভীষ্মদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন : 'বহির্দেশীয় নাগরিক হিসেবে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে যে সম্ভাবনাকে তিনি দূরদর্শন করেছেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তিনি প্রয়োগ করেছেন পূর্ববঙ্গে অভিভাসনকারী ডেভিড আর্মস্ট্রং নামক চরিত্রের ওপর।' [প্রাগুক্ত] বক্তব্যটি যথার্থ। ডেভিড যেন ঔপন্যাসিকেরই ছায়া-চরিত্র। লক্ষণীয় বিষয়, জাতীয়তাবাদের সমর্থক ও গান্ধীর প্রতি আদর্শিকভাবে অনুগত তারাশঙ্কর জীবনের অন্তিম পর্যায়েও জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ নয়, নায়ক ডেভিডকে সম্পৃক্ত করলেন সমাজতন্ত্রী ন্যাপের সঙ্গে। এভাবেই কি অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতার পথ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন ?

প্রকৃতপক্ষে *চৈতালী ঘূর্ণি*-তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক পথ ও মতের যে দ্বিধা লক্ষ করা যায়, *একটি কালো মেয়ের কথা*-তেও তা বর্তমান ছিলো। জীবনাদর্শে তিনি অহিংস গান্ধীবাদী ছিলেন, এবং তাই সমাজতন্ত্রের বস্তুসর্বস্বতাকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ও 'মনের আয়নায় নিজের ছবি' প্রবন্ধের প্রথমাংশ যেন কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য প্রদানের লক্ষ্যেই রচিত। কিন্তু তার পরও তাঁর উপর গান্ধী ও লেনিনের প্রভাব সমানভাবেই কার্যকর ছিলো সে কথা তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন শেষ জীবনে রচিত একটি প্রবন্ধে : 'সারাজীবনই আমি আমার জীবনের আচরণের মধ্যে সেই পথ ধরেই চলতে চেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি লেনিনও আছেন। গান্ধীজীর বাণী এসেছিল প্রথম। তারপর এসেছিল লেনিন।' (উদ্ধৃত ; নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*) গান্ধী ও লেনিনের আদর্শ তারাশঙ্করের মনকে অহর্নিশ দ্বন্দ্বতাড়িত করেছে। অধিকাংশ সময়ই তিনি ঝুঁকে পড়েছেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এটা ঠিক ; কিন্তু তাঁর মনের এই দ্বন্দ্বের সমাধান বোধ করি শেষ অবধি হয় নি। এই দ্বন্দ্বেই প্রভাবিত তাঁর উপন্যাসের রাজনীতি।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের প্রতি তারাশঙ্করের অনুরাগের প্রধান কারণ ঔপন্যাসিকের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। তাই দ্বন্দ্বের মধ্যেও তারাশঙ্করের সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিলো ওই দিকে। তানভীর মোকাম্মেল উল্লেখ করেছেন : 'সে যুগে অবশ্যই মূল দ্বন্দ্ব জমিদার-কৃষক ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যবাদ বনাম গোটা জাতীয় স্বার্থের।' [প্রাগুক্ত] জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সম্পন্ন তারাশঙ্কর তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন ; যদিও তাঁর জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারত। নিজের জীবনযাপন, আহার, লিখতে বসার পদ্ধতি ইত্যাদিতে যিনি আদ্যোপান্ত 'ভারতীয়' হবার চেষ্টা করেছেন জীবনভর, তাঁর উপন্যাসের রাজনীতি-রচনায় এর যে প্রভাব পড়বে তাতো অনিবার্য সত্য। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসে যে যথাযথতা পরিস্ফুট তা বিশেষ মূল্য দাবি করে। ভূস্বামী তলস্তয়কে লেনিন 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন : 'লেভ তলস্তয়ের সাহিত্যিক রচনাবলি পড়ে রুশ শ্রমিক শ্রেণী তার শত্রুদের আরও ভালভাবে চিনতে শিখবে, কিন্তু তলস্তয়ের মতবাদ বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমগ্র রুশ জনগণকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের দুর্বলতাটা কোথায়—যে দুর্বলতা তাদের মুক্তির লক্ষ্যটাকে সমাপ্তি অবধি নিয়ে যেতে দেয়নি। এগিয়ে যাবার জন্যে এটা অবশ্যই বোঝা দরকার।' [*সাহিত্য প্রসঙ্গে*] একইভাবে বলা চলে যে, তারাশঙ্করের সমকালে রাজনীতির 'দুর্বলতাটা কোথায়', তাঁর উপন্যাসে রাজনীতির পাঠে এর সূত্র-সন্ধান হয়তো সম্ভব।

সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল কাদির ; *কাজী আবদুল ওদুদ*, ১৯৭৬, ঢাকা।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক) ; *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য*, ১৯৮৯, কলিকাতা।

তানভীর মোকাম্মেল ; *মার্কসবাদ ও সাহিত্য*, ১৯৮৯, ঢাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; *আমার সাহিত্য জীবন* (প্রথম পর্ব), ১৩৬০, কলিকাতা।

—*আমার সাহিত্য জীবন* (দ্বিতীয় পর্ব), ১৩৬৯, কলিকাতা।

—*আমার কালের কথা, তারাশঙ্কর রচনাবলী* ১০ম খণ্ড, ১৩৮৮, কলিকাতা।

—*তারাশঙ্কর বীথিকা*, ১৯৮৪, কলিকাতা।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী ; *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, ১৯৮০, কলিকাতা।

নিতাই বসু ; *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*, ১৯৮৮, কলিকাতা।

পাক্ষিক দেশ ; সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, কলিকাতা।

ভ ই লেনিন ; *সাহিত্য প্রসঙ্গে*, ১৯৭৬, মস্কো।

ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, ১৯৯৮, ঢাকা।

মাসিক পশ্চিমবঙ্গ ; দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, গান্ধী সংখ্যা, ১৯৮৮, কলিকাতা।

মার্কস এঙ্গেলস ; *ধর্ম প্রসঙ্গে*, ১৯৮১, মস্কো।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ১৩৮০, কলিকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ১৯৭১, কলিকাতা।

—তারাশঙ্কর অন্বেষা (সম্পাদিত) ১৯৮৭, কলিকাতা।

—*বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ*, ১৯৯৩, কলিকাতা।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; *বঙ্কিম চন্দ্র*, ১৯৬৮, কলিকাতা।

অরণ্য-বহ্নি : ঐতিহাসিক পটভূমি

সৌরভ সিকদার

বাংলা কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার সূচনা হয়েছিল সেই উনিশ-শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)-এর হাতে। তাঁর *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) বাংলাসাহিত্যে রোমান্সের আদর্শে রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনার একশ বছর পর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৪-৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে মহাকাব্যিক পটভূমিতে রোমান্সধর্মী উপন্যাস *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) রচনা করেন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাস সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও *অরণ্য-বহ্নি* প্রায় অগোচরেই রয়ে গেছে বলা যায়। ফলে এ উপন্যাস নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা দৃষ্টান্ত বিরল।

ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে একশ বছর খুব বেশি সময় না হলেও, সাহিত্যের পথ-পরিক্রমায় একটি শতাব্দী যে বেশ দীর্ঘ সময় তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাস নামক শিল্প-প্রকরণটি রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-উত্তর কালের আধুনিক সভ্যতার আলোকস্নাত সমাজ ও জীবনমুখী শিল্পীদের মেধা, মনন ও শ্রমসান্নিধ্যে লাভ করেছে বিশ্বমাত্রিকতা।

হিতবাদী মিল-বেন্থামের সামাজিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার আদর্শিক স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে। বঙ্কিমন্দ্রের সমাজ ও ন্যায় ভাবনা থেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর ত্রিশ-উত্তর ঔপন্যাসিকরা মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং সমাজ বাস্তবতার অন্তর্সত্যকে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের নব-নব আবিষ্কার, মার্কসের সামাজিক-অর্থনৈতিক বীক্ষা, ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, মানবতার পতন—এই বহুবিধ ঘূর্ণাবর্ত এবং যুগযন্ত্রণার মধ্যে উপন্যাস-শিল্প রচনায় আত্মমগ্ন এবং জীবনোৎসর্গ করেছেন এ-কালের যে-কজন শিল্পী—তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের দু'শ বৎসরের ইতিহাস শোষণ, বর্ণবাদ, রক্তপাত এবং নির্মমতার আলেখ্য হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে পাশ্চাত্যের মুক্তবুদ্ধির রেনেসাঁসের হাওয়া লেগেছিল এবং তা নতুন কালের উপযোগী হয়ে চলতে শিখেছিল ব্রিটিশদেরই কাছ থেকে। এবং অবশ্যই সভ্যতা

বিকাশের দ্বান্দ্বিক সূত্রানুসারে। একই সঙ্গে কৃষিনির্ভর ভারতের সমাজ-জীবনে জীবন সংগ্রাম এবং বাস্তবতার যে ঐতিহ্য ও ধারাক্রম চলে আসছিল, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে তারও ছায়াপাত ঘটেছে। এ কালের ঔপন্যাসিকরা যেমন পাশ্চাত্যের প্রকরণ-নিরীক্ষা, শিল্প ও জীবনভাবনা এবং নানা অর্থনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি একই সঙ্গে নিজেদের মেধা ও মননকে ঋদ্ধ ক'রে রচনা করেছেন দেশীয় পটভূমির অস্তিত্ববাদী বা চেতনাধর্মী উপন্যাস।

শিল্পী যেহেতু সামাজিক মানুষ, কাজেই তার শিল্পিসত্তার সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি জীবন ও যুগের সম্পর্ক নিবিড়। লেখকের সমকালে ঘটে যাওয়া কোন বিশেষ ঘটনা বা ইতিহাসের পাতা থেকে হৃদয়স্পর্শী কোন আখ্যান নিয়ে যখন কোন লেখক উপন্যাস রচনা করেন—সে-ক্ষেত্রে একজন সমালোচক হিসেবে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে লেখাটি শিল্প হয়ে উঠেছে কী-না এবং সেখানে ইতিহাসের সত্য রক্ষিত হয়েছে কী-না তা প্রধান বিবেচ্য নয়। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর যখন *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন ১৮৫৪-৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ তখন স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের পাতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ঔপন্যাসিক নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এই ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, *অরণ্য-বহ্নি*-র শুরুতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। District Gazettier, Hand Book, Hunter-এর বই, *সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতির সাহায্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল ঘটনা সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যদিও 'সাঁওতাল হাঙ্গামার বিবরণ বাল্য বয়সে' তিনি শুনেছিলেন পিসিমার কাছে, তাছাড়া তারাশঙ্কর বীরভূম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল, বাউড়ি, বাগ্‌দি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন-যাপন, আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস এবং সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। তা সত্ত্বেও দুই সাঁওতাল বীর কানু ও সিধুর ট্রাজিক পরিণতি এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুরতা ইতিহাস তাঁকে স্পর্শ করেছিল তীব্র ভাবে। আর তাই 'অরণ্যচারী আদিম অধিবাসীদের সরল জীবনযাত্রা কিভাবে বিদেশী শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিভূরূপে বাঙালী জোতদার ও পশ্চিমা ব্যবসায়ীদল এবং মহেশ দারোগার মতো মানুষ নষ্ট ও যূথ-ভ্রষ্ট এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল তারই অপরূপ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে *অরণ্য-বহ্নি*-তে (*তারাশঙ্কর রচনাবলী* অষ্টাদশখণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৪৫৫)। *অরণ্য-বহ্নি*-র আগে *কালিন্দী* উপন্যাসের মূল কাহিনীবৃত্তে সাঁওতালদের প্রতি লেখকের সহানুভূতির প্রতিচিত্র আভাসিত হয়েছিল। 'সাঁওতালদের নতুন বসতিস্থল কালিন্দীর চরকে কেন্দ্র করে দুই সামন্ত-জমিদারের বিরোধ এবং এই বিরোধিতার সুযোগে উঠতি ধনিক কারখানা-মালিকের সুকৌশলে চরের স্বত্ব অধিগ্রহণ—এই দুই বৈরী স্রোতোধারার প্লাবনে ঋণভার-আনত বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের উন্মূলিত হয়ে ভেসে যাওয়ার কাহিনীই *কালিন্দী*-র মর্মকথা'[১]। অন্যদিকে *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে একত্রে

গ্রন্থিত করে মহাকাব্যিক পটভূমিতে একটি আরণ্য-আদিবাসী দ্রোহস্বপ্নকে প্রকটিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি *কালিন্দী*-র সফলতা ও শিল্প সম্ভাবনাকে এ উপন্যাসে ধরে রাখতে পারেন নি। সেইসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এ দুটি উপন্যাসের রচনাকালের মধ্যে ব্যাবধান সিকি শতাব্দীর। *কালিন্দী* রচিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ সময়ে আর *অরণ্য–বহ্নি* রচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে যখন ব্যক্তি তারাশঙ্কর রাজ্যসভার সদস্য পদে মনোনয়ন লাভ করেছেন (১৯৬০), ভারত, সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী (১৯৬২) উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন, সর্বোপরি তাঁর শিল্পিমানসের সামনে আর কোন স্বপ্ন অপূর্ণ নেই। আর তাই *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের ব্যর্থতার মূলে এ-সমস্ত, সামাজিক-রাজনৈতিক 'ফেনোমেনা' সক্রিয় ছিল বলে আমাদের ধারণা। না হলে *কালিন্দী*-র কমিটমেন্ট, সমাজচেতনা ও শিল্পবোধ *অরণ্য-বহ্নিতে* অনুপস্থিত থাকবে কেন ? তাছাড়া, বিষয় হিসেবে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনলেও *অরণ্য-বহ্নি* নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক বড় মাপের শিল্পসৃষ্টির উপকরণে সমৃদ্ধ। তারাশঙ্কর তা জানতেন, কিন্তু ততদিনে তিনি তাঁর সৃষ্টিসত্তার স্বর্ণযুগ পেরিয়ে ক্লান্তি-অবসাদ আর স্বপ্নপূরণের সীমানায় পৌছে গেছেন। আর তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমি ও ঘটনাক্রম উপস্থাপনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেও কাহিনীর উৎস ও পরিণতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন।

শিল্পী তারাশঙ্কর ইতিহাস থেকে উপকরণ নিয়ে উপন্যাস রচনায় অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঢেউ যে স্পর্শ করেছিল—তাও তিনি জানতেন। কেননা, ১৮৫৪-৫৫ -এর সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম শাসকের ভিত কাঁপানো অভিঘাত হচ্ছে—সিপাহি-বিদ্রোহ ; যা সংগঠিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। তারাশঙ্কর তাঁর এ উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন—'আমার আরও একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অরণ্য-বহ্নি'। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। এর ভৌগোলিক পটভূমি সংকীর্ণ। এর পতন অভ্যুদয়ের সনাতন লীলায় একটি অংশ সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর মধ্যে ভারতবর্ষের অতীতকালের সেই আর্য অনার্য সংঘাতের ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে এবং তারই মধ্যে ভাবীকালের একটি প্রচণ্ডতর সংঘাতের সম্ভাবনাকে যেন অনুমান করা যায়। যার ভিত্তি আছে ও নাই-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত' ২।

তারাশঙ্কর সমাজসভ্যতার এই চিরকালীন দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানতেন, আর তাই *চৈতালী-ঘূর্ণি* (১৯২৯-৩০) থেকে একটি *কালো মেয়ের কথা* (১৯৭১) পর্যন্ত শিল্পসাধনার পথে কমিটেড ছিলেন মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং সভ্যতার বিকাশের ধারাক্রম বাস্তবনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে। যদিও কখনো কখনো শিল্পী তারাশঙ্করের মানসজগতে ক্ষয়িষ্ণু সামান্তসমাজের পতনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু *অরণ্য-বহ্নি*—ঔপন্যাসিক

তারাশঙ্করের একটি ভিন্নমাত্রিক রচনা একথা মনে রেখেই, সাবধানী ও সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হয়।

তারাশঙ্করের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছিল, নিরীহ অরণ্যচারী সহজ-সরল সাঁওতালরা হঠাৎ কেন এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল? প্রতিহিংসার আগুনে সব ভস্ম করে দিয়ে কলকাতার অভিমুখে পদযাত্রা করেছিল কেন? শুধু যে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার এবং স্থানীয় বাঙালি মহাজনদের শোষণের ফলে এ বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে নি তা নিশ্চিত। কেননা তাহলে অনেক আগেই এমন অসংখ্য বিদ্রোহ হতে পারতো। শিল্পী তারাশঙ্কর এ-উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে যে তথ্য ও ঘটনা পেয়েছেন তাকে যেমন উপন্যাসের মধ্যে সচল রেখেছেন, পাশাপাশি তার নিজের অনুসন্ধান ও অনুমানের সূত্র ধরে একাধিক সাঁওতাল পরিবারের কাহিনীকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বৃত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিশুমাঝির পরিবারের নারীদের মানবিক ও শারীরিক লাঞ্ছনার প্রতিবিধানে স্থানীয় প্রশাসন ব্যর্থ হলে, নিজের হাতেই আইন তুলে নিয়ে সিধু ও কানু সাহসী দুই যুবক-ভাই সমগ্র অঞ্চলের সাঁওতালদের নেতা হয়ে যে বিদ্রোহ এবং প্রতিশোধের খেলায় যোগ দেয়—শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। পরাজয়ের নির্মমতাকে বরণ করে নিতে হয় তাদেরকে। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের বিষয়কে সাহিত্যের যুক্তি ও শিল্পবোধ দিয়ে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন, আর তাই সেদিক থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের উৎস এবং ঘটনাক্রম বিন্যাসে তিনি সার্থক হলেও *অরণ্য-বহ্নি* আধুনিক উপন্যাসের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে নি। কেননা এই উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র কানু এবং সিধুর ব্যক্তিগত ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনা সমগ্র সাঁওতাল জাতির অন্তরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। অথচ ইতিহাসের আখ্যানের মধ্যেই সে সুযোগ ছিল যথেষ্ট।

তাছাড়া অলৌকিকতা, দেবমহিমা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো ঘুরে ফিরে বার বার আসায় সাঁওতালদের মানবিক মহিমাও উপন্যাসে কিছুটা খাটো হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। দেবতার আদেশে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর সাঁওতালদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ-সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ফলে সমগ্র আখ্যানবৃত্ত যে মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তা থেকে পাঠক হিসেবে তারাশঙ্করের মতো শিল্পীর কাছে যে পরিণতি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম—তা পূরণ হয় নি। কানুর মৃত্যু, সিধুর ফাঁসি, আগুনে পুড়ে রুকনীর আত্মত্যাগ বিদ্রোহের পটভূমিকার অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটি জাতি যে স্বপ্ন-সম্ভাবনায় বিদ্রোহ করেছিল , স্বতঃস্ফূর্ত আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, তা শুধু কানু-সিধুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোন সম্ভাবনা বা প্রত্যাশার স্ফুলিঙ্গ না-জ্বালিয়েই দমকা বাতাসে প্রদীপের মতো হঠাৎ নিভে যাবে, তা কতটা যৌক্তিক ? এইখানেই ঔপন্যাসিকের কাছে পাঠকের জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

অরণ্য-বহ্নি : ঐতিহাসিক পটভূমি

আমরা যদি আলোচ্য উপন্যাসের বিষয় ও আখ্যানবৃত্তের আরো গভীরে এবং বিশ্লেষণে যেতে চাই, তাহলে সঙ্গত কারণেই ইতিহাসের পাতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

Bengal District Gazettier of Santal Parganas–এ বিদ্রোহের নেপথ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—

> সাঁওতাল-বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীন সাঁওতালদের স্বাধীনতা স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল : তাদের নিজ দলপতির অধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই। (পৃ. ৪৮)

সাঁওতাল ইতিহাসবিদ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন—

> অরণ্যরাজ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করবার জন্য তারা জমি করেছে, গ্রাম বসিয়েছে, শান্তির দেশ গড়ে তুলেছে। সেই শান্তি আজ নষ্ট হতে চলেছে। তাদের শ্রমের অংশ লুঠ করে নেবার জন্য কোম্পানীর অনুগত জমিদার ও মহাজনী ব্যবসাদারের দল হাত বাড়িয়েছে—এ যে অসহ্য। তারা প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু বৃটিশ শাসক তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। দিনে দিনে অত্যাচার বেড়ে যেতে লাগলো। আর সহ্য করতে পারে না নিরীহ অশিক্ষিত সাঁওতালরা। তাদের সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করলো তখন তারা বহুদিনের জমানো বিক্ষোভে ফেটে পড়লো বিদ্রোহের তূর্য নিনাদে ১৮৫৫ সালে।[৩]

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের আগেও ১৭৭২ সালে একবার ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বনবাসী সাঁওতালদের কাছে পরাজিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন ব্রুক ও তার দল। এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় কোম্পানি রাজমহল এলাকায় দেওয়ানি নেয়ার পর। এ অঞ্চলের আদিবাসীদেরকে নানা অত্যাচার–নিপীড়ন করে দমন করতে চেষ্টা করে কোম্পানির লোকজন। ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করে প্রায় ৪০ ভাগ।[৪] এরপর ক্লিভল্যান্ড রাজমহলের সুপারেনটেনডেন্ট নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং তিনি দমনের পথ পরিত্যাগ করে কৌশলে বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সাঁওতালদের বোকা বানিয়ে বশীভূত করেন। তাদেরকে কোম্পানির সিপাহী পদে নিয়োগ দেন। এভাবেই ক্লিভল্যান্ড বিনা রক্তপাতে পাহাড়িয়াদের জন্য 'দামিন-ই-কোহ্' নাম দিয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয় নি। সাঁওতালরা স্বাধীন জাতি। তারা কারো বশ্যতা স্বীকার করে নি কখনো, এমনকি মোঘল-পাঠান আমলেও নয়। তাই তারা কোম্পানিকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে, ফলে খাজনা আদায়ের জন্য ইংরেজ শাসকের অত্যাচার শুরু হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা সাঁওতালদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে অত্যাচার চালায় অমানবিকভাবে। এ অবস্থায় অসীম সাহসী এক বীরযোদ্ধা তিলকা মাঝি (আসল নাম তিলকা মুর্মু) স্বজাতির ওপর বিদেশী শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে সাঁওতালদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। এই মুক্তিবাহিনী গেরিলাযুদ্ধের কায়দায় একের পর এক ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করে। ১৭৮৪ সালে এই মুক্তি বাহিনীর হাতে ক্লিভল্যান্ড সাহেবের

মৃত্যু হলে শাসকগোষ্ঠী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন বিদ্রোহ দমনে এবং তিলকা মাঝিকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। এই সময় সাঁওতালরা ভাগলপুর ছেড়ে নতুন এলাকায় গমন করে। এরপরও বেশ কিছুদিন সাঁওতালরা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করেছে কিন্তু সুসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর কাছে তারা বারবারই পরাজিত হয়েছে। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও দেশ ও স্বজাতির মুক্তি সাধনের জন্য ভাগলপুর তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

কাজেই ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ-ই সাঁওতালদের প্রথম স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রাম নয়। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর *অরণ্য-বহ্নি*-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এই সাঁওতালরা যে ১৭৮৪ সালে বিদ্রোহ করে পরাজিত হয়ে দামিন-ই-কোহ্-এর ভাগলপুর ছেড়ে বর্তমানের সাঁওতাল পরগনার জঙ্গলে নতুন আবাস গেড়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য লেখকের লক্ষ্য যে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই তিনি সাজাতে চেয়েছেন তাও স্পষ্ট। ঐতিহাসিকভাবে এই ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের উৎস হিসেবে আরো দুটি প্রসঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ঐতিহাসিকগণ। একটি হচ্ছে শাসক কর্তৃক জোর করে নীল চাষ, অন্যটি পারিবারিক ঋণের দাসত্ব। মহাজনের কাছ থেকে পিতা যে ঋণ নিয়েছিল তার বোঝা সন্তানকে বহন করতে হতো দাস হিসেবে।—

> ঋণশোধ হোক মহাজন তা চাইতেন না, দিতে চাইলে নিতেন না। এবং তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন যাতে সাঁওতালটি মুহূর্তের বিশ্রাম না পায়, যাতে উপরি উপার্জন করে তাঁর ঋণ শোধ না-করে ফেলে। দরিদ্র সাঁওতালটি তার ছেলের জন্য একটি মাত্র উত্তরাধিকার রেখে যেত ; সেটি তার ঋণ যা প্রথমে ছিল সামান্য কয়েক টাকা কিন্তু কালক্রমে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে বেড়ে বিরাট অঙ্কে দাঁড়িয়েছে।[৫]

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে উত্তরাধিকার সূত্রে দাসত্ব লাভের প্রসঙ্গ এলেও নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর *অরণ্য–বহ্নি*-তে সাঁওতালদের বঞ্চিত ও শোষিত হবার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা ইতিহাসের মূল ঘটনাস্রোত থেকে যে বিচ্ছিন্ন তা বলা যাবে না। বরং তিনি ইতিহাস অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়েছেন। যে কারণে উপন্যাসের মধ্যে প্রায়ই ঐতিহাসিক হান্টারের উদ্ধৃতি, কখনো বা *সংবাদ প্রভাকরের* রিপোর্ট তুলে দিয়েছেন। আমরা *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের বিষয় বিবেচনা প্রসঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেরাতে পারি—

৩০ জুন ১৮৫৫—ভগনাডিহি গ্রামে বিশাল জনসমাবেশে সিদু-কানুর ভাষণ এবং স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ গ্রহণ। সভায় ১০ হাজার সাঁওতাল উপস্থিত। কলকাতা অভিমুখে তাদের গণপদযাত্রা।

৭ জুলাই ১৮৫৫—সাঁওতালদের হাতে মহাজন কেনারাম ভগত ও অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল খুন। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত।

১১ জুলাই ১৮৫৫—বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী সহ মেজর বারোজের আবির্ভাব।

১২ জুলাই ১৮৫৫—সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণ।

১৫ জুলাই ১৮৫৫—পাকুড়ের কাছে তরাই নদীতীরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেভেন্থ রেজিমেন্টের সম্মুখযুদ্ধ এবং সাঁওতালদের পরাজয়।

১৬ জুলাই ১৮৫৫—পিয়ালাপুরের যুদ্ধে সাঁওতালদের কাছে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয়।

২০ জুলাই ১৮৫৫—বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে তালডাঙ্গা থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে ভাগলপুর–রাজমহল পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আধিপত্য বিস্তার।

২৩ জুলাই ১৮৫৫—বীরভূমের ব্যবসা কেন্দ্র গণপুর বাজার ধ্বংস।

২৪ জুলাই ১৮৫৫—বারহারোয়া–বারহাইত রাস্তায় রঘুনাথপুরে ম্যাজিস্ট্রেট টুগুড পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে চাঁদ ও কানুর পরাজয়।

২৯ জুলাই ১৮৫৫—ক্যাপ্টেন শেরউইল বারোটি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করেন, লেফ্‌টেন্যান্ট্ গর্ডন মুনহান ও মুন কাতরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেন।

৩১ জুলাই ১৮৫৫—মেজর লয়েডের ওপর বিদ্রোহ দমনের ভার অর্পণ।

১৭ আগস্ট ১৮৫৫—ইংরেজ সরকার আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, সাঁওতালরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫—সাঁওতালদের হাতে ওপরবাঁধ থানা ও গ্রাম লুট।
অক্টোবরের ২য় সপ্তাহে সিদু-কানু কর্তৃক অম্বাহানা মৌজা লুট।

১০ নভেম্বর ১৮৫৫—সরকার কর্তৃক সামরিক আইন [?] জারি।

৩ জানুয়ারি ১৮৫৬—সামরিক আইন [?] প্রত্যাহার।

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৬—সুজারামপুরে গ্রান্ট সাহেবের কুঠি লুট।

২৭ জানুয়ারি ১৮৫৬– ভাগলপুর হিলরেঞ্জার্স বাহিনীর কাছে মুখোমুখি যুদ্ধে সাঁওতালদের পরাজয়। চাঁদ ও ভৈরব নিহত, বিদ্রোহীরা হতাশ।
ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ ১৮৫৬—ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে সিধুর মৃত্যু, পরের সপ্তাহে কানু গ্রেফতার এবং ফাঁসিতে মৃত্যু।[৬]

পক্ষান্তরে *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে আমরা লক্ষ করি ঔপন্যাসিক শুরু করেছেন ১৮৫৪ সালের সাঁওতাল পরগনার (তখনও সাঁওতাল পরগণা নাম হয় নি) ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বর্ণনা দিয়ে—

> তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন প্রদেশ এক সঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিন পাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগণা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।[৭]

কাঁকর আর লালমাটি ভরা এ অঞ্চলে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালবন। সাঁওতাল পরগনার এই অরণ্য অঞ্চলে এক সাঁওতাল মাঝি পরিবারে জন্ম হয়েছিল সিধু আর কানুর। এখনো রাতের অন্ধকারে এই বনভূমিতে সিধু-কানুর অতৃপ্তআত্মা ঘুরে বেড়ায় জল সাধারণের ধারণা।

সেই কোম্পানির আমলে পাহাড় কেটে চাষ-আবাদ, পশুপালন এবং শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো সাঁওতালরা। সিধু-কানুর বাড়ি বাগনাডিহি। তাদের বাবা চুনার মাঝি ওরফে 'মুর্মুঠাকুর' সাঁওতাল সমাজের সম্মানিত লোক। দশ-বিশ গ্রামের সাঁওতালরা তার কাছে আসে পরামর্শের জন্য। তার অন্য দুই ছেলে চাঁদ ও ভৈরব। 'চাঁদ ভৈরব প্রৌঢ় হয়েছে। পাকাচুল দু-চার গাছা দেখা যায় কানের পাশে কপালের ঠিক ওপরে। সিধু-কানু বয়সে জোয়ান। কানুর তৃতীয় ভাই সিধুর চেয়ে বড়। সিধুই ছোট তবে বড় ছোট বোঝাই যায় না—তারা যমজ সন্তানের মত।...সিধু-কানুর মধ্যে সিধু মাথায় লম্বা—বুকের পাটাও তার চওড়া এবং দুজনেই কষ্টিপাথরের মত কালো হলেও সিধুই যেন উজ্জ্বলতর জোয়ান এবং উজ্জ্বলতর কালো' (ঐ, পৃ. ৩৪৬) গোটা গ্রামে সিধু একটু অন্যরকম গম্ভীর সে। তার স্ত্রী ফুলসহ গোটা পরিবারটাই তাকে ভয় করে।

কানু-সিধু প্রয়োজনে কেনা-বেচা করতে প্রায়ই বারহাটের বাজারে যায়। সিধু তার গ্রামে যুবকদের সর্দারের মতো। তার যুবক সঙ্গীদের নিয়ে সে বারহাটর বাজারে যায়। ঘি, ময়ূরের পালক, বাঘের নখ ইত্যাদি বিক্রি করে তারা নুন ক্রয় করে। বাজারের বড় কারবারী আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকতের জ্ঞাতি ভাই মহেন্দর ভকত। এই ভকতই অশিক্ষিত সাঁওতালদের ঠকিয়ে ওজনে কম দিয়ে বড় লোক হয়েছে। সিধু ভকতের কাছে ঘি বিক্রি করতে গিয়ে টের পেয়েছিল ঠকাচ্ছে কিন্তু কী ভাবে তা ধরতে পারে নি। প্রতিবাদ করে ভকতের কাছে ঘি ফেরৎ চাইলে ভকত বলেছিল—'মাপ করে ঘি নিয়েছি, ফিরে দিব ই কোন্ কথা ? আ ? কোন্ আইনে তু ফিরে পাবি ? বেশী চালাকি করলে থানাতে মহেশ দারোগার কাছে বেধে পাঠিয়ে দেব' (ঐ, পৃ. ৩৫৪)। এ ভাবেই অর্থে কেনা গোলাম থানার মহেশ দারোগার ভয় দেখিয়ে কেনারাম ভকত মহেন্দ্র ভকত নিরীহ সাঁওতালদের শোষণ করে আসছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ভকতদের বাড়িতে পশ্চিমা দারোয়ান আছে দশ বারোজন, আছে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সাঁওতাল দাস, যাদেরকে সারাক্ষণ খাটানো হয় ক্ষেতে–দোকানে–বাড়িতে। মহেন্দর ভকতের একজন দাস বা চাকর নিমু হাঁসদা। 'সে ভকত বাড়ির চাকর আজ সাত বছর। বাপ মরার সময় টাকা ধার করেছিল ভকতের কাছে ... সেই টাকা শোধ করবার জন্য আজও খাটছে। সে খাটে তার স্ত্রী খাটে। খাবার ধান পায়। বাস্। আর কিছু না' (ঐ, পৃ. ৩৫৪)।

সিধু মৌখিক প্রতিবাদ করে কোন ফল পায় না। সে আর কী বা করতে পারে ; সাদা চামড়ার সাহেব আসে বন্দুক সিপাহী নিয়ে, দারোগা আসে লালপাগড়ি বাঁধা সিপাই নিয়ে, এরা সব ভকতদের পক্ষে। সিধুর ভীষণ রাগ হয় তার স্বজাতি চাকর

সাঁওতালদের কথা ভেবে—ভকতদের ফাঁকির কথা ভেবে। সিধু কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা 'একটা মানুষের দাম দশ টাকা। আজীবন খেটে তা শোধ যায় না' (ঐ, পৃ. ৩৫৬)।

সিধুর বোনের বিয়ে হয়েছে লিটাপাড়ার লালমাঝির সঙ্গে। লাল মাঝির দুই বোন টুকনী আর রুকনী। বোনের বিয়ের পর আত্মীয় বাড়িতে এই দুই বোনের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল সিধু আর কানুর। বিয়ে করতে চাইলে বাধা দিলেন বাবা মুর্মুমাঝি। তিনি আগেই শিমুলতলীর ধনরায় হেমব্রমের দুই কন্যা টুশকি আর ফুলের সঙ্গে যথাক্রমে কানু ও সিধুর বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত বাবার কথায় বিয়ে করলেও তারা দু'ভাই মন দিয়ে ছিল টুকনী-রুকনীকে। এদিকে কোম্পানির লোকজন এ এলাকায় রাস্তা-রেললাইন বসাচ্ছে। সেখানে সাঁওতাল নারী-পুরুষরা কাজ করে। টুকনী ও রুকনী সেই সড়কে কাজ করে। লোকজন বলে ওরা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সিধু ভোলে নি রুকনীকে।

বারো শলি ধান ধার নিয়েছিল কেনারামের কাছ থেকে ভীম মাঝি। সুদে-আসলে পরের বছর তা একশ শলি হয়—ভীম তা শোধ করে কিন্তু দু মাস পরে ভকত এসে আবার ধান চায়। বলে, এখনো বাকি আছে অর্ধেক। এভাবে খাতার প্যাঁচে আটকা পড়ে ভীম। ভকত ধান অথবা জমি দাবি করে, ভীম দিতে নারাজ। এই নিয়ে ভীম আর ভকতের বিবাদ। শেষে সিপাই ধরে নিয়ে গেল ভীম মাঝিকে।

এ ভাবেই দিকুদের [হিন্দু] আর সেপাই-দারোগার অত্যাচারে যখন সাঁওতালদের বাঁচা মরার লড়াই, তখন সিধু দেবতা বুঙ্গার ইশারার কথা সবাইকে জানায়। মরাংবোঙ্গা তাদের বাঁচাবে। এবার বোঙ্গা মাটিতে নামবে।

সিধুর বোন মানকী খ্রিস্টান হয়েছে। সাহেবদের বাড়িতে কাজ করে। টুকনী-রুকনীর বদনাম রটেছে। এদিকে পোটেন্ট সাহেব লিটাপাড়ায় সাঁওতালদের অভিযোগ শুনে তার বিহিত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'পান্টিন সাহেব ভাললোক কিন্তু মহেশ দারোগার মতো দারোগা কেনারাম মহেন্দর ভকতের মত দিকুরা তার এক্তিয়ার মানে না' (ঐ, পৃ. ৩৮৪)। ভীম মাঝিকে যে ভাগলপুর জেলে চালান দেয়া হয়েছে সে-খবরও তিনি জানেন। 'তিনি হিন্দুদের অত্যাচারের কথা জানেন, ক্রীশ্চান করায় এদের মনে যে দুঃখ তাও বোঝেন, আবার রেলের রাস্তাবন্দিতে কন্ট্রাকটরের ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের এদের নারী নিয়ে বিলাসের কথাও জানেন' (ঐ, পৃ. ৩৮৫)। পোটেন্ট কমিশনার সাদারল্যান্ডকে সাঁওতালদের অভাব-অভিযোগের কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি অন্য মানুষ ; মানবিক বোধের বাইরে, আর তাই বলেন—'ওই সব ব্লাক নিগারদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওরা মরবার জন্যই জন্মেছে এবং অন্যের জন্য খেটে মরবে' (ঐ, পৃ. ৩৮৫)।

এরপর সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে গুঞ্জন শুরু হয়, ক্রমে জটলা হয়, শলা-পরামর্শ চলে এবং জহর-সর্ণার পাশে এসে সর্দাররা জড়ো হয়। লিটাপাড়ার মাঝিরা রামচন্দ্রপুরের ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে বলে পোটেন্ট সাহেবের কাছে দরখাস্ত লিখে দিতে। ওরা

সাঁওতালি ভাষায় বলেছিল ভট্টাচার্য লিখে দিলেন বাংলায়। সাহেব এলেন। তার কাছে দরখাস্ত দিল ফাগুলাল আর ভীমের ছেলে অর্জুন। কয়েক হাজার সাঁওতালের সামনে সাহেব ; শুনতে হবে অন্যায়, অবিচার আর শোষণের হাজার হাজার অভিযোগ। বুক চাপড়ে চিৎকার করলো, বিশু—'আমার ধরম ফিরে দে। আমার বিটি ফিরে দে। ...টুকনী রুকনী' (ঐ, পৃ. ৩৯২)। এরপর প্রবল কোলাহল। পোটেন্ট সাহেব বাংলোতে চললেন বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে রিপোর্ট লিখতে। বিশু জানালো সবাইকে টুকনী-রুকনী আর সিধুর বোন মানকীকে রাস্তাবন্দির সাহেবরা বাংলোয় ধরে নিয়ে গেছে। খবর শুনে চিৎকার করে ওঠে সিধু, জ্ঞান হারায় চুনার মাঝি।

এরপর সাহেবদের ওপর শোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞায় মানকী, রুকনী-টুকনীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সিধু, কানু আর বিশু যাত্রা করে তিন পাহাড়ে সাহেবদের বাংলোয়। পথে রামচন্দ্রপুরের ভট্টাচার্যের ওখানে দেবী চণ্ডীর পূজা দেয় কানু-সিধু। হিরণপুর হাট পর্যন্ত দুদিকে সাঁওতালদের মধ্যে জটলা হয়। আর শালপাতার সংকেত পৌঁছে যায়। দিকু আর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক-টাঙ্গী নিয়ে তৈরি হয় তারা। বোঙ্গা ইশারা দিয়েছেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

সাহেবকে খুন করে পালিয়ে আসে রুকনী। লাল মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় নেয় পাহাড়ের গুহায়। সেখানে দেখা হয় সিধু ও কানুর সঙ্গে। গুহায় থাকে ভৈরবী—যে এক ঝড়ের রাতে ডেভিল ডেউই কর্তৃক দেবীর সামনে ধর্ষিত হয়েছিল। ভৈরবীর অভিযোগে সিধুর প্রতিশোধের আগুন আরো জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। পরদিন রাতের অন্ধকারে সাঁওতালরা আক্রমণ করে সাহেবদের বাংলোয়। হত্যা করে তিন জন সাহেবকে। এভাবেই বিস্ফোরণ ঘটে—'প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রখর উত্তপ্ত, শোষণে পীড়নে এই সরল মানুষগুলির হৃদয়—যা কাজলকালো জলে ভরা সরোবরের মতো—তা নিঃশেষে শুকিয়ে কঠিন শুষ্ক পঙ্কস্তরে পরিণত হয়েছিল—সেই পঙ্কস্তর ফেটে গিয়ে একটা আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় হল' (ঐ, পৃ. ৪১১)। সাঁওতালদের মধ্যে স্বদেশের বোধ জেগে ওঠে, তারা ধ্বনিত করে—'ই দেশটো আমাদের। আমাদের দেশ' (ঐ, পৃ. ৪১৬)। দিকুদের কাছ থেকে, সাহেবদের কাছ থেকে দেশ উদ্ধারের বাসনায় শালপাতার সংকেত পাঠানো হল, মারং বোঙ্গার আদেশের কথা প্রচার করা হল। রুকনী হল পুরুষবেশী সিধুর সিপাই। বাড়তে বাড়তে চার পাঁচ শ সাঁওতাল জড়ো হল সিধু-কানুর সঙ্গে। তারা নারাণপুর নীলকুঠি ও দিকু জমিদারদের বাড়ি ঘর আক্রমণ করে। একে একে খুন হয় কেনারাম ভকত, মহেশ দারোগা ও তার সঙ্গীরা।

ভাগলপুর রাজমহল থেকে বীরভূম নদীর উত্তর তীর, মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর রাজনগর দেওঘর-এর ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে অংশ নেয়। ইংরেজ সৈন্যদের বন্দুকের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য সাঁওতাল তবু পিছু পা হয় নি। পিয়ালপুরের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা সিধু-কানুর বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এরপর বর্ষা কালে বিপদ বুঝে কোম্পানির সেনারা যুদ্ধ বন্ধ রাখে দু মাস। এরপর

সংগ্রামপুরের যুদ্ধে পরাজয় হল দারুণভাবে সাঁওতালদের। অন্ধবিশ্বাস আর কৌশলের অভাবে এই পরাজয়। ওদের বিশ্বাস ছিল ওরা বর পেয়েছে তাই দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো গুলির সামনে। কপালে গুলি বিদ্ধ হয়ে কানু মরলো। আহত সিধু ধরা পড়লো এবং তার ফাঁসি হল। আর যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মরে মুক্তি পেল রুকনী। এখানেই তারাশঙ্করের *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের আখ্যান শেষ।

উপন্যাসের শুরুতে লেখক যেভাবে একটি মহাকাব্যিক কাহিনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শেষে এসে তা আর মহাকাব্যিক হয়ে উঠতে পারে নি। সিধু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহের যে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল তা সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ করে একটি জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্যের সূত্রে গাঁথতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কারণে সাঁওতালদের বিদ্রোহের উৎস যত শক্তিশালী ও যৌক্তিক হোক না-কেন, সে বিদ্রোহের ফলাফল যা-ই হোক, অলৌকিকতায় নির্ভরতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং আধুনিক যুদ্ধ-কৌশলের কাছে একটি জাতির স্বপ্নের পরাজয় ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে মনে হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও রাজনীতিবিদ তারাশঙ্কর চান নি ভারতবর্ষের কোন গোষ্ঠী বা গোত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ সফল হোক। আর সম্ভবত সে কারণেই অসীম সম্ভাবনা নিয়েও *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসটি কানু-সিধুর মতোই ট্রাজিক পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে।

সবশেষে আরো একটি কথা উত্থাপন করা যেতে পারে—আর তা হচ্ছে ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে বিচার করলে লক্ষণীয় যে এ-উপন্যাসে ইতিহাসের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অধ্যায়—ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক সাঁওতাল-দমনের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীর উল্লেখ না থাকায় উপন্যাসটি অনেকটা 'এক পেশে' হয়ে পড়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ২৬৯

২ 'ইতিহাস ও সাহিত্য' ; *তারাশঙ্কর রচনাবলী*. একবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৬১

৩ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬

৪ *আরলি রেভিনিউ হিস্টরি অব বেঙ্গল এন্ড দি ফিফ্থ রিপোর্ট* ; এফ ডি আস কলি, পৃ. ২৮

৫ তারাপদ রায় ; *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা*, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯ , (ডবলু ডবলু হান্টারের গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেছেন লেখক)

৬ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; ঐ, পৃ. ১৪৫ ও ১৪৬

৭ *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ. ৩২৩

‘পদ্মবউ’ ও ‘কুষ্ঠ-রোগীর বৌ’ : সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য

এস এম মনির হোসেন

বাংলা সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই কুষ্ঠরোগীকে বিষয় করে গল্প রচনা করেছেন। দুজনের গল্পেই প্রথাগত ধর্মবোধ ও সংস্কারচেতনা অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজ-সংস্কার-ধর্ম সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব-আলোড়ন তারাশঙ্করকে আন্দোলিত করলেও পরিণামে সুস্থ ও আশাবাদী জীবনাদর্শে তিনি সুস্থির থেকেছেন। তারাশঙ্কর জগৎ-জীবন ভাবনায় নির্দ্বন্দ্ব ভাববাদী ; প্রথাগত আস্তিক্য ধর্মতত্ত্বেই খুঁজেছেন জীবনের প্রশান্তি। ‘জীবন বিশ্বাসের নির্বাপণ নেই তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে কোথাও, জীবন রহস্যের অশ্রান্ত সত্য-সন্ধানী তিনি।’[১] উত্তরকালে মার্কসবাদী আদর্শে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থির হলেও প্রথম জীবনে যুগপৎ নিয়তিবাদ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব মানিকের চেতনালোক স্থিতি সন্ধান করেছিল। জীবনাদর্শে আশাবাদী মানিক প্রথম পর্বে গহিন মনোজগতের অভিযাত্রী ; প্রথাগত জীবনবোধ উত্তীর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী। জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে একই বিষয় নিয়ে কয়েক বছরের কালব্যবধানে লেখা দুজন লেখকের দুই গল্পে[২] জীবনবাস্তবতার পৃথক রূপায়ণ দেখতে পাই। ‘পদ্মবউ’ গল্পের চন্দ্রমশায়-পদ্মবউ এবং ‘কুষ্ঠ-রোগীর বৌ’ গল্পের যতীন-মহাশ্বেতার জীবনাকাঙ্ক্ষা, জীবনাচরণ, মনোযন্ত্রণার উৎস এবং পরিণতি জীবনের ভিন্নপ্রান্তিক নিগূঢ় বাস্তবতাকে শিল্পিত করে তুলেছে।

পদ্মবউ প্রথাগত ধর্ম, শাস্ত্রকথা, সংস্কারচেতনা এবং সনাতনী বাঙালি-বধূর মূল্যবোধে সুস্থির থাকতে আগ্রহী। কিন্তু সমাজ-সংস্কার-ধর্মের সঙ্গে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন এবং বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা পদ্মবউয়ের মধ্যে এক সময় প্রকট হয়ে উঠেছে। যেদিন চন্দ্রমশায়ের কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রথম ধরা পড়ে সেদিন শঙ্কিত, ভীত-বিহ্বল পদ্মবউ ‘আপনার হতভাগ্যের কথা’ ভেবে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। কিন্তু পিতার মুখে শাস্ত্রকথা শুনে, ধর্মে বিশ্বাস রেখে ‘সমস্ত রাত্রি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পদ্ম পরদিন প্রভাতে পিতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার সঙ্গে তুমি চল বাবা।’ স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে পতিব্রতা পদ্মবউ সমাজ-সংস্কার-ধর্মে সমর্পিত হয়েছে। কুষ্ঠরোগী স্বামীর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও স্বামীর ধর্মবিমুখ উচ্চারণে ‘পদ্মবউ বলিল, না না, ধর্ম কি কখনও মিছে হয় ? দেখ ভগবানের কোপ ভিন্ন এ রোগ হয় না ; ভগবান প্রসন্ন হ’লেই আবার ভাল হবে ; ভগবানকে ভুলো না।’ সংস্কারাচ্ছন্ন ও

অদৃষ্টবাদী পদ্মবউ জানে পুরাণোক্ত পতিব্রতা-নারী কুষ্ঠরোগী-স্বামীর সেবাই শুধু করে নি, স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য নিজে স্বামীকে বেশ্যাবাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। সে তুলনায় গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক স্বামী চন্দ্রমশায়ের সঙ্গে জীবনযাপন এবং তার সেবা করা কঠিন কিছু নয় পদ্মবউয়ের কাছে। ফলে তার ধর্ম-কর্ম, ইহকাল-পরকালের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় স্বামী চন্দ্রমশায়। ফলে স্বামীসেবা এবং স্বামীকে সুস্থ করে তুলবার কাজে সে নিরলস থেকেছে সংসার-কর্মের পাশাপাশি।

পদ্মবউ নিজের চারপাশে যে জগৎ নির্মাণ করেছিল সে জগতে হয়ত আরো কিছুকাল সে নির্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করতে পারত। কিন্তু তাদের আয়ের একমাত্র উৎস চন্দ্রমশায়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে যাবার পর পদ্মবউ নিক্ষিপ্ত হয়েছে ভিন্নতর জীবন-সংগ্রামে। স্বামীসেবার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সে সংসারের আয়ের উৎস বের করেছে ; সেবা ও কর্ম উভয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের কারণে অসুস্থ পদ্মবউ একদিন চাল ধার করতে প্রতিবেশী মুখুজ্জেদের বাড়ি গেলে পুনরায় তার জীবনের ছন্দপতন ঘটে। স্বামীর মত তারও কুষ্ঠরোগ হয়েছে—মুখুজ্জে গিন্নির এই উচ্চারণে কেঁপে উঠেছে তার সমস্ত অন্তরাত্মা। তারপরে যখন এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে যে সে নিজেও কুৎসিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত তখন তার দীর্ঘকালের সযত্নলালিত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরকালের কথা, ধর্মের কথা এবং স্বামীকে পরম দেবতা ভেবে পদ্মবউ নিশ্চিন্তমনে নিরলস স্বামীসেবা করেছে, ভেবেছে পতিব্রতা স্ত্রীর কখনও কুষ্ঠরোগ হবে না, বরং স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করলেই হবে পরম অধর্ম। তার বিশ্বাস 'ও হল অদৃষ্টের কথা' কিংবা 'ভগবানের কোপ ভিন্ন এ রোগ হয় না।' কিন্তু সে তো ভগবানকে তুষ্ট করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তবে কেন তার এ রোগ হল এই জিজ্ঞাসায় পদ্মবউ প্রবল আত্মদ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়ে বিশ্বাসভঙ্গের দুঃসহ যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়েছে। যে পদ্মবউ একসময় বলেছে 'ওই তোমার এক স্বভাব—কাপড় ছুঁতে দেবে না, শরীর নাড়তে দেবে না। দেখ ছুঁলেই যদি রোগ হ'ত তা হ'লে আর বাকি থাকত না।'—সেই 'পদ্ম মাথার কাপড় খুলিয়া উন্মত্তার মত বলিল, দেখ, দেখ, হ'ল তো।' কিংবা—'অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে পদ্ম স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, সরে যাও বলছি, সরে যাও তুমি আমার সামনে থেকে।' জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টিতে ধর্মাশ্রয়ী পদ্মবউয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা ; ধর্মে বিশ্বাস আবার ধর্মের প্রতি ক্ষোভ। তার মনোলোকে কেবলই দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। একবার দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হয়ে পরক্ষণেই আবার সে নতুন দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়েছে বিশ্বাস ভঙ্গের অসহ্য যন্ত্রণায়। আর তাই 'পদ্ম নির্মম আক্রোশে দেওয়ালের দেবদেবীর ছবিগুলি চুরমার করিয়া দিতেছে।' প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পদ্মবউয়ের দ্বন্দ্ব এবং নবলব্ধ বিশ্বাস নিয়ে তার মৃত্যু তাকে স্বতন্ত্র চরিত্রমহিমা দান করেছে।

পদ্মবউয়ের মতই কুষ্ঠরোগীর বউ হওয়া সত্ত্বেও মহাশ্বেতার জীবনাবেগ, জীবনাচরণ ও জীবনযন্ত্রণার মাত্রা ভিন্নতর। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ পূর্বকালের রচনায় মানুষের জীবন, তার আদিমতা, জৈব তাৎপর্য ও আদি-অন্তহীন স্বভাবকে গল্পে শিল্পের মূল্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৩] ফলে দেখা যায় যতীনের আঙ্গুলের মধ্যে যখন কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক লক্ষণ দৃশ্যময় হয় তখন না-বুঝেই মহাশ্বেতা প্রণয়াবেগে 'আঙ্গুলটা চুম্বন করিয়া হাসিল।' তবে যেদিন প্রকাশ পেল যতীনের সত্যি সত্যি কুষ্ঠরোগ হয়েছে তখন মহাশ্বেতা 'আতঙ্কে বিহ্বল' হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পদ্মবউয়ের মত সে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে না গিয়ে বরং প্রথাগত ধর্ম-সংস্কার-আশ্রয়ী সনাতনী বাঙালি বধূর মত বলে ওঠে 'তোমার পাপ কেন হবে গো ? আমার কপাল।' এখানে মহাশ্বেতা যেন নিয়তিবাদী। অসুস্থ যতীনও বাড়ির সবার কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে 'নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দি করিয়া রাখিল।' তবে স্ত্রী মহাশ্বেতাকে ত্যাগ না-করে পূর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে সে তাকে পেতে চেয়েছে। মহাশ্বেতাও 'খানিকটা কল-বনিয়া-যাওয়া *মানুষের মত যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে ... আত্মসমর্পণ করিয়াছে।' কিন্তু* মহাশ্বেতার এই নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণ যতীনের মনে অসংগত ভাবের জন্ম দিয়েছে। সে মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করতে শুরু করে নানা কারণে-অকারণে। তার বিশ্বাস মহাশ্বেতা তার প্রতি 'ঘেন্নায়' মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের ভেতরটিও ক্রমাগত কুৎসিত ও কদাকার হতে হতে তার ভেতরকার মানবিক প্রবৃত্তিগুলির মৃত্যু ঘটেছে। 'কোণ-ঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।' ফলে, যতীনের উগ্র-হিংস্র-স্বার্থপর আচরণ ভাগ্যবাদী মহাশ্বেতার অন্তর্যন্ত্রণার উৎসে পরিণত হয়েছে। অন্যপক্ষে বিত্ত-বৈভবের মাঝে বেড়ে ওঠা যতীনের কাছে নিজের চাওয়া-পাওয়াটাই বড়। ফলত মহাশ্বেতার মধ্যেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে ক্রমে ক্রমে। নিরাসক্ত ও অবিচলিত যে মহাশ্বেতা স্বামীসেবায় সমর্পিত ছিল, এখন, 'মনে হয় আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।' সে 'জীবনের অবলম্বন খোঁজে।' এর আগ পর্যন্ত মহাশ্বেতার মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি ; স্বামীর কুষ্ঠরোগ তাকে বেদনার্ত করলেও স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করবার কথা চিন্তাও করে নি, বরং নিস্তব্ধ, বিহ্বল থেকেছে। স্বামীর বাইরের কদাকার রূপ নয়, ভেতরের পঙ্কিল স্বরূপই মহাশ্বেতার চেতনায় রচনা করেছে দ্বন্দ্বময় পটভূমি। স্বামীর ভেতরকার আদিম ক্রূরতার প্রকাশই তাকে নিক্ষেপ করেছে ভাগ্যশাসিত চেতনাস্তর থেকে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মানসভূমে। এর পর থেকে সে স্বামীসঙ্গ একপ্রকার ত্যাগই করেছে। পদে পদে স্বামীর সন্দেহ, অবহেলা, অভিশাপ এবং রূঢ় আচরণে দ্বন্দ্বজীর্ণ মহাশ্বেতার উত্তরণ ঘটেছে ভিন্নলোকে। ধর্ম-সংস্কারে বিশ্বাস হারিয়ে 'বেরিবেরি' রোগে পদ্মবউ মৃত্যু বরণ করলেও মহাশ্বেতার জীবনে তেমন কিছু ঘটল না ; সে প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে উত্তীর্ণ হলো মানবধর্মে।

কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম খুলে তাদের সেবা-যত্নে আত্মমগ্ন হয়ে জীবনের প্রশান্তি খুঁজলো মহাশ্বেতা।

প্রসঙ্গত 'কুষ্ঠের স্ত্রী'[৪] গল্পের অতসীর দ্বন্দ্ব-বেদনার বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য। বিয়ের একদিন পর সকালে অতসী স্বামী সুশোভনের মুখের দাগগুলি[৫] আবিষ্কার করে এবং তার মধ্যে এমন ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেয় যে সুশোভন কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত। দরিদ্র মামার আশ্রয়ে পালিত পিতা-মাতাহীন অতসীর জীবনে যুক্ত হয় নতুন যন্ত্রণা। আতঙ্কগ্রস্ত অতসীর মনে হয় সুশোভন ঠকিয়ে বিয়ে করেছে তাকে। তার ইহকাল পরকাল নষ্ট করে দিয়েছে। তাই 'শিশুসুলভ প্রতিশোধ' স্পৃহায় 'অতসী বললে, 'যখন আমার পরকাল নষ্ট করেছ, তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে লিখে দিতে হবে।' জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী অতসী জীবনের প্রশান্তি খুঁজবার চেষ্টা করে বলেছে 'আমি সারা জীবন সতীর মতই থাকব, তুমি যা সম্পত্তি লিখে দেবে তার থেকে পশ্চিমে একটা বাড়ি করে একা–একা পুজোপাজা করব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন পরজন্মে তোমার এমন না হয়।' সুশোভন তাকে ঠকিয়েছে এই ভেবে সে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস–অবিশ্বাসে দোলায়িত হয়নি ; সনাতন বাঙালি–নারী হিসেবেই তার প্রতিষ্ঠা।

পদ্মবউয়ের দ্বন্দ্বের উৎস ধর্ম-সংস্কার। সে সযত্ন-লালিত বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে অসহ্য বেদনায়। কিন্তু মহাশ্বেতা ধর্ম-সংস্কার নিয়ে এমনভাবে আলোড়িত বা বিশ্বাসচ্যুত হয়নি। আত্মমর্যাদাবোধ ও অহংসজাগ মহাশ্বেতার দ্বন্দ্ব-বেদনার উৎস কেবলই যতীন। তার বেলায় ব্যক্তিত্বের সংকটই প্রকট, পক্ষান্তরে পদ্মবউয়ের সংকটের উৎস সনাতনী বিশ্বাস আর আরাধ্য দেবতা।

আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে মহাশ্বেতা–যতীন এবং পদ্মবউ–চন্দ্রমশায়ের আচার-আচরণ, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণার মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত। অর্থ উপার্জনের কোন চিন্তা না থাকায় যতীন সারাক্ষণ রোগ এবং মানব–সম্পর্কের নানা জটিলতা নিয়েই ভেবেছে। অসুখের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ্ ও স্বাভাবিক চিন্তার পরিবর্তে যতীনের মনের আদিম ও জৈব চেতনার প্রাবল্য ব্যাধির চেয়েও বেশি পীড়িত করেছে তাকে। কিন্তু চন্দ্রমশায়–পদ্মবউয়ের বেলায় মানব–প্রবৃত্তির জটিলতার পরিবর্তে দারিদ্র্য–বিমোচন চিন্তা অনেক বেশি সক্রিয় থেকেছে। ফলে মানব–প্রবৃত্তির দুরূহতা যতীন-মহাশ্বেতার মানসিক দূরত্ব বাড়িয়ে তুললেও চন্দ্রমশায়–পদ্মবউয়ের ক্ষেত্রে তা হয়েছে অন্যরূপ এবং গল্পের পরিণতিও হয়েছে ভিন্নমাত্রিক। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে মহাশ্বেতা কুষ্ঠ-আশ্রম খুলে জীবনের নতুন চেতনায় সুস্থির হয়ে মানসিক প্রশান্তি খুঁজবার চেষ্টা করেছে আর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অপুষ্টির কারণে বেরিবেরি রোগে মৃত্যু হয়েছে পদ্মবউয়ের।

ঘটনা-সৃষ্ট মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্তরবহুল উন্মোচন ঘটিয়েছেন মানিক তাঁর গল্পে। মহাশ্বেতার ব্যক্তিত্বের সংকট ও দ্বন্দ্ব রূপায়ণে তিনি সতর্ক হলেও তারাশঙ্কর তা করেন নি। পদ্মবউয়ের দ্বন্দ্ব সমাজের সঙ্গে, দেবতার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে। অন্যদিকে দুটি নর-নারীর গুহায়িত জীবন বাস্তবতার রূপকার মানিক ; সেখানে সমাজ-বাস্তবতা মুখ্য বা পার্শ্ব চরিত্র হয়ে উঠেনি। তারাশঙ্করের গল্পে চন্দ্রমশায় ও পদ্মবউয়ের মত

সংস্কার–বাস্তবতাও যেন অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র। চন্দ্রমশায়–পদ্মবউয়ের জীবনকে বহুবঙ্কিম ও জটিল এবং বেদনাঘন করতে বাস্তবতার ভূমিকা বিশেষ। তারাশঙ্কর অনেক বেশি সমাজঘনিষ্ঠ হয়ে, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই বিশ্লেষণ করেছেন চন্দ্রমশায় ও পদ্মবউকে। তবে তারাশঙ্করে সংস্কার-বাস্তবতার বিশেষ ভূমিকা যেমন রয়েছে তেমনি মানিকে প্রাধান্য পেয়েছে মনোবাস্তবতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন-মহাশ্বেতার মনোজগৎকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মনোজগতের পরিবর্তন এবং অন্তিমে পরিবর্তিত বিশেষ চেতনায় সুস্থির হবার বিষয়টি চমৎকার ভাবে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। আমরা জানি 'অবচেতন ও অচেতনার আঁধার লোকে, মনোগহনের জটিল সর্পিল পথে, কূটৈষণার পথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়া থেকেই স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা।'[৬]

তারাশঙ্করের গল্পে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় মেলে ঠিকই কিন্তু তা ভাববাদী জীবনাদর্শ পরিস্নাত। পদ্মবউয়ের বিশ্বাসে দোদুল্যমানতা ছিল, বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণা ছিল ; কিন্তু তারাশঙ্কর নিজের বিশ্বাসে ছিলেন সুস্থির। '...ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সনাতন ধর্ম ও রীতিনীতি দেশাচারের জন্য এক পিছুটান এক গভীর মমত্ববোধ সবসময় তিনি অনুভব করেছেন।'[৭] আর তাই গল্পের অন্তিমে তিনি লিখেছেন : 'সে মূর্ছা পদ্মর আর ভাঙিল না। ডাক্তার খানিকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিল, নিউট্রিশনের অভাবে এঁর বেরিবেরি হয়েছিল।' এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় মেলে, তবে এই বিজ্ঞানবুদ্ধির পশ্চাতে তিনি তাঁর ভাববাদী জীবনবোধেরই পরিপুষ্টি ঘটিয়েছেন। প্রথাগত ধর্মেরই জয়গান এখানে উচ্চারিত। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন স্বামীপ্রেম ও স্বামীসেবায় সুস্থির 'পদ্ম'র কখনো কুষ্ঠরোগ হতে পারে না। আসলে গল্পের পরিণতিতে বা মীমাংসায় তাঁর অন্তরতম আস্তিক্যবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'একদিকে প্রখর বস্তুনিষ্ঠ সমাজবীক্ষা অন্যদিকে সবকিছুর উপান্তে অদৃশ্য অথচ অমোঘ পরমশক্তির লীলাচাপল্য ও অকাট্য বিধান সম্পর্কে অকপট আস্থা—তারাশঙ্কর-চরিত্রের প্রধান ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।'[৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটিতেও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় রয়েছে, তবে তা তারাশঙ্করের মত নয়। মানিক অবিকল বাস্তবতাকেই চিত্রিত করেছেন তাঁর গল্পে। তিনি প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসে সুস্থির মহাশ্বেতাকে দিয়ে গল্প শুরু করলেও গল্পের অন্তিমে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন অন্যবিধ মানসবিশ্বে। যে মহাশ্বেতার যাত্রা শুরু নিয়তি নির্ভরতার মধ্য দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পথ-পরিক্রমায়, মনোজগতে রক্তাক্ত হয়ে সেই মহাশ্বেতাই উপান্তে উত্তীর্ণ হয়েছে আধুনিক মানবধর্মে।

গল্পদুটির জীবন বাস্তবতার স্বরূপ বদলে দিয়েছে বিসদৃশ পটভূমি। গল্পের পটভূমি নির্বাচনে উভয়েই ছিলেন সতর্ক। নিজস্ব চেতনার প্রকাশকল্পে তারাশঙ্কর গ্রহণ করেছেন গ্রামীণ পটভূমি আর মানিক শাহরিক পটভূমি। তারাশঙ্কর তাঁর আস্তিক্যবাদী চেতনার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করেছেন গ্রামকে। গ্রামের মানুষ যত সহজে নিয়তিবাদী বা ভাগ্যবাদী হয় শহরের মানুষ তত সহজে হয় না। আমরা জানি সাহিত্যরচনার এ-পর্বে মানিক পরিভ্রমণ করেছেন মানুষের অবচেতন ও চেতনস্তরে। শাহরিক মানুষ বিচ্ছিন্ন ও

ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ফলে এদের মধ্য দিয়েই মানসিক বহুভুজ জটিলতা প্রকাশ সম্ভব। অন্যদিকে লোকজ সংস্কার শাহরিক মানুষের তুলনায় গ্রামীণ মানুষের মধ্যেই বেশি শিকড়ায়িত। তারাশঙ্করের গল্পের অন্যতম উপাদান এই লোকজ-সংস্কার। 'রবিবার ব্রত', 'রবির স্তব' প্রভৃতি সংস্কারের প্রসঙ্গ রয়েছে তারাশঙ্করে। মানিকের গল্পেও সূর্যালোকের প্রসঙ্গ রয়েছে তবে তা সংস্কারশাসিত নয় ; বিজ্ঞানশাসিত : 'ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়।'

স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নিমগাছের ব্যবহার যে আমাদের সমাজে প্রচলিত, সে প্রসঙ্গটি রয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে। তবে কর্মফলবাদী তারাশঙ্করের গল্পে এ যেন নির্মম বিদ্রূপ। চন্দ্রমশায়ের 'উঠানের কোণে প্রকাণ্ড বড় একটা নিমগাছ।' এ 'নিমতলায়' বসেই সে ছাত্রদের পড়ায়, ছাত্রদের শাসনের জন্যও চন্দ্রমশায় বেছে নিয়েছে 'নিমের ডালের ছড়ি।' নিমের তেল শরীরে মেখে নিম পাতা ফুটানো জলেই সে স্নান করে। কুৎসিত মরণ ব্যাধির গ্রাস থেকে মুক্তি নেই জেনেও চন্দ্রমশায়ের জলে ডুবা মানুষের মত শেষ অবলম্বন খুঁজবার চেষ্টা উচ্চাঙ্গের আয়রনি সৃষ্টি করেছে। গল্পের কাহিনী বা পরিসর কতটুকু সময় জুড়ে বিস্তৃত তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও দুই শিল্পীই সচেতনভাবে ভিন্ন দুটি ঋতুর উল্লেখ করেছেন তাঁদের গল্পে। চন্দ্রমশায়ের নিরীহ নিঃস্ব নিস্তেজ মৃত্যুমুখী জীবনকে প্রতীকায়িত করবার জন্যই যেন তারাশঙ্কর শীত ঋতুর উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে যতীন চরিত্রে কঠিন কঠোর হিংস্ররূপ প্রকাশে মানিকের বৈশাখী সূর্যের উল্লেখ গভীর ব্যঞ্জনাময়।

কুৎসিত কুষ্ঠরোগের ভয়াবহতাকে পরিস্ফুট করতে তারাশঙ্কর একাধিকবার 'বীভৎস' শব্দের ব্যবহার করেছেন ; এ ছাড়াও 'নির্মমতা, বিকৃত, নিষ্ঠুর, ক্লেদসিক্ত, বন্ধুর, দুর্গন্ধ, গলিত, গহ্বর' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে অসুখের 'ক্লেদাক্ত' রূপকে দৃশ্যময় করেছেন তিনি। এর পাশাপাশি ভয় বা ভীতি অনুষঙ্গবাহী শব্দ-ব্যবহার পদ্মবউ ও চন্দ্রমশায় সহ অন্যান্য চরিত্রের অনুভব ও সংবেদনাকে করেছে বিশেষিত। এক্ষেত্রে 'শিহরিয়া, আতঙ্ক, শঙ্কা, কাঁপিয়া, সভয় থরথর'—এ শব্দগুলির পাশাপাশি ভয় শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন একাধিকবার। ইন্দ্রিয়বাহী চিত্রকল্পের মাধ্যমেও ভয়ানুভূতি ও আতঙ্কশিহরণকে তিনি করেছেন অভিব্যঞ্জিত—'চোখে যাদুর অঞ্জন দিয়া কে যেন প্রেতলোকের দ্বার তাহার [পদ্মবউ] দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া দিল।' এখানে যুগপৎ কুষ্ঠরোগের নিষ্ঠুর দিক এবং পদ্মবউয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া উন্মোচিত হয়েছে।

মানিকও এই বীভৎস ব্যাধির ভয়াবহ দিক স্পষ্ট করতে 'কর্কশ, কদর্য, কুৎসিত, পচন, গলিত, বিকৃত, বীভৎস' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি তিনি উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের ব্যবহারে এই রোগকে দৃশ্যমান করতে লিখেছেন—'তামার পয়সার মত গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ', 'মৃতমাংসের রূপ লইয়া' কিংবা 'টাকার মত চওড়া যে ক্ষতটি' ইত্যাদি। তবে মানিকের এই শিল্পিত পরিচর্যা-রীতির পশ্চাতে কর্মফলবাদী চেতনা প্রচ্ছন্ন ছিল বলে মনে হয়। গল্পের প্রথম দিকে পুণ্য ও পাপের জয়-পরাজয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তিনি। যতীনের পিতার অবৈধপথে উপার্জিত সম্পদই

যেন যতীনের কদর্য রোগের কারণ।[৯] আর এ জন্যই অসুখের বর্ণনায় 'তামার পয়সা' 'টাকার মত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে মানিক সপ্রতিভ। 'আতঙ্ক, বিহ্বল, শঙ্কিত, শিহরিয়া, সন্ত্রস্ত, অবসন্ন, শিথিল'—প্রভৃতি শব্দ তারাশঙ্করের মত মানিকেও রয়েছে, তবে তারাশঙ্করের শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে চারিত্রিক সংবেদনায় রোগের কদর্যতার স্থিতি হিসেবে। অন্যপক্ষে মানিক এসব শঙ্কানুষঙ্গবাহী শব্দ কুৎসিত রোগের প্রাতিকূল্যে ব্যবহার করলেও, যতীনের চারিত্রিক কদর্যতায় মহাশ্বেতার আতঙ্ক-বিহ্বল অবস্থার উন্মোচনই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। যেহেতু মানিকের উদ্দিষ্ট ছিলো রোগের পচনের চাইতে মনের পচনের স্বরূপ উদঘাটন, সেহেতু তিনি দেখিয়েছেন যে রোগের কদর্যতা নয়, যতীনের পঙ্কিলতাই মহাশ্বেতার যন্ত্রণা ও পরিবর্তনের উৎস।

অন্বিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনের বৈভিন্ন্য গল্প দুটির রচনাভঙ্গিতে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। দুই গল্পেই বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক, চিত্রাত্মক এবং নাট্যিক পরিচর্যারীতির ব্যবহার রয়েছে। তারাশঙ্কর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন বর্ণনাত্মক রীতিতে এবং এটিই তাঁর প্রিয় রচনাকৌশল। অন্যদিকে মানিক এখানে বিশ্লেষণাত্মক রীতিতেই স্থিত। কেননা মানবমনের রহস্যময়তা বিশ্লেষণে গোড়া থেকেই মানিক প্রাণিত এবং এ-গল্পেও তিনি বাইরের ঘটনার চেয়ে যতীন-মহাশ্বেতার মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণেই অভিনিবিষ্ট। ফলে তাঁর গল্পের পরিসরও হয়েছে বিস্তৃত। অন্যদিকে তারাশঙ্কর সমাজ-সংস্কারের পটভূমিতে পদ্মবউকে রূপায়িত করে তার অবিচল আস্তিক্যচেতনাকেই প্রতিষ্ঠিত করায় গল্পের আকৃতি হয়েছে সংক্ষিপ্ত ও সংহত।

তারাশঙ্কর যেহেতু ভাববাদী জীবনাদর্শকেই গল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এ কারণে পদ্মবউ-চরিত্র চিত্রণেই তিনি অধিক মনোযোগী। কিন্তু মানিক মানুষের মনোজগতের অবচেতনস্তরের ভাবনা বিশ্লেষণেই আগ্রহী। তাছাড়া পদ্মবউয়ের বিশ্বাসের দোদুল্যমানতা বা দ্বন্দ্বের উৎস সমাজ-ধর্ম-সংস্কার আর মহাশ্বেতার দ্বন্দ্বের উৎস এককভাবে যতীন, এ কারণে মহাশ্বেতার পাশাপাশি যতীন চরিত্র বিশ্লেষণেও মানিক বিশেষভাবে সচেষ্ট। 'মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারো এ কথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লানিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা।' কিংবা হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে: 'ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে।'—এমনি আরো অনেক বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার মাধ্যমে যতীনের আদিম, বিভঙ্গ, বিকৃত স্বভাবকে মানিক রূপময়-অনুভবময় করেছেন। তবে, যতীনের কুটিল-জটিল মনোধর্মের প্রকাশ করে তাকে কোনো বহুদৃষ্ট চরিত্রে পরিণত করেন নি মানিক। রোগের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন রূপায়ণ করে শিল্পসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

'পদ্মবউ' ও 'কুষ্ঠ-রোগীর বৌ' : সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

তারাশঙ্কর এবং মানিক উভয়ের অনুসন্ধান অভিন্ন না-হওয়ার কারণে গল্প দুটির পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। সতীর মত স্বামীসেবা করেও পদ্মবউয়ের কুষ্ঠ রোগ হল এই ধারণায় পদ্মবউ নিজের বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে বা সমাজ অন্তর্গত মানুষ দোলায়িত হতে পারে নিজেদের বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে কিন্তু প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া ঠিক হবে না—এমনি বিশ্বাস মূলীভূত ছিল তারাশঙ্করে। ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসেই তিনি জীবনের প্রশান্তি খুঁজে নেবার কথা বলেছেন। পরিণতিতে পদ্মবউ তার বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও গল্পের শেষবাক্যের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর মৌল জীবনাদর্শকেই প্রকাশ করেছেন। কুষ্ঠরোগীর পতিব্রতা-স্ত্রী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে নয়, বেরিবেরি রোগে মারা গেছে। তারাশঙ্কর যেন পদ্মবউকে এভাবেই পুরস্কৃত করলেন, পতিভক্তি ও ধর্মবিশ্বাসের কারণে স্বামীর কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকা তার অবিচল পতিব্রত্যেরই স্বীকৃতি। মানিক তারাশঙ্করের মত মহাশ্বেতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি ঘটান নি। তিনি মানুষের চেতনান্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবতর চেতনালোকে উন্নীত হয়ে জীবনের প্রশান্তি খুঁজবার কথাই বলতে চেয়েছেন। আর তাই মহাশ্বেতা প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে কুষ্ঠরোগীর আশ্রম খোলার মধ্য দিয়ে উন্নীত হয়েছে চিরায়ত মানবধর্মে।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রী ভূদেব চৌধুরী ; *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার* (পরিবর্ধিত চতুর্থ প্রকাশ ১৯৮৯), পৃ. ৪৩৮

২ তারাশঙ্কর রচিত গল্পের নাম 'পদ্মবউ'। গল্পটি আশ্বিন ১৩৪২ বঙ্গাব্দে *শনিবারের চিঠি*-তে প্রথম প্রকাশিত এবং *জলসাঘর* গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। মানিকের গল্পটির নাম 'কুষ্ঠ-রোগীর বৌ'।

৩ বীরেন্দ্র দত্ত ; *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ-১৫ এপ্রিল ১৯৮৯), পৃ. ১৪৬

৪ লেখক জীবনানন্দ দাশ। গল্পটির রচনাকাল মে ১৯৩২।

৫ 'দাগগুলি আগুনে পোড়া। এই দাগের জন্য সুশোভন দীর্ঘদিন বিয়ে করতে পারে নি। কারণ এই দাগগুলিকে সবাই কুষ্ঠরোগের দাগ হিসেবেই ধরে নেয় এবং তার কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নি। অবশেষে অনেক খুঁজে অতসীকে বিয়ে করে। মুখের পোড়া দাগ বাদ দিলে তাকে বেশ সুদর্শনই বলতে হয়। সুশ্রী দেহ-মনের একজনকে বিয়ে করবার বাসনা সুশোভনের বহুদিনের। কিন্তু অনেক কষ্টে যাকে যে বিয়ে করল সেই অতসীর ভেতব-বাইরে কোথাও যেন সে সুন্দর খুঁজে পেল না। এবং তার প্রতি অতসীর আচরণে সে বিস্মিত, হতবাক এবং স্তব্ধ হল।'

৬ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; *কালের পুত্তলিকা* (প্রথম দেজ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৩৪৪

৭ অশ্রুকুমার সিকদার ; *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮), পৃ. ১১৮

৮ ভীষ্মদেব চৌধুরী ; 'তারাশঙ্করের জীবনদর্শন : উৎস ও স্বরূপ ' (*সাহিত্য পত্রিকা*, ফাল্গুন ১৪০২), পৃ. ১১৫

৯ 'বড়লোক যদি হতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো।...সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল।...তাই জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠ-রোগের আবির্ভাব ঘটিল।'

তারাশঙ্করের 'রসকলি' : দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা

সিরাজুল ইসলাম

ঔপন্যাসিক-প্রতিভা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের জগতেও কীর্তিমান লেখকের আত্মস্বীকৃত প্রথম গল্প 'রসকলি', এর জন্যে নতুনত্বের আত্মতৃপ্তি ও এক দ্বিধা সক্রিয় ছিল তাঁর । মাটি ও মানুষের মহিমা-চিত্রণের স্বাভাবিক আকর্ষণ
ধে মৌলসত্য, তবু 'রসকলি' গল্পটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বীকার
বহির্চাপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক ভাঙনমুখি জীবনের পঙ্ক-উদ্ধার ও আশ্রয়ের পত্রিকা *কল্লোল* (১৩৩০); এতে দ্রোহ ছিল, বিপ্লব ছিল না। তাঁর শিল্পিমানস এ দ্রোহের অনুকূল না হলেও[১] তারাশঙ্কর সাময়িক আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এক সময় সচেতনভাবেই সরে গেছেন দূরে স্বক্ষেত্রে, এবং প্রথম রচনা থেকেই এই দ্বিধা-সত্য, স্থির ও নির্দিষ্ট।

গতি ও স্থিতির দ্বিধা ব্যক্তিক-সামাজিক-রাজনীতিক-অর্থনৈতিক-জীবনে আবর্ত তৈরি করলেও উত্তরণ ইতিহাস-নির্দিষ্ট। তারাশঙ্কর বিশ শতকের প্রথমার্ধের মাটি ও মননের যাবতীয় দ্বিধা-লগ্ন[২] হয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মানুসন্ধানী। কবিতা ও নাট্যরচনায় ব্যর্থতা[৩] তাঁকে বিপর্যস্ত করে নি ; বরং হয়ে উঠেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক ক্রিয়া-কাণ্ডে জীবন ও ঐতিহ্যস্পর্শী এবং এখানেই তারাশঙ্করের গদ্যের মূল শক্তি ও মনোবল। আমরা অস্বীকার করবো না তাঁর কল্পনা-প্রিয় কবিসত্তার দিকটি ; যেহেতু গদ্যে থাকে যুক্তির লাগাম, যদি তা লিখে থাকেন একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি, তবে তা তথ্যসন্ধানী সামাজিক হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কল্পনা, ঐতিহ্য ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে এক আস্বাদময় দ্বিধা তারাশঙ্করের গদ্য সাহিত্যকে অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা দেয়, করে রাখে জীবন্ত। 'রসকলি' গল্পেও আমরা সেই প্রাণময় বর্ণ-গন্ধ আস্বাদযোগ্য জীবন ও শিল্পের স্পর্শ পাবো। লেখক বলেছেন, 'বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়।'[৪] আমাদের প্রশ্ন প্রথম গল্প-প্রসঙ্গটি নিয়ে , কেননা লেখক স্বীকার করেছেন, 'তার আগে ['রসকলি'র] পূর্ণিমায় আমি একটি 'স্রোতের কুটো' বলে গল্প লিখেছি।'[৫] উল্লেখ্য নাট্যরচনায় ব্যর্থতা ও আত্মগ্লানিকে অতিক্রম করে তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু নির্মলশিব বাবুর পুত্র নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত *পূর্ণিমা* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন।—

'কবিতা গল্প সমালোচনা সম্পাদকীয় অনেক লিখে যাই। কাগজখানির নাম 'পূর্ণিমা' । আমিই প্রায় রাহুর মত গিলে ফেলতাম তার অর্ধেকটা, কিন্তু একটা কী যেন খচখচ করত তবু মন ভরত না। যে সব লেখা পূর্ণিমার কর্তৃপক্ষের ভালো লাগত সে সব আমার ভালো লাগত না।[৬]

অনেক লেখকেরই আদি-লেখাকে অস্বীকার করার প্রবণতা থাকে, তারাশঙ্করও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভিক লেখাগুলো নিয়ে বিব্রত হয়েছেন। *পূর্ণিমা* পত্রিকায় একটি নয়, দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'রসকলি' প্রকাশের পূর্বেই ; 'স্রোতের কুটো' (আষাঢ়,১৩৩৪), এবং 'উল্কা' (আশ্বিন, ১৩৩৪) ; কবিতাবলির কথা বলা হলেও এখন তা বিস্মৃত। কিন্তু 'রসকলি' গল্পের পূর্বে প্রকাশিত গল্পগুলোকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর-মানসের এ-সম্পর্কিত দ্বিধা অন্তর্হিত হয় নি। 'রসকলি'-কে প্রথম গল্প হিসেবে স্বীকার করার পরও ১৩৩৪ সালকে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভ-বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেন নি।

৩৪ [১৩৩৪] সালের ফাল্গুনের কল্লোলে 'রসকলি' প্রকাশিত হওয়ায় ষান্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। 'হারানো সুর' প্রকাশিত হলো এক মাস পর ; তখন সম্পাদক জানালেন, আমাকে আর কল্লোলের জন্য মূল্য দিতে হবে না, কল্লোল আমি নিয়মিত পাব এর পর থেকে। সুতরাং ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব।[৭]

এ-এক রহস্যময় দ্বিধান্বিত মনোবৃত্তি তারাশঙ্করের, কেবল মূল্য না দিয়ে *কল্লোল* পাবার সূচক সাহিত্য-জীবনের সূচনা বিন্দু পাল্টে দেবে, এটি অন্তত তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর মধ্য দিয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন জড়িয়ে যায়, 'রসকলি'কে স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল কি না, ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হলেও প্রথম দুটি গল্পগ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সে ধারণা বদ্ধমূল হওয়ারই কথা। অবশ্য তৃতীয় গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ' 'রসকলি' যথার্থ মহিমায় উজ্জ্বল ; ভূমিকায় লিখেছেন :

গল্পটির প্রতি আমার একটি মমতা আছে। আজ দশ বৎসর পরে কবিগুরুকে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প লইয়া গল্প বাছিতে বসিয়া বারবার 'রসকলি'-র কথা মনে হইল। উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনের প্রথম রচনা কবিগুরুর হাতে সমর্পণ করিলাম।

আমাদের মনে হয়ে উপর্যুক্ত সরল ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন্তব্যও 'রসকলি' সম্পর্কে সর্বশেষ নয়। গল্পটি রচিত হওয়ার পটভূমি, বহির্চাপ ও অন্তর্চাপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও অলক্ষ্যে তারাশঙ্করকে তাড়িত করেছে, আগ্রহ ও অনাগ্রহের মধ্যে রয়েছে দোদুল্যমানতা। *পূর্ণিমা*-য় লিখতে তারাশঙ্করের একটা কী যেন খচখচ করত তবু মন ভরত না ; কংগ্রেসের কাজের ভেতরেও ছিল ব্যর্থ নাট্যকারের স্মৃতিনিষ্ঠ মনস্তাপ ; আর ছিল সামন্ত ও বুর্জোয়া ক্লেদ-সংমিশ্রণ থেকে উত্তরণকামী অনন্য এক শৈল্পিক পরিশুদ্ধ অহঙ্কার। সেই সূত্রেই যেন সিউড়িতে কংগ্রেসের কাজে নিদ্রাহীন এক রাতে মলাট ছেঁড়া *কালিকলম* আত্মদর্পণ হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দের 'বেনামি বন্দর : জনি ও টনি'—তাঁর সামনে খুলে দেয় বিস্ময়কর ও রসমাদকতাপূর্ণ এক জগৎ। [৮]

'সে দিন রাত্রে দেখলাম ওই লেখাগুলির সঙ্গে আমার স্রোতের কুটোর ঢং-এর বেশ মিল আছে। তবু একটা কথা মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত ;— পরাভূত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয়না। এমন কি ঐ আবেগের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তার স্বাভাবিক ধর্ম, তারও অভাব রয়েছে মনে হল। জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেই খানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব।[৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্পে তারাশঙ্কর দেহ ও মনের অবাধ উন্মোচন এবং বীরভূম অঞ্চলের নিপুণ চিত্রাঙ্কন লক্ষ করেছেন। অবশ্য তারাশঙ্কর-উল্লেখিত গল্প দুটো সম্পর্কে এ-মন্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়, বিশেষত শৈলজানন্দের গল্পে অঞ্চল বিশেষের চিত্র স্পষ্ট নয়—এবং তিনি তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমনও বলা যায় না। বরং তিনি ঐ ধরনের গল্পের নিন্দা করেছেন ; জৈবিক আবেগের প্রাবল্যকে অতিক্রম করার চেষ্টাই তাঁর নিকট মানবধর্ম, এবং তিনি মানুষের গল্পই লিখতে চেয়েছেন। সেই মানুষের গল্প, যে দেহগত আবেগের প্রাবল্যকে লাগাম-বদ্ধ করে, রক্ষা করে নীতি, ধর্ম, সমাজ এবং এর ভেতর থেকে অনুভব করে পরিশুদ্ধ আত্মিক আনন্দ। তারপরও তিনি পূর্ব-প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' গল্পের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্পের একাত্মতা অনুভব করেছেন। মূলত তারাশঙ্কর সমকালে রাজনীতি সূত্রে বীরভূম-জীবনে একাত্ম ছিলেন এবং তাকেই রূপদানের পথ খুঁজছিলেন। সে জন্যে গল্প লিখতে গিয়ে তাঁর পরিচিত পরিবৃত্ত বৈষ্ণবসমাজেরই দ্বারস্থ হয়েছেন, যেখানে দেহের কথা আছে, তবে তা দেহকে অতিক্রমণের-ই সাধনা :

কী একটা কাজে ঘরের মধ্যে গিয়েছি—কানে এল—আমাদের গোমস্তা বলছে—পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্ট। মনে হল—বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। উঁকি মারলাম। দেখলাম না-তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু। এই তো! এই তো সেই জীবনের জয়।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল। তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত।[১০]

এই হচ্ছে তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের ভাব-বিশ্ব। দেহ-অতিক্রমী পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই পরিচিত কমলিনী বৈষ্ণবী মঞ্জরীতে রূপান্তরিত হয়েছে, পুলিন অবশ্য অবিকৃতই থাকে এবং এই গল্পের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের আত্মমুক্তি ঘটে :

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।[১১]

'রসকলি' গল্পের জীবন তারাশঙ্করের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ। তিনি *রাইকমল* উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে বীরভূমের মনোসাংস্কৃতিক-বিশ্বকে তুলে ধরেছেন 'কানু বিনে গীত নেই' মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব জীবনদর্শনের অন্তর্মূলে ভূ-প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্যের অভিঘাতকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তার প্রমাণও চণ্ডীদাস-চৈতন্য-প্লাবনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পীর অভিজ্ঞতা, জন্ম-প্রজন্ম-বাস্তবতার উর্ধ্বেও সক্রিয় থাকে শৈল্পিক অবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি জীবনে বৈষ্ণবতা এক মোহময় রোম্যান্স, রুদ্ধতার বিপরীতে মানবিক স্বাধীনতা ; সামান্য হলেও যৌনতার মুক্তি—সে জন্যেই বাংলা সাহিত্যে অলক্ষ্য থাকে না বিধবা-বৈষ্ণবীর মাধুর্য। তাদের জীবনযাত্রার মুক্ত সৌন্দর্য, যৌবনের বিনয় ও ঔদ্ধত্য আশ্চর্য এক কূটাভাষ—আবিলতায় কোথাও ঘৃণ্য নয়। দেহটা আত্মার আধার মাত্র, আর নারীর কথা যদি বলা হয় সে তো রাধা—পাপ কলুষমুক্ত পরম সাধনার হাতিয়ার। এই জগৎ শিল্পীর মুক্ত বিচরণক্ষেত্র, সে জন্যেই তারাশঙ্করের 'হারানো সুর', *রাইকমল*, 'প্রসাদমালা', 'মালাচন্দন', 'সর্বনাশী এলোকেশী', 'রাধারাণী', 'বাউল', 'বাঞ্ছাপূরণ', 'চোখের ভুল' প্রভৃতি গল্পে বৈষ্ণবজীবনের আধিপত্য।

দুই

'রসকলি', পুলিন, মঞ্জরী, গোপিনী ও রামদাস চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বিধা, বৈপরীত্য ও সমন্বয়ের গল্প। তারাশঙ্কর-কথিত মানবধর্মে দেহকে স্বীকার করেও যেখানে আত্মার প্রাধান্য, সেই অন্তর্প্রেরণা গল্পটির জীবন-সীমা নির্ধারক শক্তি। সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতায় আকৃষ্ট কিন্তু এক আদর্শবাদী জীবনবোধ দ্বিধা তৈরি করলেও নিয়ন্ত্রিত পরিণতি সমাজ-অনুগামী এবং আদর্শ মানবধর্ম-কল্পনায় রোম্যান্টিক। ফলে তারাশঙ্করের বৈষ্ণব-জীবন তত্ত্ববহির্ভূত, পঙ্কসমাজ-মুক্ত এক শৈল্পিক সন্দর্ভ। এখানে নীতির প্রশ্ন নয়, জীবনের বেদনা শান্তি ও সুস্থতায় যে পদক্ষেপ ফেলে তার গতি সন্ধানই মূল কথা। গল্পটির নাটকীয় প্রারম্ভে, পুলিন উপবিষ্ট অজগরের মতো গর্তমুখী বটগাছের শিকড়ের উপর এবং সে 'ব্যাঙ-ছুড়ছুড়ি' খেলায় মত্ত। গল্পকার সর্প-প্রতীকে জীবনের আবেগকে চিহ্নিত করেছেন, যা যৌনতা ও সন্তান কামনার সঙ্গে জড়িত। যৌনতার প্রসঙ্গটি নিয়েই 'রসকলি' বৈষ্ণবতা থেকে দূরবর্তী জীবনের কামনা-বাসনার গল্প। এই জীবননিষ্ঠা বিচিত্র দ্বন্দ্বের ভেতর প্রকাশিত ও মীমাংসিত। গল্পে পুলিন সমাজ-সমর্পিত চিন্তার অধিকারী নয়, বৈপরীত্য তার চরিত্রগত। পুলিনের জীবনাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয় রামদাসের মৃত্যুমুখিতার কথা। এই দ্বন্দ্বের উৎস পুলিনের গৃহবিমুখ কল্পনাপ্রিয়তা এবং রামদাসের অর্থলোলুপ গৃহনিষ্ঠ মনোভঙ্গির বৈপরীত্যে। সে জন্যে পুলিনের মনোজগতে সক্রিয় থাকে খুড়ো রামদাসের মৃত্যু-চিন্তা, এর মধ্য দিয়ে সে গৃহ ও গোপিনীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে এবং ফিরে যেতে পারবে মঞ্জরীর সান্নিধ্যে—প্রেম ও কল্পনার জগতে। ফলে পুলিনের দৃষ্টিকোণে মঞ্জরীই জীবন-সান্নিধ্য। কিন্তু গোপিনীকেও সে সাপিনী হিসেবে অভিহিত করেছে, অবশ্য আমরা জানতে পেরেছি এ মতটি মঞ্জরীর। কিন্তু মঞ্জরীই কেন গোপিনীকে জীবনের প্রতীক করে তুলবে ? এ প্রশ্নের উত্তরেই তারাশঙ্করের সমন্বয়-চিন্তা প্রকাশিত। মঞ্জরী পুলিনের প্রেমের জগৎ

অসঙ্গত, কিন্তু সমাজ-স্বীকৃত জীবন হিসেবে পুলিনকে শেষ পর্যন্ত গোপিনীকেই আশ্রয় করতে হবে। প্রথম থেকেই তাই পুলিনের যৌন-জীবনের অবলম্বন হিসেবে গোপিনী চিহ্নিত, মঞ্জরী রসোচ্ছলা কিন্তু নর্ম-সঙ্গিনী নয়।

রামদাস মোহান্ত গল্পের সর্বাপেক্ষা বিক্ষুব্ধ চরিত্র। তার ভেতরে গৃহ ও পথের দ্বন্দ্ব নাটকীয়তায় প্রাণময় হলেও শেষ পর্যন্ত স্বার্থপরতায় মীমাংসিত। কদাকার রামদাসকে পরিত্যাগ করে যায় স্ত্রী শ্রীমতী এবং সেই ক্ষোভে সে গৃহী-বৈরাগ্য পরিত্যাগ করে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগীতে পরিণত হয়। কিন্তু গৃহ তাকে পথ থেকে টেনে আনে, ভিক্ষার অর্থেই নির্মিত হয় বৈরাগ্য মুক্তির বন্ধন—সম্পত্তি। তবু তার মনে শ্রীমতীরই একাধিপত্য এবং তা রাধার আদর্শে গঠিত :

> কে একজন স্ত্রী-জাতির কী একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিভ কাটিয়া সবিনয় প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে ও কথা বোলে না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভালো।
>
> একজন ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—
>
> মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা ?

উৎসাহব্যঞ্জক নারী-মহিমা ধ্বনিত হলো রামদাসের উক্তিতে। নারীর স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও পুরুষতান্ত্রিকতা পরিত্যাগের ক্ষমতা শ্রীমতীর সূত্রে সকল নারীর ক্ষেত্রেই মূর্ত হলো। কিন্তু রামদাস মঞ্জরীর 'অসঙ্গত' প্রণয়কে মেনে নিতে পারেনি, এর প্রত্যক্ষ কারণ সমাজ-স্বীকৃত পরিবার কাঠামো এবং বৈষ্ণব হলেও, বর্ণপ্রথার দেয়াল। ভেকধারী বৈষ্ণবী সৌরভীর কন্যা মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দিতে চায় নি রামদাস এবং মৃত্যু পূর্ববর্তী সংলাপেও মঞ্জরী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় নি :

> মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচ জন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই। আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

মোহান্তের দৃষ্টিতে 'অসঙ্গত' প্রণয়ের জন্যে মঞ্জরী পতিতা কিন্তু তারই উক্তিতে আমরা জেনেছি গৃহত্যাগী শ্রীমতী হচ্ছে রাধা। মঞ্জরী কলুষ ও পাপযুক্ত, শ্রীমতী তা নয়—স্পষ্টতই এটি একটি বৈপরীত্য এবং এর উৎস সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্মূলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে তার প্রয়োজনেই নির্মাণ করে নেয়, কখনোই আত্মসৃষ্টিকে মেনে নেয় না। মঞ্জরী সমাজ-আয়ত্তে আসে নি বলেই পতিতা, কিন্তু শ্রীমতীকেও মুক্ত করা হয় নি সমাজবন্ধন থেকে। তাকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, পুরুষতন্ত্রের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা এবং তারই জয়গান গাইতে গাইতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে :

> শ্রীমতী তাহার [রামদাস] পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মত নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত বোষ্টম, তারই মেয়ে।

...শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি, হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, নারী সম্পর্কে এ-হচ্ছে তারাশঙ্করের মীমাংসা। ধর্ম ও বর্ণের স্থিতিশীলতা রক্ষায় যাবতীয় আঘাত ধারণ করতে হয় নারীকে ; ধর্মস্ত্রীর গর্ভেই ধারণ সম্ভব বৈধ সন্তান এবং সে জন্যেই তার সামাজিক মর্যাদা। শ্রীমতী স্ব-বর্ণের প্রেমদাসের সঙ্গে 'অসঙ্গত' কণ্ঠি বদল করে পাপ করেছে সত্য, কিন্তু গোপিনীও পরিত্যক্ত হয় নি। শ্রীমতীর আত্মপ্রত্যয়ন ও গোপিনীর প্রতি উপদেশ প্রতিশোধপরায়ণ পুরুষতন্ত্রেরই বিজয়।

'রসকলি'-সন্দর্ভের মেরুদণ্ড মঞ্জরী। দেহ ও মনের দ্যুতি, বাক্য ও কর্মের অহঙ্কার, কামনা-সৌন্দর্যের স্বচ্ছতা, পবিত্রতার রহস্যময় বোধ, সর্বোপরি যৌবনের ঔদ্ধত্য ও রোম্যান্টিকতা তাকে শিল্প-জটিল করে তুলেছে। তবে দেহ ও দেহ-অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা প্রক্রিয়ার বর্ণনাই তারাশঙ্করের প্রধান আকর্ষণ। মঞ্জরী ভেকধারী বৈষ্ণবী, তার নিষ্ঠা জীবনের রসাস্বাদনে ; বৈষ্ণবের মুক্তজীবনে যতটুকু চাঞ্চল্য ও আত্ম-উন্মোচন সম্ভব সে দিকেই তার আগ্রহ। বৈষ্ণবের তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অমনোযোগিতা দুর্লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণ তার কণ্ঠের সুর, আবার পুলিন হলো রসকলি। এই রসকলির ভেতর দিয়েই আত্মিক সম্পর্কে পৌঁছানো সম্ভব—রাধা যেমন জাগতিক জীবনে কৃষ্ণকে ধারণ করে পরমাত্মার স্পর্শ পায়, রসকলিকে তেমনি অঙ্গে ধারণ করতে হয় জাগতিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে। তবু মঞ্জরীর প্রথম আশ্রয়-রূপ—

...সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ-নজরে ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে ডগমগ ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

দেহ-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি মঞ্জরীর দ্রোহী স্বরূপটিও এখানে স্পষ্ট। দেহ আত্মার আধার—দেহেই আত্মা প্রকাশমান, এ ভাবে অন্তত মঞ্জরীকে তুলে ধরা যায় অনেকাংশে। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময়ও তার রূপ-সচেতনতা অলক্ষ্য থাকে না।—

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে আর কি বলব!—সত্যিসত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—।

ঈষৎ আত্মধিক্কারের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত মঞ্জরীর প্রতিবাদী ও রূপসচেতন ব্যক্তিত্ব। মঞ্জরীর রূপের প্রকাশ নিছক খেলা নয়, প্রতিশোধপরায়ণতার স্থূলতাও নয়। মঞ্জরীর রূপ হচ্ছে দর্পণ বিশেষ, যখন আলোকিত প্রতিবিম্ব পড়ে তখন দর্পণের কথা মনে থাকে না, অদৃশ্য হওয়ার মতো বিভ্রমও ঘটে। এখানে দর্পণের প্রতিবিম্ব তারাশঙ্করের আদর্শবোধ, মঞ্জরী-পুলিনের প্রেমে তা প্রকাশিত দেহ-অতিক্রমী শুদ্ধতায় :

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতোই। বাহিরে গিয়াই দরজা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। এক রাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল। শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

দেহের কাঠামোতে জীবনের বসবাস কিন্তু জীবদেহ অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্ম—এ অভিমত তারাশঙ্করের, ফলে আত্মপরায়ণ দেহসুখ পরিত্যাগ করতে মঞ্জরী নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। প্রেমাস্পদকে গোপিনীর হস্তে সমর্পণ করে গৃহ-বিচ্যুত বৈরাগীতে পরিণত হওয়া ব্যতীত মঞ্জরীর উপায় নেই, যদিও 'গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না, না, তুমি সুদ্ধ এসো আমরা দু বোনে—কিন্তু 'রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতোই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!'—অর্থাৎ বিচ্ছেদ অনিবার্য। মঞ্জরী-বিচ্ছেদ পুলিন-গোপিনীর সমাজ ও পরিবার-স্থিতি এনে দেবে এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সমন্বয়ের কর্মপ্রক্রিয়াও মঞ্জরী কর্তৃক সম্পাদিত হয় ; জমিদারের সঙ্গে বিবাদ-প্রসঙ্গে তাই মঞ্জরীর উক্তি, 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো ? তাই মিটিয়ে ফেললাম।' তারাশঙ্কর যে মানবধর্ম ও শান্তি সন্ধান করেছেন তাতে প্রথা-বিদ্রোহ নেই, রয়েছে সমন্বয়ের স্থিতি। মঞ্জরীর জীবন-কামনা প্রথাকে চূর্ণ করে লাবণ্যময় কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা বিরোধী, তার যৌবন তীব্রতাকে আঘাত করে ব্যক্তিত্বময়, ফলে তার জন্যে একমাত্র শাস্তি তীর্থ-সাজ—কামনা-বাসনাময় জাগতিক জীবনের ঊর্ধ্বে দেহ ও আত্ম-অবদমনের পথ।

তিন

'রসকলি' সমকালীন অভিঘাতকে স্বীকার করেই প্রেম-জিজ্ঞাসা ও গৃহী-জীবনের গল্প। পরিশুদ্ধ সামাজিক-মানবিক ভঙ্গি এতে সক্রিয়, যদিও পথের গতি ও মাধুর্য, দেহ ও মনের সুসহ আকর্ষণ অস্বীকার করা হয় নি। বাঙালি জীবনে রাধা-কৃষ্ণ আর্কেটাইপ, সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব এবং গৃহ-বাস্তবতা ও কল্পনা-মুক্তির জটিল মনোজাগতিকতা এ-গল্পের কাঠামোতে রস-নিবিড়তার সৃষ্টি করে। প্রেম পরম আরাধনার, স্বর্গীয়, কৃষ্ণে সমর্পিত—রাধা সেই সত্যে বিশ্বাসী ; তবু রাধার দেহ ও মনের নিবিড়তা বিদ্যমান, উল্লাসও কম নয়। এ প্রেম দেহের নয়—আত্মার, সৌন্দর্য-লাবণ্যের এবং বিরহতা সত্য মেনে ভাবসম্মিলন প্রয়াসী। 'রসকলি' গল্পেও পুলিন-মঞ্জরীর প্রেম বিরহ-শান্তির, দেহ-নিমজ্জিত প্রতিশোধের নয়। সীমার ভেতর অসীমকে পেতে যে আত্মস্থতা প্রয়োজন তা মঞ্জরী চরিত্রের মজ্জাগত হলেও তত্ত্ব-কাঠামো জীবনকে অতিক্রম করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোষ্টমী' গল্পে আনন্দী বোষ্টমী পথে বেরিয়েছিল দেহকে অতিক্রম

করার সঙ্কল্পে ;[১২] নতুন এক গুরুর সন্ধান ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত হয়েও তত্ত্ব-মীমাংসিত। কিন্তু মঞ্জরী পথে বেরিয়েও দেহ-কেন্দ্রিক :

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কী হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

নীতির ঘূর্ণিপাকে তারাশঙ্কর-মানস মঞ্জরীকে বড় প্রেমের[১৩] মহৎ অসীমতায় স্থান নির্ধারণ করতে পেরে স্বস্তিবোধ করলেও শৈল্পিক মীমাংসাও সেই সূত্রে আশ্চর্য এক প্যারাডক্স। মঞ্জরীর ব্যক্তিত্ব পুলিন নামক এক চড়ায় আটকে পড়ার নয়, ব্যক্তিত্ব-বাস্তবতায় গ্রন্থিমোচনই অনিবার্য সত্য। যে গৃহ একাধিপত্য ও গৌরবের নয় তা মঞ্জরীর হতে পারে না—গৃহের বিপরীতে তাই পথই চরম সত্য। গৃহ-ধূসরতায় মঞ্জরীর প্রাণ মুক্তি পেত না, প্রেম হতো খর্ব, মঞ্জরীর মুক্তি তাই অসীমতায় এবং এই সূত্রে নীতিনিষ্ঠ তারাশঙ্করের সঙ্গে শিল্পী তারাশঙ্কর এসে যোগ দেন। গৃহ-সংকীর্ণতার বিপরীতে কল্পনা-মুক্তির জগতে বিচরণ মানব-মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত। তারাশঙ্কর-মানসের একদিকে কল্পনা-প্রিয় কবিমন, অন্যদিকে নানা তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ-তন্ময়তা ; ফলে পুলিনের জন্যে গৃহীজীবনে রইল গোপিনী, অন্য দিকে মানসিক মুক্তির জগতে মঞ্জরী পেলো চিরস্থায়ী আসন। জীবনের এই জটিল ও দুর্নিবার আকর্ষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) গ্রন্থে বিকারের নেতিবাচকতা হিসেবে উন্মোচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* (১৩৩৬)[১৪] উপন্যাসে তা শিল্পিত ও মানবিক। তবে *শেষের কবিতায়* যে আধুনিক চিন্তাজগৎ তা তারাশঙ্করে অনুপস্থিত, তাঁর সমাজনিষ্ঠা ও শৈল্পিক আবেগ সমন্বিতভাবে দ্বন্দ্ব-মীমাংসায় সচেতন ; সামাজিক ঘূর্ণির গতিশীলতা অনুধাবন করতে গিয়েই তিনি শিল্পী।

চার

তারাশঙ্কর দাবি করেছেন তিনি বিদ্রোহের নন, বিপ্লবের ; কেননা বিপ্লবে সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকে। তাঁর সকল লেখার পরিসমাপ্তিতে সৃষ্টিশীল স্থিতি বিদ্যমান এবং এ-ভাবে তিনি কল্লোল-গোষ্ঠী থেকে পৃথক। এ অভিমতের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর-মানসের দ্বিধা অতিক্রমের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যদিও বিপ্লব সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি একান্ত ভাবেই তারাশঙ্করের। তবু শিল্পের রসাস্বাদন উপলব্ধিতেই সম্ভব এবং তা মানবীয় কৃৎকৌশল বিস্তারেই লভ্য। সেই বিচারে 'রসকলি' জীবন্ত, বহুকৌণিক আলো বিচ্ছুরণে উজ্জ্বল। গল্পের পটভূমিসহ প্রতিটি চরিত্র একে অন্যের সঙ্গে বিচিত্র সংঘর্ষে লিপ্ত এবং তা উদ্দেশ্যমুখী, মানবীয় মিলনে পরিসমাপ্ত। গল্পের অনিবার্য মীমাংসায় সামাজিক ও শিল্পী তারাশঙ্কর-এর দ্বৈতসত্তাই সমভাবে উপস্থিত। সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে শিল্পী-

তারাশঙ্কর, তাঁর মুক্তি ঘটেছিল 'রসকলি' গল্পের মধ্য দিয়ে, সেই সূত্রেই গল্পটি শিল্পীর মানস-প্রতিমা, জীবন ও সামাজিক স্থিতি-শান্তির আকাঙ্ক্ষায় যা পূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ

১ তারাশঙ্কর কল্লোলযুগ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে পার্থক্য আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনো দিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।'—*আমার সাহিত্য জীবন*, দ্বি. স. ১৩৬৪, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৭৭

২ বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে ভীষ্মদেব চৌধুরীর *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি* (১৯৯৮) গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। 'তারাশঙ্করের জীবনদর্শনের উৎস ও স্বরূপ' উপশিরোনামাঙ্কিত এ-অংশে তিনি সময়-সমাজপ্রতিবেশ, ভূ-প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত, ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তবতা আলোচনা করে তারাশঙ্করের জীবনদর্শনে যে দ্বন্দ্ব তা চিহ্নিত করেছেন।

৩ তারাশঙ্কর একজন সফল নাট্যকারও ছিলেন। তবে 'রসকলি' রচনার সমকালে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ব্যর্থতা এসেছিল ; তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চে।

৪ *আমার সাহিত্য জীবন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৮ দুটি গল্পই *কালিকলম* পত্রিকার ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৯ *আমার সাহিত্য জীবন,* পৃ. ২০

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

১২ গল্পটি লিখিত হয় আষাঢ় ১৩২১ বঙ্গাব্দে। এতে আনন্দী বোষ্টমীকে তার পারিবারিক গুরু বলেছিলেন, 'তোমার দেহখানি সুন্দর'। তারপর থেকে তার মনে হয়, 'আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।'

১৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নতুনতর নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে বিবেচনা করেছেন। নারী প্রেমের অধিকার ভোগ করে দেহের শুচিতা ও সামাজিক প্রথাকে রক্ষা করে এবং সেখানে দেহ-বিযুক্ত প্রেমই বড় প্রেম—'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।' [*শ্রীকান্ত* প্রথম খণ্ড, ১৯১৭]

১৪ *শেষের কবিতা* উপন্যাসে অমিতের প্রেম ছিল লাবণ্যের সঙ্গে কিন্তু বিয়ে হলো কেতকীর সঙ্গে। অমিতের মন্তব্যে এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা :
[ক] 'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।'
[খ] 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট–১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৮৯৮ ১৩০৫	৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) সূর্যোদয়ের প্রাক্-লগ্নে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে জন্ম। ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্ম বলে শাস্ত্রবিধানে জন্মদিন ৭ শ্রাবণ। পিতা : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১১ পৌষ ১২৭১–মৃ.১৩১২), জননী : প্রভাবতী দেবী (১২৮৭–১৩৭৬)। পিতামহ : দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃ. ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০১), পিতামহী : মানদাসুন্দরী। প্রপিতামহ : রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রপিতামহী : উমাময়ী দেবী। লেখক ছদ্মনাম : কামন্দক। ৭ মাঘ বৈদ্যনাথ ধামের নির্মাল্য দিয়ে অন্নপ্রাশন। তারাশঙ্কর নামকরণ। ডাক নাম হবু।
১৯০৩ ১৩১০	হাতেখড়ি।
১৯০৫ ১৩১২	বাল্যবন্ধু বড়–পাঁচু সহযোগে সপ্তম-বর্ষ উত্তীর্ণ তারাশঙ্করের প্রথম কবিতা রচনা। ৯ আশ্বিন পিতৃবিয়োগ। ৩০ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হওয়ার দিনে লাভপুরে জননী প্রভাবতী কর্তৃক রাখিবন্ধন।
১৯১৪-১৫ ১৩২১	প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য।
১৯১৫-১৬ ১৩২২	লাভপুর যাদবলাল এইচ. ই. স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি। কলেজ পরিবর্তন করে সাউথ সাবআরবান কলেজে প্রবেশ। ভগ্নস্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অসমাপ্ত। ১০ মাঘ কনিষ্ঠ সহোদরা কমলার (জ. ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩১১-মৃ. ১৩৯১) সঙ্গে স্বগ্রামের বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে। ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) লক্ষ্মীনারায়ণের বোন উমাশশীর সঙ্গে পরিণয়। স্ত্রীর ডাক নাম ফন্টি।
১৯১৭ ১৩২৪	কিছুদিনের জন্য পুলিশের নজরবন্দি হয়ে চলাফেরা।
১৯১৮ ১৩২৫	জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯১৮-৭৮) জন্ম।
১৯২১ ১৩২৮	অহিংস–অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। গান্ধীতত্ত্বে আস্থাস্থাপন।

১৯২২ ১৩২৯	কনিষ্ঠপুত্র সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।
১৯২৪ ১৩৩১	গঙ্গার জন্ম।
১৯২৬ ১৩৩২	অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় কন্যা বুলুর (১৯২৬-৩২) জন্ম।
১৯২৭ ১৩৩৩	লাভপুর থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র *পূর্ণিমা*-র সহ-সম্পাদক। পত্রিকাটির ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'মুকুন্দের মজলিস'-এর আত্মপ্রকাশ।
১৯২৮ ১৩৩৪	*কল্লোল* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় গল্প 'রসকলি'-র প্রকাশ এবং রসজ্ঞমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ। *কালিকলম* পত্রিকায় *চৈতালী ঘূর্ণি*-র 'বীজগল্প' 'শ্মশানের পথে'র আত্মপ্রকাশ।
১৯২৯-৩০ ১৩৩৬	*উপাসনা* পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে *চৈতালী ঘূর্ণি*-র প্রকাশ (কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৬)।
১৯৩০ ১৩৩৭	আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কারাবরণ। জেলখানায় *চৈতালী ঘূর্ণি* ও *পাষাণপুরী* উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। ডিসেম্বরে (১৯৩০) আইন-অমান্য আন্দোলনের কারাবন্দি তারাশঙ্করের মুক্তিলাভ। সক্রিয় দলীয় রাজনীতির সংস্রব পরিত্যাগের এবং সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে দেশসেবা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা।
১৯৩১-৩২ ১৩৩৮	বোলপুরে মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা। বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষী হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে অভিভূত তারাশঙ্কর।
১৯৩২-৩৩ ১৩৩৯	৭ অগ্রহায়ণ দ্বিতীয় কন্যা বুলুর মৃত্যু। শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পল্লিকর্মী সম্মেলনে লাভপুর সেবাসংঘের প্রতিনিধিরূপে সদ্য কন্যাশোকগ্রস্ত তারাশঙ্করের যোগদান। প্রথম রবীন্দ্রসন্দর্শন। পল্লির পুনর্গঠন প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-ভাষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। কনিষ্ঠ কন্যা বাণীর (১৯৩২–) জন্ম। নিজস্ব প্রেসে সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র মুদ্রণের অভিযোগে উত্থাপিত মামলায় তিরস্কৃত। বন্ড প্রদান সাপেক্ষে প্রেস চালু রাখার আদেশ। শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বারের মতো রবীন্দ্র-সন্দর্শন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শন শেষে শান্তিনিকেতন-প্রত্যাগত তারাশঙ্করের বোলপুর স্টেশনে আকস্মিক সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে সরকারকে বন্ড না দেওয়ার এবং প্রেস প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

	শনিবারের চিঠি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান। কলকাতার মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনে টিনের ছাউনি দেয়া ঘর ভাড়া করে বসবাস এবং পেশাজীবী সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা।
১৯৩৫ ১৩৪১	লাভপুরের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে প্রথম সংবর্ধনা লাভ।
১৯৩৭-৩৮ ১৩৪৪	রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসাসূচক পত্র (১২ মার্চ ১৯৩৭) প্রাপ্তি। লাভপুরবাসীদের প্রদত্ত দ্বিতীয় সংবর্ধনা।
১৯৩৮ -৩৯ ১৩৪৫	প্রথম ফাউন্টেন পেন ক্রয়।
১৯৪০-৪১ ১৩৪৭-৪৮	বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের ভাড়াবাড়িতে সপরিবারে বসতি স্থাপন। এক বছরের মধ্যেই উত্তর কলকাতার বরানগরে স্থানান্তর। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে *কালিন্দী* নাটকের মঞ্চায়ন।
১৯৪২-৪৩ ১৩৪৯	বরানগর থেকে বাগবাজার এলাকায় প্রত্যাবর্তন। জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গার (১৯২৪) বিবাহ ; জামাতা শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-৬২)। বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলন-এর সাহিত্য অধিবেশনে পৌরহিত্য। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সভাপতি–পদ গ্রহণ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে *দুই পুরুষ* নাটকের মঞ্চায়ন।
১৯৪৩- ৪৪ ১৩৫০	জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিবাহ ; পুত্রবধূ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। পিপলস ফ্লাড কমিটির সভাপতি, পিপলস্ রিলিফ কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য। কানপুর প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন (১৯৪৪)-এর সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পৌরহিত্য।
১৯৪৬-৪৭ ১৩৫৩-৫৪	standard-12 মডেলের গাড়ি ক্রয়।
১৯৪৭- ৪৮ ১৩৫৪	জুলাই ১৯৪৭-এ পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলার লেখকসম্প্রদায় কর্তৃক সংবর্ধিত। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে মা, পিসিমা এবং গ্রামবাসীর আহ্বানে স্বগ্রাম লাভপুরে গমন ও স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন। কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর (১৯৪৭) উদ্বোধন। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাস রচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি পদক প্রাপ্তি (১৯৪৭)।
১৯৪৮-৪৯ ১৩৫৫	রথযাত্রার দিনে টালা পার্কের নবনির্মিত বাড়িতে প্রবেশ। বৈদ্যনাথ ধামে ভ্রমণ।

	৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে স্বপ্নভঙ্গ। ২২ ফাল্গুন তারিখে কনিষ্ঠপুত্র সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৯২২) বিবাহ ; পুত্রবধূ বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভপুরবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। *সন্দীপন পাঠশালা* উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ এবং প্রদর্শনের জন্য মুক্তিলাভ। চলচ্চিত্রটিতে মাহিষ্য-সম্প্রদায়কে হীনভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগে ২৩চৈত্র (১০ এপ্রিল ১৯৪৯) তারিখে হাওড়ার মাহিষ্য-সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে শারীরিকভাবে আহত ও লাঞ্ছিত।
১৯৫০-৫১ ১৩৫৭	পিসিমা শৈলজা দেবীর মৃত্যু (জুন ১৯৫০)। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।
১৯৫২ ১৩৫৯	১ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য মনোনীত।
১৯৫৪-৫৫ ১৩৬০-৬১	৭ শ্রাবণ তারিখে জননী প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ। *তরুণের স্বপ্ন* মাসিকপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির পদ গ্রহণ। কার্যকাল : চৈত্র ১৩৬০-১৩৬২।
১৯৫৫-৫৬ ১৩৬২	*আরোগ্য-নিকেতন* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত। চীনা লেখক লু-স্যুন-এর জন্মজয়ন্তীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে চীন-এর উদ্দেশে যাত্রা। অসুস্থতা হেতু রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তন।
১৯৫৬-৫৭ ১৩৬৩	*আরোগ্য-নিকেতন* উপন্যাসের জন্য 'অকাদেমী পুরস্কার' লাভ। চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ। *যুগান্তর* পত্রিকায় চাকুরি গ্রহণ।
১৯৫৭-৫৮ ১৩৬৪ ১৩৭০-৭১	কনিষ্ঠ কন্যা বাণীর (১৯৩২) বিয়ে ; জামাতা বিশ্বনাথ রায়। আফ্রো এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন। মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আহূত কাগমারী রাজনৈতিক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) ভারত সরকারের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান। মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে বৈঠক। মৌলানার আশ্চর্য ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। ফেরার পথে ঢাকায় সাহিত্যানুরাগী তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে তাসখন্দ গমন এবং আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান।
১৯৫৯-৬০ ১৩৬৫-৬৬	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'জগত্তারিণী পদক' প্রাপ্তি। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন। বিধান সভার সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ (৩১ মার্চ ১৯৬০)। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন লাভ (১ এপ্রিল ১৯৬০)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯৬০ ১৩৬৭	হাওড়ার ব্যাঁটড়াবাসীদের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন। লাভপুরবাসী কর্তৃক সংবর্ধনা।
১৯৬২-৬৩ ১৩৬৯-৭০	ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত (১৯৬২) 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত। জ্যেষ্ঠ জামাতা শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। এই মৃত্যুর আঘাতকে ভুলে থাকার জন্য ছবি আঁকায় এবং কাঠের খেলনা তৈরিতে আত্মনিয়োগ। 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ। স্বনামে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় সাপ্তাহিক উপসম্পাদকীয় কলাম 'গ্রামের চিঠি'র প্রকাশনা আরম্ভ (২৭ জুলাই ১৯৬৩)।
১৯৬৪ ১৩৭০-৭১	১৪-২৩ আগস্ট কলকাতার একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস ভবনে রানু মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় তারাশঙ্কর অঙ্কিত চিত্রাবলি ও কাটকুটায় নির্মিত মূর্তির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত।
১৯৬৫-৬৬ ১৩৭২-৭৩	রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ। নাগপুরে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন।
১৯৬৭-৬৮ ১৩৭৩-৭৪	'জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে' সম্মানিত। 'কলকাতা কর্পোরেশন' আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা। একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস ভবনে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন। সত্তরতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে সংবর্ধনা সভায় (৮-৯ শ্রাবণ ১৩৭৪) প্রাচ্যবাণী পরিবেশিত নাট্যানুষ্ঠান 'তারাশঙ্কর'।
১৯৬৮-৬৯ ১৩৭৫-৭৬	ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ (১৯৬৮)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান (১৯৬৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান (১৯৬৯)। ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯ তারিখে জননী প্রভাবতী দেবীর মৃত্যু।
১৯৬৯-৭০ ১৩৭৬-৭৭	সাহিত্য অকাদেমী প্রদত্ত ফেলোশিপ লাভ (১৯৬৯)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সভাপতির পদ গ্রহণ এবং পরিষদের ত্রৈমাসিক গবেষণাপত্র *শতরূপা*-র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন। চতুর্থবারের মতো লাভপুরবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন (১৯৭০)। নকশালপন্থিদের হত্যা-পরিকল্পনায় তারাশঙ্করের নাম।
১৯৭১ ১৩৭৮	বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র–স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান (১৪-১৮ ফেব্রুয়ারী)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এল. রায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত। কিন্তু অনুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বেই মৃত্যুবরণ। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে তাঁর লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে অনুকূল জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ। 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী সমিতি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন।
২৮ ভাদ্র ১৩৭৮, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৬-৪২ মিনিটে জীবনাবসান। উত্তর কলকাতার নিমতলা শ্মশানে জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার কর্তৃক মরদেহে মুখাগ্নি প্রদান ও দাহ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের গভীর শোক ও মুক্তিযুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর জন্য বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক মরণোত্তর ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান।

সংকলক : ভীষ্মদেব চৌধুরী

তথ্য–উৎস :

আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯ ভাদ্র ১৩৭৮, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
'আমার কথা' (*শনিবারের চিঠি*, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১৩৭১) : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার কালের কথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার পিতা তারাশঙ্কর : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার সাহিত্য জীবন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রামের চিঠি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা (কলকাতা: নবার্ক ১৯৮৭): রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য : সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক
তারাশঙ্কর-রচনাবলী প্রথম খণ্ড – চতুর্বিংশ খণ্ড
তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৯৪) : গৌরমোহন রায়
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড : সম্পাদক ; জগদীশ ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-সংখ্যা ১৪০৪ (জুলাই-আগস্ট ১৯৯৭)
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ / দলিল পত্র : দ্বাদশ খণ্ড
শনিবারের চিঠি : তারাশঙ্কর সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১
সাহিত্য ও সংস্কৃতি : তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা ১৩৯৯
TARASANKAR BANDYOPADHYAY : Mahasveta Devi.

পরিশিষ্ট–২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি

১৯২৬ *ত্রিপত্র* (কাব্যগ্রন্থ) ; প্র. প্র : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬। উৎসর্গ : নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৮/বি লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা।

১৯৩১ *চৈতালী ঘূর্ণি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩১, আশ্বিন ১৩৩৮। উৎসর্গ : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। মুদ্রণালয় : উপাসনা প্রেস।

১৯৩৩ *নীলকণ্ঠ* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৩, আশ্বিন ১৩৪০। উৎসর্গ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা। উপন্যাসটি প্রথমে *উপাসনা* পত্রিকায় *যোগ-বিয়োগ* নামে পর্যায়ক্রমে (বৈশাখ-পৌষ ১৩৩৯) প্রকাশিত হয়।

পাষাণপুরী (উপন্যাস) ; প্র. প্র : জুলাই ১৯৩৩, আষাঢ় ১৩৪০। প্রকাশক : বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে *অভ্যুদয়* পত্রিকায় আংশিক এবং পরে *নবশক্তি*-তে সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ *রাইকমল* (উপন্যাস) ; প্র. সং : আশ্বিন ১৩৪১। উৎসর্গ : শ্রীমতি উমা দেবী [উমাশশী দেবী]। প্রকাশক : শ্রী সজনীকান্ত দাস, রঞ্জন প্রকাশালয়, কলকাতা। সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় ১৯৫৫ সনে *রাইকমল* চলচ্চিত্রায়িত হয়। *রাইকমল*–এর ইংরেজি অনুবাদ *দি ইটারন্যাল লোটাস্* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। 'রাজাতামরি' নামে তামিল অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সনে।

১৯৩৬ *প্রেম ও প্রয়োজন* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩৬, আষাঢ় ১৩৪২। উৎসর্গ : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা। উপন্যাসটি দশ কিস্তিতে *উপাসনা* পত্রিকায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ–চৈত্র সংখ্যায় 'বেসাতী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার সময় পরিবর্তিত নাম হয় *প্রেম ও প্রয়োজন*।

ছলনাময়ী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৩৬, বৈশাখ ১৩৪৩। উৎসর্গ : 'প্রয়াত কন্যা বুলুর উদ্দেশে উৎসর্গিত'। প্রকাশক : বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা।

১৯৩৭ *জলসাঘর* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৪৪। উৎসর্গ : দুর্গাশঙ্কর ও পার্বতীশঙ্কর [বন্দ্যোপাধ্যায়]। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। গ্রন্থটির নাম গল্প 'জলসাঘর'-এর চলচ্চিত্ররূপ দেন সত্যজিৎ রায়।

আগুন (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (১৩৪৪)। উৎসর্গ : 'পিতৃদেবতার চরণোদ্দেশে'। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। উপন্যাসটি প্রথমে *কালপুরুষ* নামে সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৯ শ্রাবণ থেকে ২১ কার্তিক পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের চিত্ররূপ দেন অসিত সেন।

১৯৩৯ *রসকলি* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৪৫ (১৯৩৯)। উৎসর্গ : 'কবিগুরু/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীচরণেষু'। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

ধাত্রী দেবতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৪৬ (১৯৩৯)। উৎসর্গ : 'আমার মা ও পিসীমার শ্রীচরণে'। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। উপন্যাসটির অসমাপ্ত আদি-লেখন সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *বঙ্গশ্রী* মাসিকপত্রে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন দুই সংখ্যায় 'জমিদারের মেয়ে' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস *বঙ্গশ্রী* ত্যাগ করে *শনিবারের চিঠি* প্রকাশ করলে নতুন পরিকল্পনা ও অবয়বে *ধাত্রী দেবতা* নামে উপন্যাসটি ঐ-পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪৫ থেকে ভাদ্র ১৩৪৬ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সনে উপন্যাসটি 'ধরতি মাতা' নামে হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়। 'নীলাঙিনগীতম' নামে এর তামিল অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সনে। *ধাত্রী দেবতা*-র চলচ্চিত্ররূপ দেন কালীপ্রসাদ ঘোষ।

১৯৪০ *কালিন্দী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০)। উৎসর্গ : 'বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের করকমলে'। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। *প্রবাসী* পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৪৬ থেকে ভাদ্র ১৩৪৭ পর্যন্ত *কালিন্দী* পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। *কালিন্দী*-র বীজগল্প 'মা' *পরিচয়* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *যাদুকরী* (ফাল্গুন ১৩৫০) গল্পগ্রন্থে সংকলিত এ-গল্পটির নাম 'ফল্গু'। উপন্যাসটি অভিন্ন নামে সিন্ধি এবং হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয় যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৫১ এবং ১৯৭১ সনে।

বেদেনী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৪৭। উৎসর্গ 'পরিব্রাজক শ্রীনির্মলকুমার বসু করকমলেষু'। প্রকাশক : ভারতীভবন, কলকাতা।

১৯৪২ *কবি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৪৮ (মার্চ ১৯৪২)। উৎসর্গ : 'সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু'। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে *কবি* পাটনা থেকে প্রকাশিত ও মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত *প্রভাতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসটির বীজগল্প 'কবি' *প্রবাসী* মাসিকপত্রের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের একটি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। অভিন্ন নামে উপন্যাসটি ১৯৫৪ সনে হিন্দিতে এবং ১৯৭৩ সনে ওড়িয়াতে অনূদিত হয়। *কবি* উপন্যাসের চলচ্চিত্রকার দেবকী বসু।

তিনশূন্য (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪২।

কালিন্দী (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৪২। *কালিন্দী*-র নাট্যরূপকে চলচ্চিত্র-রূপ দেন নরেশ মিত্র।

দুই পুরুষ (নাটক) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৪৯ (১৯৪২)। উৎসর্গ : 'পরম কল্যাণীয়/শ্রীমান শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়/শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/শ্রীমান সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১৯৪৩

পথের ডাক (নাটক) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)। উৎসর্গ : 'সুকবি/শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য/প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

গণদেবতা (উপন্যাস); প্র. প্র. : ২০কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী করকমলেষু'। প্রকাশক : শান্তিরঞ্জন সোম, ৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ থেকে চৈত্র ১৩৪৮ সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নামে উপন্যাসটি প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার সময় পরিবর্তিত নাম হয় *গণদেবতা*। এতে *ভারতবর্ষে* মুদ্রিত উপন্যাসটির প্রথম আশি পৃষ্ঠা অপরিবর্তিত থাকলেও অবশিষ্ট রচনা সম্পূর্ণ নতুন করে লিখিত। উপন্যাসটির সিন্ধি অনুবাদ 'লোকদেবতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সনে। ১৯৭৩ সনে 'গণদেবতা' নামে মালয়ালম ভাষায় এবং 'চণ্ডীমণ্ডপ' নামে মারাঠি ভাষায় অনূদিত হয়। *গণদেবতা*-র চলচ্চিত্রকার তরুণ মজুমদার।

প্রতিধ্বনি (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৩। উৎসর্গ : জগদ্বন্ধু দত্ত।

দিল্লী কা লাড্ডু (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র : ১৯৪৩।

১৯৪৪

মন্বন্তর (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৫০ (জানুয়ারি ১৯৪৪)। উৎসর্গ : 'বন্ধুবর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)/ পরম প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : মিত্রালয়, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩) *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় *মন্বন্তর* প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ইংরেজি অনুবাদ *Epoch's End* (১৯৪৪)। এর হিন্দি অনুবাদ ১৯৭২ সনে প্রকাশিত হয় *মন্বন্তর* নামেই।

পঞ্চগ্রাম (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪)। উৎসর্গ : 'পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু'। প্রকাশক:

কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। 'পঞ্চগ্রাম' *গণদেবতা*-র অনুবর্তী উপন্যাস। 'পঞ্চগ্রাম' নামেই এটি *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

যাদুকরী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৫০ (১৯৪৪)। উৎসর্গ : শিশির মল্লিক।

স্থলপদ্ম (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৪। উৎসর্গ : পশুপতি ভট্টাচার্য।

১৩৫০ (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৫১ (১৯৪৪)। উৎসর্গ : 'মহাত্মা গান্ধীকে/২রা অক্টোবর ১৯৪৩'। প্রকাশক : [?]

১৯৪৫ *বিংশ শতাব্দী* (নাটক) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫১ (১৯৪৫)।

চকমকি (প্রহসন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

দ্বীপান্তর (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫। উৎসর্গ : দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

প্রসাদমালা (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫।

হারানো সুর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫। উৎসর্গ : সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটির নাম গল্প 'হারানো সুর'-এর চলচ্চিত্ররূপ দেন সুশীল মজুমদার।

১৯৪৬ *সন্দীপন পাঠশালা* (উপন্যাস) ; প্র.প্র. : মাঘ ১৩৫২ (১৯৪৬)। উৎসর্গ : 'সাহিত্যিক অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী/শ্রীচরণেষু/বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য মহাস্থবির, আমাদের স্নেহময় বুড়োদা/তোমার মত স্নেহময় সত্যকারের দাদা জগতে দুর্লভ। তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি—'। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি *উদয়াস্ত* নামে *দৈনিক কৃষক* পত্রিকার ১৩৫২ বঙ্গাব্দের (১৯৪৫) শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ কালে তারাশঙ্কর এর আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। *সন্দীপন পাঠশালা* উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ঝড় ও ঝরাপাতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ (নভেম্বর ১৯৪৬)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা। গ্রন্থিত হওয়ার পূর্বে উপন্যাসটি *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৫২ থেকে আষাঢ় ১৩৫৩ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিকের জীবদ্দশাতেই *ঝড় ও ঝরাপাতা*-র শিরোনামা পরিবর্তিত হয়ে *কালবৈশাখী* নামকরণ হয় এবং প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা থেকে প্রকাশ পায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, জুন ১৯৬৩)।

অভিযান (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : পৌষ ১৩৫৩ (১৯৪৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। উৎসর্গ ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৫২ বঙ্গাব্দের মাসিক *পরিচয়*-এ উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির চলচ্চিত্ররূপ দেন সত্যজিৎ রায়।

১৯৪৭ *ইমারত* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭। উৎসর্গ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামধনু (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ . ; প্র. প্র. : ১৯৪৭।

শ্রীপঞ্চমী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭। উৎসর্গ 'রাণী মা'

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)। উৎসর্গ : 'পরম শ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায়/শ্রদ্ধাস্পদেষু/দাদা/রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে। ইতি'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু কলকাতার তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার ঐ সংখ্যা প্রচারিত হয় ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ।

১৯৪৮ *সন্দীপন পাঠশালা* (কিশোর সংস্করণ) ; প্র. প্র. : ১৯৪৮।

তামস তপস্যা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৮)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়/শ্রদ্ধাস্পদেষু'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৯৪৯ *কামধেনু* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৯ (ভাদ্র ১৩৫৫)।

১৯৫০ *পদচিহ্ন* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৫৭ (এপ্রিল ১৯৫০)। উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রিয়বরেষু'। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

মাটি (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫০।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৫০।

১৯৫১ *আমার কালের কথা* (আত্মজীবনী) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৫৮ (১৯৫১)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান/শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/নীরেন চক্রবর্তী/নরেন মিত্র/অনুজ প্রতিমেষু / তোমরাই আমার ক্ষীর-সাগরের

হংসের দল। তোমাদের কথাই আছে আমার কালের কথার প্রারম্ভে। তোমাদের আগ্রহেই আমার কালের কথা লেখার সংকোচ আমি কাটাতে পেরেছি। এর নিন্দা প্রশংসা লজ্জা যা প্রাপ্য আমিই নেব হাত পেতে। তার ফলে আমার অন্তরের সুখ দুঃখ যেটুকু, সেটুকুর ভাগ নেবে তোমরা, বইখানি তাই তোমাদের হাতেই দিলাম'। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *আমার কালের কথা* সাহিত্যপত্র *কথাসাহিত্যে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

যুগবিপ্লব (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৫১। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

১৯৫২

উত্তরায়ণ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৫২। উৎসর্গ : 'প্রবোধকুমার সান্যাল/করকমলেষু'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। উপন্যাসটির সিন্ধি অনুবাদ 'আরতি' ১৯৫৮ সনে প্রকাশিত হয়। অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্র রূপ পায়।

শিলাসন (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫২। উৎসর্গ : প্রমথনাথ বিশী।

১৯৫৩

নাগিনী কন্যার কাহিনী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৫৯। উৎসর্গ : 'শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রী সন্তোষ ঘোষ, শ্রী অনিল চক্রবর্তী *স্নেহাস্পদেষু*'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। The Times of India-র বাংলা দৈনিক *সত্যযুগ*-এর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র প্রথম ভাগ 'শবলার কথা' প্রথম মুদ্রিত হয়। উত্তরকালে দ্বিতীয় ভাগ 'পিঙ্গলার কথা' যুক্ত হয়ে সমগ্র উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র চলচ্চিত্ররূপ দেন সলিল সেন।

আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৫৯ (এপ্রিল ১৯৫৩)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত মনোজ বসু/করকমলেষু'। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। উপন্যাসটি 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রথম প্রকাশিত হয়। *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে' ভূষিত হন। একই উপন্যাসের জন্য ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন অকাদেমী পুরস্কার। তারাশঙ্করের জীবদ্দশাতেই সাহিত্য অকাদেমী মালয়ালম হিন্দি গুজরাটি (১৯৬০) মারাঠি পাঞ্জাবি সিন্ধি তামিল ও তেলেগু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। উপন্যাসটির চলচ্চিত্ররূপ দেন বিজয় বসু।

বিচিত্র স্মৃতি কাহিনী (স্মৃতিকথা) ; প্র. প্র. : ১৯৫৩।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়গল্প (বাছাই গল্পর-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৫৩।

১৯৬৪ *আমার সাহিত্য জীবন* ১ম খণ্ড (আত্মজীবনী) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬০। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

স্বর্গ-মর্ত (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৫৪। উৎসর্গ 'ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত/অনুজ প্রতিমেষু'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

স্ব-নির্বাচিত গল্প (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫৪।

১৯৫৫ *চাঁপাডাঙার বৌ* (উপন্যাস) ; প্র. প্র.: শ্রাবণ ১৩৬১। উৎসর্গ : 'শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/স্নেহভাজনেষু'। প্রকাশক [?]। *চাঁপা ডাঙার বৌ*-কে চলচ্চিত্ররূপ দেন নির্মল দে। উপন্যাসটির বীজগল্প 'বড় বৌ' *উপাসনা* পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্প সঞ্চয়ন (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৫৫।

বিস্ফোরণ (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র : ১৯৫৫। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৯৫৬ *কৈশোর স্মৃতি* (স্মৃতিকথা) ; প্র. প্র. : ১৯৫৬। উৎসর্গ : লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বিচারক (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৩ (আগস্ট ১৯৫৬)। উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু / শ্রদ্ধাভাজনেষু'। প্রকাশক : তুলিকলম, কলকাতা। ১৯৬০ সনে 'ন্যায়াধিপতি' নামে উপন্যাসটি তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়। এর মালয়ালম অনুবাদ 'জাজজী' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সনে। উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্ররূপ দেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চপুত্তলী (উপন্যাস) ; ভাদ্র ১৩৬৩। উৎসর্গ : 'উমার করকমলে তারাশঙ্কর'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা *তরুণের স্বপ্নে পঞ্চপুত্তলী* প্রকাশিত হয়েছিলো।

ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (ছোটদের বাছাই করা গল্পের সংকলন) ; প্র. প্র. ; ১৯৫৬।

কালান্তর (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৬৩ (১৯৫৬)। গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। প্রকাশক : [?] গ্রন্থাবদ্ধ / হওয়ার পূর্বে উপন্যাসটি *শনিবারের চিঠি*-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'কালান্তর' *পদচিহ্ন*-র অনুবর্তী উপন্যাস।

কালাভং (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৬৩।

১৯৫৭ *কবি* (নাট্যরূপ) ; প্র. প্র. : ১৯৫৭। উৎসর্গ : 'মোহিতলালের স্মৃতির উদ্দেশে'।

কালরাত্রি (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৫৭।

বিষপাথর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫৭। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

১৯৫৮ *সপ্তপদী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : পৌষ ১৩৬৪ (১৯৫৮)। উৎসর্গ : বিমল সিংহ। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় *সপ্তপদী* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। অভিন্ন নামে উপন্যাসটির তেলেগু অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সনে। অজয় কর-এর পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয় উপন্যাসটি।

বিপাশা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৬৪ (১৯৫৮)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান রমাপদ চৌধুরী / কল্যাণীয়েষু'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় *বিপাশা* চলচ্চিত্রায়িত (১৯৬২) হয়। অভিন্ন নামে উপন্যাসটির তেলেগু অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সনে।

রাধা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৬৪ (মার্চ ১৯৫৮)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র/পরমমিত্রবরেষু'। প্রকাশক : ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে উপন্যাসটি *শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯ *মানুষের মন* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৬৫।

ডাকহরকরা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৫ (এপ্রিল ১৯৫৯)। গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয় নি। উপন্যাসটির বীজগল্প 'ডাকহরকরা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসী-তে প্রকাশিত হয় এবং *জলসাঘর* গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। অগ্রগামী গোষ্ঠীর পরিচালনায় মূল গল্পটি চলচ্চিত্রায়িত হয়।

রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড (উপন্যাস–নাটক–গল্পের সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৩৬৫।

রবিবারের আসর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৫ (জুলাই ১৯৫৯)।

মস্কোতে কয়েকদিন (ভ্রমণকাহিনী) ; প্র. প্র : আশ্বিন ১৩৬৫ (১৯৫৯)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত মুল্‌করাজ আনন্দ/প্রিয়বরেষু'। প্রকাশক : অভিজিৎ প্রকাশনী, কলকাতা।

১৯৬০ *যোগভ্রষ্ট* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়/শ্রদ্ধাভাজনেষু'। প্রকাশক : ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের পূজা সংখ্যা *উল্টোরথ* পত্রিকায় *যবনিকা* নামে উপন্যাসটি প্রথম মুদ্রিত হয়।

মহাশ্বেতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র : আষাঢ় ১৩৬৭ (১৯৬০)। উৎসর্গ : 'শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র/ প্রীতি ও স্নেহভাজনেষু'। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। হীরেন নাগ-এর পরিচালনায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়।

না (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ (১৯৬০)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়'। উপন্যাসটি 'ইভানাল্লা' নামে কন্নড় ভাষায় অনূদিত হয় ১৯৬৭ সনে।

পৌষলক্ষ্মী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)। প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। *১৩৫০* গল্পগ্রন্থের পরিবর্তিত নাম *পৌষলক্ষ্মী*। তবে এতে নতুন দুটি গল্প যোগ করা হয়।

সাহিত্যের সত্য (প্রবন্ধ সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬০। প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৯ এন্টলি বাগান লেন, কলকাতা-৯।

আলোকাভিসার (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৬৭। প্রকাশক : উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

১৯৬১ *প্রেমের গল্প* (বাছাই গল্প-সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬১।

নাগরিক (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৬১।

১৯৬২ *নিশিপদ্ম* (উপন্যাস) ; প্র. প্র : মাঘ ১৩৬৮ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)। গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গিত হয়নি। প্রকাশক : বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে *নবকল্লোল* পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় *নিশিপদ্ম* প্রকাশিত হয়েছিল।

অ্যাকসিডেন্ট (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬২।

সংঘাত (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৬২।

ছোটদের ভালো ভালো গল্প (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. ১৯৬২।

চিরন্তনী (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৬৮।

১৯৬৩ *কান্না* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৯। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাশগুপ্ত/ পরম প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা। *কান্না* উপন্যাসের বীজ–কাহিনী দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত 'অভিষেক' বার্ষিকীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা *নবকল্লোলে* উপন্যাস আকারে মুদ্রিত হয়। ১৯৬২ সনে অগ্রগামীর পরিচালনায় *কান্না* চলচ্চিত্রায়িত হয়। *কান্না*–র হিন্দি অনুবাদ 'রতিবিলাপ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সনে।

যতিভঙ্গ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৬৯। উৎসর্গ :'শ্রীমান বিশ্বনাথ রায়/ কল্যাণীয়েষু'। প্রকাশক : [?]

আমার সাহিত্য জীবন ২য় খণ্ড (আত্মজীবনী) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৯।

তমসা (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৩ (১৩৭০)।

কালবৈশাখী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ (জুন ১৯৬৩)। প্রকাশক : প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা। *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাসের পরিবর্তিত নাম *কালবৈশাখী।*

ভারতবর্ষ ও চীন (প্রবন্ধ) ; প্র. প্র. : ১৩৭০ (১৯৬৩)। প্রকাশক : এম. সি. সরকার, কলকাতা।

গল্প পঞ্চাশৎ (বাছাই গল্পের সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭০ (অক্টোবর ১৯৬৩)।

একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭০ (অক্টোবর ১৯৬৩)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় / গৌরবান্বিতেষু'। প্রকাশক : বাক্ সাহিত্য, কলকাতা। ১৩৭০ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা *সাতরঙ* পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

আয়না (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৩ (১৩৭০)। উৎসর্গ : বিনয় দাশগুপ্ত।

১৯৬৪ *জঙ্গলগড়* (ঐতিহাসিক রোম্যান্স) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৭০ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়/কল্যাণীয়েষু'। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।

চিন্ময়ী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৭১ (১৯৬৪)।

মঞ্জরী অপেরা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৭১ (১৯৬৪)। উৎসর্গ : 'ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজপ্রতিমেষু'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। উপন্যাসটির চলচ্চিত্ররূপ দেন অগ্রদূত গোষ্ঠী।

ভুবনপুরের হাট (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)। উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু / আপনি সত্যবান, আপনাকে প্রণাম'। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা।

সংকেত (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)। গ্রন্থটি কারও উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়নি। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

বসন্তরাগ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৭১ (১৯৬৪)। উৎসর্গ : 'শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / স্নেহাস্পদেষু'। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।

একটি প্রেমের গল্প (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৭১ (১৯৬৪)।

১৯৬৫ *বিচিত্রা* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৬৫ ।

গন্নাবেগম (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭২ (১৯৬৫)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান মধুসূদন মজুমদার/ স্নেহাস্পদেষু'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৯৬৬ *অরণ্য-বহ্নি* (ঐতিহাসিক রোম্যান্স) ; প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৬৬। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত/ প্রিয়বরেষু'। প্রকাশক : গ্রন্থম, কলকাতা।

হীরাপান্না (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ (১৯৬৬)।
গুরুদক্ষিণা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৭২ (১৯৬৬)। উৎসর্গ : 'শশীভূষণ নিয়োগী—/আমার শিক্ষাগুরু-শ্রেষ্ঠের/স্মৃতির উদ্দেশে—'। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। *গুরুদক্ষিণা* উপন্যাসের বীজগল্প 'হেডমাস্টার'।
কিশোর সঞ্চয়ন (গল্পসংগ্রহ) : প্র. প্র. : ১৯৬৬।

১৯৬৭ *তপোভঙ্গ* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৭৩। প্রকাশক : রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা।
দীপার প্রেম (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৭৩। গ্রন্থটির নাম-গল্পের চিত্ররূপ দেন অরুন্ধতী দেবী।
মহানগরী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭৩ (১৯৬৭)। উপন্যাসটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।
শক্করবাঈ (ঐতিহাসিক রোম্যান্স) ; প্র. প্র. : কার্তিক ১৩৭৪ (নভেম্বর ১৯৬৭)। উৎসর্গিত হয় নি। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা।
শুকসারী-কথা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৭৪ (১৯৬৭)। উৎসর্গ : 'শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। *শুকসারী-কথা* বিখ্যাত উপন্যাস *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র সম্প্রসারণ-প্রয়াস অথবা পরিশিষ্ট।
নারী রহস্যময়ী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৭ (১৩৭৪)। উৎসর্গ : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।
পাঞ্চকন্যা (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৭ (১৩৭৪)। প্রকাশক : রবীন্দ্র লাইব্রেরী।
শিবানীর অদৃষ্ট (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৭ (১৩৭৪)।

১৯৬৮ *গবিন সিংহের ঘোড়া* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৮।
জায়া (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৮।
আরোগ্য নিকেতন (নাট্যরূপ) ; প্র. প্র. : ১৯৬৮।

১৯৬৯ *মণি বউদি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৭৫। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ/সম্মানভাজনেষু'। প্রকাশক : বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি সাপ্তাহিক *অমৃত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
ছায়াপথ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭৬ (১৯৬৯)। উৎসর্গ : 'হজরত সারমাদের স্মৃতির উদ্দেশে'। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। *ছায়াপথ*-এর রচনাকাল ১৯৬০-৬৬। মাসিকপত্র *নবকল্লোলে* ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

এক পশলা বৃষ্টি (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৯। উৎসর্গ : সৈয়দ মুজতবা আলী।

ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (কিশোর গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৬৯।

মিছিল (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৯।

১৯৭০ *কালরাত্রি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : নববর্ষ ১৩৭৭ (এপ্রিল ১৯৭০)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান নির্মল খান/ কল্যাণীয়েষু'। প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।

রূপসী বিহঙ্গিনী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৭০। উৎসর্গ : শ্রীমতী সুধারাণী দেবী।

১৯৭১ *ফরিয়াদ* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১ বৈশাখ ১৩৭৮ (১৯৭১)। উৎসর্গ : 'শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষ / পরম কল্যাণীয়েষু'। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা। উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্ররূপ দেন বিজয় বসু।

অভিনেত্রী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯৭১)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী / প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯৭১ *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী* (প্রবন্ধ সংকলন) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৭৮ (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত / অশেষ প্রীতিভাজনেষু'। প্রকাশক : সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

শতাব্দীর মৃত্যু ১ম খণ্ড (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ (নভেম্বর ১৯৭১)। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা। *নবকল্লোল* পত্রিকার আশ্বিন ১৩৭৬ থেকে ভাদ্র ১৩৭৮ সংখ্যায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ (দুটি উপন্যাসের যুগলবন্দী) ; প্র. প্র. : ১৩৭৮ (১৯৭১)। উৎসর্গ : 'তারাশঙ্করের শেষ রচনা দুপার বাংলার / সকল বাঙালীর হাতে তাঁর শেষ অভিপ্রায় অনুসারে তুলে দেওয়া হল—'প্রকাশক'। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। *১৯৭১* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারাশঙ্কর রচিত সর্বশেষ দুটি উপন্যাস 'একটি কালো মেয়ের কথা' ও 'সুতপার তপস্যা'। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পূজা সংখ্যা *নবকল্লোল* পত্রিকায় 'একটি কালো মেয়ের কথা' এবং ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পূজাসংখ্যা *উল্টোরথে* 'সুতপার তপস্যা' প্রথম মুদ্রিত হয়।

১৯৭২ *ব্যর্থ-নায়িকা* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। প্রকাশক : বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা।

সখী ঠাকুরণ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী প্রথম খণ্ড ; প্র. প্র. : ৮ শ্রাবণ ১৩৭৯ (জুলাই ১৯৭২)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : এক ।। ঋজুদর্শী ঋতবাক্ তারাশঙ্কর ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা : দুই।। প্রমথনাথ বিশী। সংকলিত রচনা : *চৈতালী ঘূর্ণি, ধাত্রী দেবতা, না,* 'রসকলি', *ত্রিপত্র*।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ; প্র. প্র. : ৮ শ্রাবণ ১৩৭৯ (জুলাই ১৯৭২)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সংকলিত রচনা : *কালিন্দী, চাঁপাডাঙার বৌ, পাষাণপুরী,* 'সন্ধ্যামণি', 'লেখার কথা'।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড : প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭৯ (১৯৭২)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : তারাপদ মুখোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *গণদেবতা, রাইকমল,* 'জলসাঘর', 'যে বই লিখতে চাই।'

১৯৭৩ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সংকলিত রচনা : *পঞ্চগ্রাম, প্রেম ও প্রয়োজন,* 'কালাপাহাড়', 'বেদেনী', 'আমার চোখে তারাশঙ্কর'।

নবদিগন্ত (রাজনৈতিক রোম্যান্স) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড ; প্র. প্র. : ২২ শ্রাবণ ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য। সংকলিত রচনা : *আগুন, মন্বন্তর, নিশিপদ্ম, ছলনাময়ী,* 'রাধারাণী'।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড ; প্র. প্র. : ৬ ভাদ্র ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : পরিমল গোস্বামী। সংকলিত রচনা : *কবি, স্বর্গমর্ত, যোগভ্রষ্ট*।

১৯৭৪ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৮০ (১৯৭৪)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা : বাণী রায়। সংকলিত রচনা : *সন্দীপন পাঠশালা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা,* 'ডাইনী'।

কাঞ্চনী বিলের ধারে মালঞ্চার চর (কিশোর উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৮০। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা।

জনপদ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৮০। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। *জনপদ* আয়তনের দিক থেকে তারাশঙ্করের বৃহত্তম উপন্যাস ; গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬৪।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড ; প্র. প্র. : ২২ শ্রাবণ ১৩৮১ (১৯৭৪)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : সুমথনাথ ঘোষ। সংকলিত রচনা : *ঝড় ও ঝরাপাতা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কান্না,* 'যাদুকরী', 'আমি যদি আমার সমালোচক হতাম'।

১৯৭৫ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* নবম খণ্ড ; প্র. প্র. : ১ ফাল্গুন ১৩৮১ (১৯৭৫)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *অভিযান, পদচিহ্ন, যতিভঙ্গ,* 'বন্দিনী কমলা'।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী দশম খণ্ড ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৮২ (১৯৭৫)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *আরোগ্য নিকেতন, ডাকহরকরা, আমার কালের কথা*।

তারাশঙ্কর রচনাবলী একাদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৮২ (১৯৭৫)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সংকলিত রচনা : *পঞ্চপুত্তলী, সংকেত, মণিবউদি,* 'পৌষ-লক্ষ্মী', 'ভূত-পুরাণ'।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৮২ (১৯৭৫)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : আশাপূর্ণা দেবী। সংকলিত রচনা : *তামস-তপস্যা, বিচারক, গন্নাবেগম, বসন্তরাগ*।

১৯৭৬ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* ত্রয়োদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৮৩ (১৯৭৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *কীর্তিহাটের কড়চা* (১ম খণ্ড), *মঞ্জরী অপেরা* (১ম পর্ব), *বিপাশা।*

কীর্তিহাটের কড়চা ১ম ও ২য় খণ্ড (উপন্যাস) : প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৮৩ (১৯৭৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। উপন্যাসটি সাপ্তাহিক *অমৃত* পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। *অমৃত* পত্রিকায় প্রথম কিস্তির প্রথম প্রকাশ শুক্রবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ (চতুর্থ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা)।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড ; প্র. প্র. : কার্তিক ১৩৮৩ (১৯৭৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : মধুসূদন মজুমদার। সংকলিত রচনা : *কীর্তিহাটের কড়চা* (২য় খণ্ড), *মঞ্জরী অপেরা* (শেষার্ধ)।

১৯৭৮ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* পঞ্চদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৮৪ (১৯৭৮)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : প্রণয়কুমার কুণ্ডু। সংকলিত রচনা : *কীর্তিহাটের কড়চা* (৩য় খণ্ড), *রাধা*।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৮৫ (১৯৭৮)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। সংকলিত রচনা : *কীর্তিহাটের কড়চা* (শেষ খণ্ড), *সপ্তপদী, উত্তরায়ণ*।

১৯৭৯ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* সপ্তদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৮৬ (১৯৭৯)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সংকলিত রচনা : *মহাশ্বেতা, একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে, জঙ্গলগড়, মহানগরী*।

১৯৮০ *তারাশঙ্কর রচনাবলী* অষ্টাদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৮৭ (১৯৮০)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : হরপ্রসাদ মিত্র। সংকলিত রচনা : *ভুবনপুরের হাট, অরণ্য-বহ্নি*।

১৯৮১ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* ঊনবিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৮৮ (১৯৮১)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *হীরাপান্না, অভিনেত্রী, গুরুদক্ষিণা*।

১৯৮৩ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* বিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৮৯ (১৯৮৩)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : অরুণকুমার বসু। সংকলিত রচনা : *শুকসারী-কথা, ফরিয়াদ*, ১৯৭১।

১৯৮৪ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* একবিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৯১ (১৯৮৪)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *শতাব্দীর মৃত্যু, শঙ্করবাঈ*, 'ইতিহাস ও সাহিত্য'।

১৯৮৬ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* দ্বাবিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৯৩ (১৯৮৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : বিজিতকুমার দত্ত। সংকলিত রচনা : *নবদিগন্ত*, 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী', *দুই পুরুষ*।

১৯৮৮ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* ত্রয়োবিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৯৫ (১৯৮৮)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : পবিত্র সরকার। সংকলিত রচনা : *ছায়াপথ* (১ম খণ্ড), *মস্কোতে কয়েকদিন, পথের ডাক, দ্বীপান্তর*।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী চতুর্বিংশ খণ্ড ; প্র. প্র. : কার্তিক ১৩৯৫ (১৯৮৮)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। সম্পাদক : শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীসুমথনাথ ঘোষ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত রচনা : *ছায়াপথ* (২য় খণ্ড), *বিংশ শতাব্দী, কালান্তর*, 'দুর্যোগ', 'গান'।

১৯৯৭ *আমার সাহিত্য জীবন* (আত্মজীবনী) দুই পর্ব একত্রে ; আকাদেমী সংস্করণ: জুলাই ১৯৯৭। প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী,

সংকলক : ভীষ্মদেব চৌধুরী

পরিশিষ্ট–৩

তারাশঙ্কর-বিষয়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্য বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি* (কলকাতা: ১৯৯৯)

অমরেশ দাশ : *তারাশঙ্করের উপন্যাস* (কলকাতা : ১৯৯৮)

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য* (কলকাতা : ১৩৮৪)

উদয়চাঁদ দাস : *কবি তারাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের কবি* (কলকাতা ১৯৯৮)

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *পত্ররেখায় তারাশঙ্কর* (কলকাতা)

ক্ষেত্র গুপ্ত : *তারাশঙ্কর: অনুসন্ধান ৯৮* (কলকাতা :১৯৯৮)

গৌরমোহন রায় : *তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা* (কলকাতা: ১৯৯৮)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : *বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর : ব্যক্তিরূপ* (কলকাতা : ১৯৮৯)

চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপন্যাসে আঙ্গিক : বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর* (কলকাতা : ১৯৯০)

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক* (কলকাতা ১৯৯৪), *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* (কলকাতা : ১৯৯৯)

নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* (কলকাতা: ১৯৮৮)

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : *এক আকাশ : দুই নক্ষত্র* (কলকাতা : ১৯৯৮)

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর স্মৃতি* (কলকাতা)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : *ছোটগল্পে ত্রয়ী— তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কলকাতা : ১৯৮৫)

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ১৯৯৮)

মানস মজুমদার : *নাট্যকার তারাশঙ্কর* (কলকাতা : ১৯৯৭)

মুক্তি চৌধুরী : *ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর* (কলকাতা : ১৯৯৭)

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা* (কলকাতা : ১৯৮৭)

শকুন্তলা ভট্টাচার্য : *রুক্ষ মাটির কবিয়াল* (কলকাতা : ১৯৯৮)

সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক : *তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা:১৯৮৯)

সমরেশ মজুমদার : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা* (আলোচনা) (কলকাতা : ১৯৮৫)

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আমার পিতা তারাশঙ্কর* (কলকাতা : ১৩৯৮)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর অন্বেষা* (কলকাতা : ১৯৮৭)

সুজিতকুমার নাগ (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* (কলকাতা : ১৯৭১)

হরপ্রসাদ মিত্র : *তারাশঙ্কর* (কলকাতা : ১৩৬৮)

Mahasveta Devi : *Tarasankar Bandyopadhyay* (New Delhi : 1975).

লেখক–পরিচিতি

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য	:	তারাশঙ্কর-বিশেষজ্ঞ; সহ-সম্পাদক *ভারত-কোষ*; প্রাক্তন প্রফেসর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *টীকা টিপ্পনী*।
মাহমুদা খাতুন	:	প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বেগম আকতার কামাল	:	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*।
বিশ্বজিৎ ঘোষ	:	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*।
ভীষ্মদেব চৌধুরী	:	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*।
সৈয়দ আজিজুল হক	:	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*।
সৌমিত্র শেখর	:	এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ*।
সৌরভ সিকদার	:	লেকচারার, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রবীন্দ্র-প্রতিভার নানাদিক*।
এস এম মনির হোসেন	:	লেকচারার, সরকারী ভিখু মেমোরিয়েল কলেজ, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
সিরাজুল ইসলাম	:	এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।